প্রেম ও কামনার

শ্রেষ্ঠগল্প

সম্পাদক ও অনুবাদক-
অনিলেন্দু চক্রবর্তী

It isn't cover
banglabooks.in

প্রেম ও কামনার
শ্রেষ্ঠগল্প

সম্পাদক ও অনুবাদক-
অনিলেন্দু চক্রবর্তী

Best Stories of Love and Passion
[Selected from Western Literature]

প্রকাশক ঃ
ছায়া চট্টোপাধ্যায়
শরৎ পাবলিশিং হাউস
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭/এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

তরুণ-তরুণী
ও
প্রেমিক-প্রেমিকাদের
উদ্দেশে

লেখক ও সম্পাদক-অনুবাদক ড. অমলেন্দু চক্রবর্তীর

কয়েকটি সাহিত্য-গ্রন্থ

বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর-গল্প-সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড : রুশ সাহিত্য। বিশ টাকা ॥ দ্বিতীয় খণ্ড : সোভিয়েত সাহিত্য [যন্ত্রস্থ] ॥ তৃতীয় খণ্ড : আফ্রিকার সাহিত্য : প্রাচীন ও নবীন জীবনের গল্প [প্রস্তুতি চলছে] ॥ লেখক-পরিচিতিসহ ধারাবাহিক এরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পমালা এদেশে কি ওদেশে এই প্রথম —বহু অধ্যয়নের ও পরিবেশন-দক্ষতার অনন্য দৃষ্টান্ত।

শেকসপিয়ার কিশোর অমনিবাস

মূল নাটকের শ্রেষ্ঠরূপের পরিচয়ে নাট্যধর্মী কাহিনী-বিন্যাস এই প্রথম। প্রথম খণ্ড : ট্র্যাজিডি—সাত টাকা ; দ্বিতীয় খণ্ড : ট্র্যাজিডি, কমিডি, কবিতা ও গান [যন্ত্রস্থ]

আকাশ যেখানে মাটির কাছে :

বাংলার কিশোর-সাহিত্যে 'নতুন জাতের কালজয়ী উপন্যাস'—(ফ্যান্টাসি) ॥ "যারা ছোট থেকে বড় হয় এ বই তাদের সবলের।"

সাহিত্য-শ্রী :

অলঙ্কার ছন্দ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ॥ উচ্চমান আলোচনা অথচ সহজবোধ্য। কলাস্নাতক [সম্মানিক ও ঐচ্ছিক] ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে একান্ত ঘনিষ্ঠ গ্রন্থ। মূল্য পঁচিশ টাকা।

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : বৈচিত্র্য বিরোধ ও উত্তরণ

মধ্যপর্ব [১৮৮৮-১৯২১] : ডকটরেট ডিগ্রি দ্বারা সম্মানিত ॥ লেখকের স্বকীয় দৃষ্টিজাত—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবন নিয়ে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনায় উজ্বল। বহু নতুন তথ্য পরিবেশনে সমৃদ্ধ। [যন্ত্রস্থ]

॥ প্রাসঙ্গিক ॥

'প্রেম ও কামনা' আমাদের দেশের উৎসুক তরুণ-তরুণী ও প্রেমিক-প্রেমিকা, এবং সববয়সের শিক্ষিত নারীপুরুষদের জন্যেও বেশ কিছু ভাব-ভাবনার উপাদান এগিয়ে দিতে পারে। সুকুমার অনুভবের ও আবেগ-আলোড়নের আনন্দ-বেদনা এবং সেই সংগেই চেতনার তির্যক আলোক-সম্পাত ঘটেছে এই 'প্রেম ও কামনা : শ্রেষ্ঠগল্প'-এ। দ্রষ্টব্য

'প্রেম ও কামনা' কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠগল্পের সঙ্কলন-গ্রন্থ নয়, এই গ্রন্থ নরনারীর জীবনে—মনে ও প্রাণে—প্রেম ও কামনার মতো বহুমুখী অনুভব-আলোড়নের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পরিচিতি। এবং তাই বিচিত্র গল্পগুলিকে এলোমেলোভাবে পরিবেশন করা হয়নি, লেখক বা দেশ অনুসারে-সাজানোর রীতিও গ্রহণ করা হয়নি। গল্পগুলিকে সাজানো হয়েছে পাঁচ-পাঁচটি স্বতন্ত্র গুচ্ছে—প্রেম ও কামনার মানসিক ও দৈহিক অনুভব ও আলোড়নের সম্পর্ক-সূত্রে বেঁধে। 'ভালোবাসা', 'প্রেমোন্মাদনা', 'কামনা-বহ্নি', 'বিষণ্ণ ভালোবাসা' এবং সবশেষে 'প্রেম-সমস্যা' হ'ল পঞ্চ-গুচ্ছের ক্রম-বিন্যস্ত পরিবেশন।

এতে পঞ্চাঙ্ক প্রেম ও কামনার বিচিত্র খেলাটা মিলনে-বিরহে বিরোধে-সঙ্কটে তুলে ধরবার সুবিধে হয়েছে। দেখবার বিষয় এক-একটি শোভন গুচ্ছের মধ্যেও ভাবের ও রূপের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তাই বিষয় এক রেখেই বিভিন্ন রঙের ও ঢঙের গল্প গ্রথিত করেছি ভাবক্রম-অনুসারে। তাই মোটামুটি বলা যায় একই গুচ্ছের পরিবেশন-রীতিও ক্রমবিকাশের : 'ভালোবাসা' গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্পটিতে [দ্র. ক্লিওপাত্রার জীবনের একটি রজনী] যেমন রোমান্টিক প্রেমের তথা দুর্লংঘ্য ব্যবধান-জয়ী প্রাণাবেগের মৃত্যুঞ্জয়ী উল্লাস—স্থান কাল ও পাত্র-গত ভেদবোধ মুছে-দেওয়া উম্মাদনা, তেমনি শেষ গল্প-দুইটিতে ব্যক্তি ও পরিবার এবং ব্যক্তি ও বৃহত্তর জীবনে ভালোবাসারই পরিণত দাবীর পরিচয়। 'সতী-সুন্দরী' গল্পটিতে উপস্থিত হয়েছে একটা বড় প্রশ্ন : ভালোবাসার ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে কল্যাণ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যৌন-চেতনাকেও বিসর্জন তথা নিষ্কাম আত্মসমর্পণ। গল্পটিতে যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে সেখানে নানারকম প্রশ্ন উঠতে পারে—মানের চেয়েও জ্ঞান বড়? কিন্তু নিজেকে

বাঁচাতে গিয়ে যেখানে প্রিয়জনের জান যাচ্ছে চোখের সামনেই—সেখানে? নিজের স্থূল দেহটা ব্যভিচারের হাত থেকে বাঁচাতে প্রিয়জনকেই মৃত্যু-মুখে ঠেলে দিলে নীতিবাগীশের জয় হয় বটে, কিন্তু প্রাণধর্মের নয়। সতীত্বের নতুন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাই দাবী করছে বিপ্লবী জগদীশচন্দ্রের লেখা এই গল্পটি। 'উত্তরদেশের মেয়ে' গল্পটিতে তুলে ধরা হয়েছে ব্যক্তিজীবন ও দেশজীবনের ক্ষেত্রে প্রেমের বরণীয় স্বরূপটি. প্রেমের গল্প হিসাবে এটি ঐকান্তিক প্রেরণার প্রাণময় সাহিত্য। 'ভালোবাসা' গুচ্ছের 'বুলবুল ও গোলাপ' হঠাৎ মনে হতে পারে 'বিষণ্ণ ভালোবাসা'-গুচ্ছেই স্থান পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু গল্পের গবেষক ছাত্র ও রাজকন্যা কেউই তো প্রেমের জগতের মানুষ নয়। ভালোবাসার উদ্দেশে যে বুলবুল বুকে কাঁটা বিঁধিয়ে বিরূপ শীতেই স্বরে স্বরে ফুটিয়ে তুলেছে ভালোবাসার অশ্রু-ভিজা গোলাপটি—সেই বুলবুলই এখানে ভালোবাসার প্রাণ, প্রেমের প্রতীক—অন্যের ভালোবাসার উদ্দেশেই তো সে উৎসর্গীকৃত জীবন! যাদের মিলনের জন্যে তার এই প্রাণান্তিক প্রয়াস তারা কেউই প্রেমিক বা প্রেমিকা নয়—হিসাবী বাজার-দরে ও স্থূল প্রয়োজনের নিরিখে সঙ্কীর্ণ অহং-এর ঘেরে বন্দী। লেখক স্বয়ং গল্পের নামকরণে তাই মুখ্য-ভূমিকায় তুলে ধরেছেন বুলবুলকেই।

'বিষণ্ণ ভালোবাসা' গুচ্ছে ট্রাজিডিরই বিভিন্ন জাতের কিছু গল্প, এবং বিচিত্র রকমের বিষণ্ণ আবেদন এখানে ঃ কোনো কোনোটা বড়ই মর্মস্পর্শী। এখানে বুকফাটা-ব্যথা কিংবা চাপা কান্না—যেমন 'নাচমুখোশের অন্তরালে' বা 'অজ্ঞাত শিশুর আদর'; কোথাও প্রেম-বঞ্চিত জীবনের মর্মান্তিক বেদনা (যেমন 'একটি চুম্বন' বা 'রূপ না দিলে যদি'), কোথাও বুকভাঙ্গা এক প্রাণান্তিক মিলন (যেমন, হতভাগ্য প্রেমিক), কোথাও-বা ভয়াবহ স্তব্ধতা (যেমন এই গুচ্ছের প্রথম গল্পটি 'অনিন্দ্য প্রাসাদ')।

'প্রেম-সমস্যা' সমাপ্তি-গুচ্ছে তুলে ধরেছি নানারকমের বিরোধ ও অসংগতি, এবং তার মধ্যেই প্রেমের সুকুমার মূল্যবোধের ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মতো এক বিষম সমস্যা। নরনারীর জীবনে যে সহৃদয়তা ও সমবোধ, কিংবা স-ক্ষম আত্মসংযম, এমন কি আত্মবিসর্জন—সেখানেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, আর তার অভাবের জন্যেই দেখা দেয় না মিলনের সানন্দ সার্থকতা। তবে কেবল তাই নয়, আর্থিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভেদমুক্ত সমস্তর জীবনেই তো সার্থক হতে পারে নরনারীর প্রেম।

এ ছাড়া যেটা তা প্রেম নয়, বিকৃত আবেগ কিংবা অবদমিত আকাঙ্ক্ষা, অথবা কামনার বিষ—আপাতভাবে যতই মধুর মনে হ'ক না [দ্র. 'কামনা বহ্নি' গুচ্ছে তারি প্রকাশ-বৈচিত্র্য]।

'প্রেম-সমস্যা' গুচ্ছের প্রথম গল্পটিতে [দ্র. 'প্রেম পরিণয় এবং'] প্রেমের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্কের বিরোধ-চিত্র—সমস্যাটা স্থূল মনে হলেও একান্ত বাস্তব সত্য। গল্পটির শেষে লেখকের স্বতো-প্রণোদিত শেষকথাটি বড়ই মর্মান্তিক—খেয়ে পরে ভালোবেসে মানুষ যে সুখে থাকতে পারে না একই লজ্জা একই দুঃখ। 'জেনানা-মহল' গল্পে পাশ্চাত্য নারীদের দাম্পত্য-জীবনের সামনে তুলে ধরা হয়েছে পারিবারিক সুখ-প্রতিষ্ঠায় প্রেমিকা স্ত্রীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবীর উপরে প্রশ্নাঘাত বা পাল্টা প্রতিবাদ। সুখ কিসে—আত্মমুখিতায়, না আত্মবিসর্জনে? দেখবার বিষয় গল্পের শেষটায় পাশ্চাত্য মহিলাটির নিরুত্তর চেতনার বিব্রত অবস্থাটা। 'চাঁদের আলো' গল্পটিতে বিষণ্ণ আলোকপাত মর্মান্তিক এক সুকুমার সত্যের দিকে: মনে তথা জীবনে রুচির গড়মিলে অনুভব ও আনন্দবোধের ক্ষেত্রে বিপরীত চরিত্রই যদি হয় স্বামী বা স্ত্রী, তবে কী করুণ হয় ওঠে জীবনযাপন! প্রেম-সমস্যায় 'প্রেম ও কামনা' গল্পগুচ্ছের শেষগল্প 'রোমান্সের রঙ'। 'প্রেম পরিণয় এবং' নামের প্রথম গল্পে যেমন প্রেম-সমস্যার স্থূল স্বরূপ (গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও), তেমনি এই গুচ্ছের শেষগল্প 'রোমান্সের রঙ'-এ ধরা দিয়েছে প্রণয়-রোমান্সের ব্যর্থতারই একটি সুকুমার রূপ—যেখানে চলে গেল রোমান্সের প্রাণ ভালোবাসার রঙ। চলে গেল, যেহেতু প্রণয়ী তরুণ মূলতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল নিজেকে নিয়ে—তার একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক এক অতিসচেতন রুচিই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার প্রেমিক সত্তাকে। মনের মোহমুক্ত আনন্দই তো ধরা দেয় পারস্পরিক সান্নিধ্যের সুযোগে, ধরা দেয় রোমান্সের মধ্যে। আত্মপ্রাধান্য বিস্তারের সুযোগে নয়, আত্মপ্রকাশের আনন্দেই তো রোমান্স। এই সত্যটা সে বেমালুম ভুলেই বসেছিল; তাই তার প্রণয়িনীকে কড়া দুপুরে [প্রণয়িনীর নিজের কাছে যেটা ছিল প্রণয়েরই সবসেরা সাজ—রোমান্সের সব-ভোলানো রঙ] সেই পোশাকে এগিয়ে আসতে দেখেই সে কিনা লজ্জায় পিছিয়ে গেল,—এবং পিছিয়ে গেল রোমান্স! অন্ধ বেপরোয়া ছুরি চালিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল সে রোমান্সের রঙীন এ্যালবামটি।

*** পঞ্চগুচ্ছ গল্পের নির্বাচনের ও পরিবেশনের ভূমিকায় সতর্ক নজর**

রেখেছি সাহিত্য-গত মর্যাদার ও রুচিগত মানের দিকে : লোভন নয়, শোভন হয় যেন,—এমন কি 'কামনা-বহ্নি' গুচ্ছের গল্পও হয় যেন উচ্চমানের, কেবলমাত্র কামনা-লোলুপ না হয় অর্থাৎ স্থূল না হয়। তাই 'ম্যারুরোকা' কামনা-বহ্নি গুচ্ছের একটি দুঃসাহসিক গল্প হয়েও মপাশাঁর হাতের যোগ্য এক শ্রেষ্ঠসৃষ্টি। এই গুচ্ছের অন্যান্য গল্পের মধ্যেও [মোট সংখ্যা মাত্র ছয়টি] কামনারই বিচিত্র রূপ ধরা দিয়েছে বহুমুখী সাহিত্য-সৃষ্টিতে ; 'কালো বেড়াল' গল্পে অবদমিত কামনার সুন্দর অভিব্যক্তি, আর 'বিজয়ী প্রেমের গান'-এ বঞ্চিত প্রেমেরই এক ভয়াবহ ব্যভিচারী পরিণাম।

'প্রেম ও কামনা' গ্রন্থের অনেক গল্পই বিশ্বসাহিত্যের সর্বোচ্চ মহলে সর্বপ্রিয় আসনে স্থান পাওয়ার যোগ্য : গ্রন্থের প্রথম গল্প 'ক্লিওপাত্রার জীবনের একটি রজনী' এদেশে অনেকেরই অজানা, এবং এটি এক শ্রেষ্ঠ বাণীশিল্পীর অনিন্দ্য-রচনা। এই গল্পটি আমার অনুবাদেই প্রথম পড়তে পেয়ে সুহৃদ অধ্যাপক-সাহিত্যিক (স্বর্গত) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন—'এমন একটিমাত্র গল্পই একজন লেখককে অমর করতে পারে।' উল্লেখ্য, এই অত্যাশ্চর্য গল্পটির সন্ধান দেবার জন্য আমি 'জীবনী-সম্রাট' জ্যেষ্ঠোপম মণি বাগচীর কাছে চিরঋণী। একথা ঠিকই গল্পের উচ্চমান বজায় রাখতে গিয়ে রুখতে হয়েছে ভেজাল কারবার—বিকৃত কি শস্তা জনপ্রিয়তার সহজতম পন্থা। আর তাই, শ্রেষ্ঠ-গল্পের নামে যা সংক্ষিপ্ত কাহিনী বা ছিবড়ে মাত্র তাও বরবাদ করতে হয়েছে।

* 'প্রেম ও কামনা : শ্রেষ্ঠগল্প' য়ুরোপামেরিকার—প্রধানতই ফরাসী ও রুশ ছোটগল্প-সাহিত্য থেকে নির্বাচিত, অর্থাৎ একদিক থেকে এটি প্রেম ও কামনারই পাশ্চাত্য-সম্ভার। কোনো কোনো গল্প ইচ্ছা সত্ত্বেও স্থান দিতে পারিনি—পরিকল্পনা মতো নয় তাই, আর আন্তর্জাতিক আইনে সহজ অধিকার-ভুক্ত নয় সে কারণেও, কিংবা পৃষ্ঠা-সংখ্যা এবং মূল্য-বৃদ্ধির আশঙ্কায়। বিশেষ করে 'প্রেম-সমস্যা' গুচ্ছটি বহুমুখী দাবীর দিক থেকে আরো পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজন ছিল, কারণ এই গুচ্ছটিই বর্তমানকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রভাব বিশেষ চেতনামূলক ও দায়িত্বব্যঞ্জক, এবং গঠনমূলকও বটে।

*অনুবাদ প্রসঙ্গে বক্তব্য : গল্পগুলির ইংরেজী স্বরূপকে ভাষায় কি ভঙ্গীতে বরণ করেছি যথাযথ অনুবাদে—অর্থাৎ অনুসরণ করেছি, বাদ দিইনি, কিংবা চোখ বুঁজে যদৃচ্ছা যোগ-বিয়োগও করিনি। তবে একটি

কি দুটি ক্ষেত্রেই বিশেষ বাহুল্য বিবেচনায় সম্পাদনা করেছি (যেমন 'একটি চুম্বন' গল্পে), কিন্তু একটি কথাও নতুন যোগ করার মতো ধৃষ্টতা ঘটেনি। দু'একটি গল্পের নামের ক্ষেত্রে সার্থক পরিবর্তন আনা হয়েছে, যেমন 'বলশেভ' গল্পটির নামকরণ 'রূপ না দিলে যদি', 'স্বপন-শিল্পী' গল্পটির নামকরণ 'দূরের স্বপ্ন : কাছের ভালোবাসা'।

পাশ্চাত্য দেশের মূল লেখকদের এবং ইংরেজী অনুবাদকের কাছে ঋণ-স্বীকৃতি যে আন্তরিক সে কথা স্মরণ করেই অনুবাদের নিষ্ঠা বজায় রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টায় ত্রুটি রাখা হয়নি। গ্রন্থশেষে উল্লেখ করা হয়েছে গল্পের মূল-লেখকের নাম ও দেশের নাম; কারণ এই গল্পগ্রন্থ মূলতই কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশের বহু লেখকের লেখা গল্পের সঙ্কলন মাত্র নয়, 'প্রেম ও কামনা' বহুমুখী বিষয় বৈচিত্র্যেরই পরিচায়িকা।

* সবশেষে সানন্দে উল্লেখ করছি : এই গ্রন্থ রচনায় যিনি হৃদ্য সহযোগিতায় সর্বথা এগিয়ে এসেছেন তিনি আমার সহধর্মিণী—বেলা দেবী। এই গ্রন্থের 'রূপ না দিলে যদি' 'দাম্পত্য-কলহ' 'প্রেম পরিণয়' এবং 'জেনানা-মহল' তাঁরই সুন্দর হাতের অনুবাদ; এককালে এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল 'মহিলা' নামের মাসিক পত্রিকায়।

বহুমুখী ভাবভিত্তিক গল্পের সুবিন্যস্ত সঙ্কলন এবং অনুবাদ-শিল্পের উজ্জ্বল পরিচয়ের জন্য 'প্রেম ও কামনা' এক বহু-অভিনন্দিত নতুন ধরণের গল্পগ্রন্থ—'এদেশে কি ওদেশেও এই রকম দৃষ্টান্ত দুর্লভ'। বত্রিশ বৎসর আগের গ্রন্থটিই আরো পূর্ণাঙ্গ-স্বরূপে প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা ভাজন হলেন প্রকাশিকা শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায়, এবং এই প্রকাশনা-সূত্রেই বারবার মনে পড়ছে আমার পরম স্নেহভাজন বহুকর্মা তরুণ শ্রীযুক্ত দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে ও 'বঙ্গবাণী' মুদ্রণ-সংস্থার পরিচালক শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষকে—যাঁদের সহায়তা ছাড়া এই গ্রন্থপ্রকাশ মাত্র তিন মাসের মধ্যে সম্ভব ছিল না।

কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদের সংশোধিত রূপ দ্রষ্টব্য—পৃ. ৮৩ ছত্র ২৪ : কলরোজ আর পাখীদের কাকলি পৃ. ৯৪ ছত্র ৩০-৩১ : রাজার…। আবেগ ভরা পৃ. ১২৮ ছত্র ২৫ : শ্রীমতী জুলি, ছত্র ২৬ : অজুহাতে ছত্র-৩১ : পুলিশ পৃ. ১৫৪ ছত্র ২২ : ভয়-ভয়…ভয়ে

শ্রাবণী পূর্ণিমা ১৯৫৮ —অনিলেন্দু চক্রবর্তী

প্রেম ও কামনা : পঞ্চগুচ্ছ

ভালোবাসা	ক্লিওপাত্রার জীবনের একটি রজনী ৩-২৩
	মৃত্যুর চেয়ে বড়ো ২৪-৩৭
	বুলবুল ও গোলাপ ৩৮-৪৫
	দূরের স্বপ্ন : কাছের ভালোবাসা ৪৬-৬৪
	বাড়ির পথে ৬৫-৬৯
	সতী-সুন্দরী ৭০-৭৬
	উত্তরদেশের মেয়ে ৭৭-৮৩
প্রেমোন্মাদনা	একগোছা চুল ৮৬-৯৩
	প্রেমের চতুষ্পদ ৯৪-১০২
কামনা-বহ্নি	মারুরোকা ১০৫-১১৪
	নারী ছলনাময়ী ১১৫-১২২
	ইশারা ১২৩-১২৯
	মুক্তোর দুল ১৩০-১৩৫
	কালো বেড়াল ১৩৬-১৪৬
	বিজয়ী প্রেমের গান ১৪৭-১৭০
বিষণ্ণ ভালোবাসা ॥	সেই অনিন্দ্য প্রাসাদ ১৭৩-১৮৫
	নাচ-মুখোশের অন্তরালে ১৮৬-১৯৫
	রূপ না দিলে যদি ১৯৬-২০১
	একটি চুম্বন ২০২-২১৫
	হতভাগ্য প্রেমিক ২১৬-২২০
	কুমারীর স্বামী ২২১-২২৫
	সত্যিই বড় দুঃখের ২২৬-২৩২
	অজাত শিশুর আদর ২৩৩-২৪৪
প্রেম-সমস্যা ॥	প্রেম পরিণয় এবং ২৪৭-২৫৪
	একটি কথায় ২৫৫-২৫৭
	দাম্পত্য কলহ ২৫৮-২৬৫
	জেনানা-মহল ২৬৬-২৭১
	চাঁদের আলো ২৭২-২৭৬
	রোমান্সের রঙ ২৭৭-২৮১

লেখক ও মূল-সাহিত্য ২৮৩-২৮৪

ভালোবাসা

'ভাগ্যে যা থাক

এ কথা সত্য জানি,

শত আঘাতেও

স্থির এই প্রত্যয় ঃ

ভালোবেসে তবু

সব হারানোও ভালো

সারাটা জীবন

ভালো-না-বাসার চেয়ে

ক্লিওপাত্রার জীবনের একটি রজনী

॥ ১ ॥

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে স্বর্ণ-খচিত ও চিত্র-শোভিত বিচিত্র এক পানসি নেমে আসছিল নীলনদের বুকের উপর দিয়ে—পানসির লম্বা লম্বা পঞ্চাশ দাঁড়ে যতটা বেগে এগোনো সম্ভব। ঢেউয়ের খাঁজ ধরে পায়ের পর পা ফেলে ছুটে চলছিল যেন এক অতিকায় জলজন্তু!

পানসিটি খুব লম্বা, দুই প্রান্ত প্রতিপদের চাঁদের মতো। সোনার শিরস্ত্রাণ-শোভিত একটি মূর্তি গলুইতে বসানো। দেখেই বোঝা যায়, এই তরণী কোনো রাজবংশের!

পানসির মাঝখানে সমতল ছাতের একটি বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ রঙবেরঙে চিত্রিত, গিল্টিকরা, তালপাতার নানা ছাঁচে সাজানো। চৌকাকার ছোট ছোট চারটে জানলা-পথে আলো আসছে ভিতরে।

পানসির পিছন দিকটা থেকে দুটো বড় বড় দাঁড় জলের মধ্যে নেমে এসেছে,—যেন রাজহাঁসের দুটি পা। তরণী-চালক গলুইয়ের মঞ্চ-গৃহের ছাতের উপর দাঁড়িয়ে, দাঁড় পরিচালনা করছে। পানসিতে আর দ্বিতীয় জনপ্রাণী আছে মনে হয় না! কারণ, পানসির দু'পাশের মাঝিমাল্লারা ঝুঁকে পড়ে পড়ে দাঁড় টানছে আড়াল থেকে। বৈঠাগুলিকে একছন্দে উঠতে পড়তে দেখেই শুধু বোঝা যায় বৈঠাদারেরা আছে ঠিকই। বৈঠাগুলি পানসির দু'পাশ থেকে জলে পড়ছে তালে তালে—আর বিশ্রাম নিচ্ছে ক্ষণেকের জন্যে।

হাওয়ার ক্ষীণতম কাঁপনটুকুও নেই কোথাও। পানসির প্রকাণ্ড ত্রিকোণ-পালটি নামিয়ে এনে, রেশমী দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে নিচু মাস্তুলটার সঙ্গে। জোর বাতাসের কোনোই আশা নেই আর—বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টই।

মধ্যাহ্ন-সূর্য খাড়াখাড়ি ছুঁড়ে মারছে তার তীক্ষ্ণ শরজাল। নদীর ছাই-রঙ পলিমাটির তীরে তীরে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে জ্বলন্ত রৌদ্র! চোখ-

ঝলসানো আলো ঝরে ঝরে পড়ছে তরল আগুনের মতো। আকাশের নীল তীব্রতাপে ঝলসে শাদা হয়ে গেছে,—অগ্নিকুণ্ডে যেমন দেখায় ধাতুকে। নেই একটুকরো মেঘ, মৃত্যুর মতো বৈচিত্র্যহীন বিষণ্ণ আকাশ।

নীলনদের গতি-মন্থর পাণ্ডুর জলস্রোত ঘুমিয়ে পড়েছে যেন, ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে গলিত ধাতুর মতো। এক ঝলক হাওয়াও একটি পলকের জন্যে কুঞ্চন আঁকছে না তার বুকে। পদ্মদলগুলি ডাঁটার উপর জেগে আছে স্থির অচঞ্চল,—যেন পাথরের ফুল! একটুও দুলছে না হাওয়ায়। কখনো কখনো দুটি-একটি মাছ স্রোতের জলে দেখিয়ে যায় তাদের বুক—একটা রুপালি ঝলক শুধু। ধূসর-বিজন দুই তীর। গভীর গম্ভীর একটা বিষণ্ণতা সমস্ত তীরদেশে পরিব্যাপ্ত। দেশ তো নয়, যেন এক বিরাট সমাধি। দিগন্তের কোলে নেই একটুকরো ধূসর মেঘের ছায়াও, নেই একটা লুকানো ঝর্ণা,—যার জলে একটুখানি ডুবানো যাবে ধূলি-ধূসর পা দুটি···মরু-দিগন্তে ক্লান্ত বেদনায় যুগযুগান্ত ধরে চেয়ে আছে স্ফীংক্স—মানব-কুকুর মূর্তিগুলি। দুহাজার বছর ধরে যে প্রস্তরে শাণিত করছে তাদের নখর সেই পাষাণ-বন্ধন থেকে যেন আর মুক্তি নেই!

নিস্তব্ধতা বড় ভয়ংকর। পৃথিবী যেন বোবা হয়ে গেছে চিরদিনের মতো। হাওয়ারা হারিয়ে ফেলেছে ধ্বনি-সৃষ্টির ক্ষমতা। মাঝে মাঝে শোনা যায় শুধু কুমীরদের ফিসফিস আওয়াজ, আর তাদের অদ্ভুত 'চাপা-হাসি'! কুমীরগুলি গরমের জ্বালায় আশ্রয় নিয়েছে নদীতীরের ঝোপে-ঝাড়ে।

পানসি ছুটে চলেছে তীরের মতো। পিছু পিছু এঁকে রেখে যাচ্ছে রুপালি রেখা, সেই রেখা মিলিয়ে যাচ্ছে নিমিষে। কয়েকটি ফেন-বুদ্বুদ ক্ষণেকের জন্যে স্রোতের বুকে জেগে থাকছে—পানসির চরণ-চিহ্নের মতো! সেই পানসি কিন্তু কখন চলে গেছে দৃষ্টি-সীমা ছাড়িয়ে।

গিরিমাটি রঙের দুই তট দ্রুতবেগে প্রসারিত হয়ে পড়ছে সামনের দিকে—নীল আকাশ ও নীলনদের নিবিড়-গভীর নীলের মধ্যে! নীলের বুকে আঁকা পড়েছে আকাশ, না আকাশের বুকে নীল,—বলা কঠিন।

চোখে একটুখানি তৃপ্তি বুলিয়ে দেয় না কোনো মরূদ্যান,—মিশর-প্রকৃতির কাছে সবুজ যেন চির-অচেনা। দিগন্তে মাঝে মাঝে দেখা যায় দুএকটি তালগাছ। কোথাও বা একটা ডুমুর গাছ তলোয়ারের ফলকের মতো পাতাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে,—যেন শাণিত করে

নিচ্ছে। অথবা কোনো ধ্বংসস্তূপের নিচে ক্ষীণ রসাশ্রয়ে ছায়াতলে বেড়ে উঠেছে একটি লতা,—লাল টুকটুকে তার একফোঁটা রঙ চারদিকের একঘেয়ে ধূসরতার মাঝে যেন একটুখানি মুক্তি!

আসুন, প্রান্তর ছেড়ে এবার আমরা প্যালেসের দিকে চোখ ফেলি এবং গোপনে প্রকোষ্ঠের ভিতরে ঢুকে পড়ি দুঃসাহসীর মতো।

প্রকোষ্ঠের দেয়ালে দেয়ালে বিচিত্ররঙের কারুকাজ। মেঝেতে পাতা অপরূপ গালিচা। শেষপ্রান্তে ছোট্ট একটি পালঙ্ক, পাশে টুল পাতা-বিছানায় উঠবার জন্যে। একটি বিচিত্র বালিশে বিশ্রাম-সুখে শায়িত রয়েছে একখানি মুখ,—একটিবার যা দেখে প্রলয় হয়ে গিয়েছিল আধেকটা দুনিয়া জুড়ে···

এই মুখ ক্লিওপাত্রার ছাড়া আর কার?

পাশেই অনুগত ক্রীতদাসী চার্মিয়ন, মস্ত বড় একটা পাখা দুলিয়ে হাওয়া করছে। আর একটি তরুণী সুগন্ধি জল ছিটিয়ে দিচ্ছে জানলার খড়খড়িতে; সদ্য-সৌরভে সিঞ্চিত হয়ে তবেই হাওয়া এসে ঘরে ঢুকতে পাচ্ছে। বিশ্রাম-শয্যার পাশেই একটা ফুলদানী, সারস-গ্রীবার মতো তার গলা। একগোছা পদ্মফুল সেই ফুলদানীতে, তাদের কতগুলি আসমানী-নীল, কতগুলি দেবী আইসিসের আঙুলের মতোই কোমল—গোলাপী রঙের।

ক্লিওপাত্রা ফিরে এসেছে উৎসব থেকে। উৎসবের বেশ এখনো পরিবর্তন করেনি।

সেই বেশেই ফিরে চলেছে গ্রীষ্মভবনে। শিরে শোভা পাচ্ছে স্বর্ণমুকুট, কপোলের কিছুটা অংশ ঢাকা দিয়ে একটি শুকপাখী যেন ডানা মেলে দিয়েছে দু'পাশে, গ্রীবাটি শিংয়ের মতো বাঁকিয়ে দিয়েছে সামনে। সমস্ত মুকুটটিই বহুমূল্য প্রস্তরে জ্বলজ্বল করছে। মুকুটির পিছনে তার কেশরাশি ছড়িয়ে পড়েছে নক্ষত্রহীন রজনীর মতো; গুচ্ছ গুচ্ছ অলক নেমে এসেছে কাঁধ বেয়ে। বাহুতে বাজুবন্ধ, আঙুলে আংটি। পরণে ঢিলে পোশাক কাঁধের কাছটায় খুবি আঁটা, নিচেই ফুলে উঠেছে। কোমরে আঁটা কটিবন্ধ; পায়ে চটি জুতো, ফিতে-বাঁধা চটি।

অতুল সৌন্দর্য আর অনিন্দ্য সাজসজ্জার অধিকারিণী হ'লে নারীর চোখে মুখে ফুটে ওঠে যে সন্তোষ—তার লেশমাত্রও নেই আজ ক্লিওপাত্রার। সুকোমল শয্যায় সে শুধু এপাশ ওপাশ করছিল, আর সযত্ন-বিন্যস্ত

বেশবাসে ভাঁজ পড়ছিল বারবার। চার্মিয়ন তা মসৃণ করে রাখছিল অসীম ধৈর্যে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া করছিল পাখা দিয়ে।

'নাঃ, এ ঘরে দম আটকে আসছে! অগ্নিদেবতা স্বয়ং যদি এসে অধিষ্ঠান করতেন তবুও এর চেয়ে গরম হ'ত না। হাওয়া তো নয়, যেন জ্বলন্ত নিশ্বাস!'—ক্লিওপাত্রা জিভের মাথা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেয় এবং প্রসারিত হাতখানি বাড়িয়ে পেয়ালা খোঁজে ঠিক যেন জ্বরের নেশায়।

সদাসতর্ক চার্মিয়ন অমনি হাততালি দিল,—কালোরঙের এক ক্রীতদাসী আবির্ভূত হ'ল নিমেষের মধ্যেই। বাঁ হাতে থালা, তার উপরে টুকরো টুকরো তরমুজ আর নানারকম পেয়ালা। ডানহাতে কুঁজোর মতো একটি পাত্র।

দাসীটি খুব দক্ষতার সঙ্গে বেশ উঁচু থেকে পানীয় ঢেলে একটা পেয়ালা ভরে রাখল রাণীর সামনে। ক্লিওপাত্রা তরমুজের গায়ে একটুখানি ঠোঁট ছোঁয়াল, রেখে দিল পেয়ালাটা। তারপর চার্মিয়নের দিকে তার কোমল-কালো উজ্জ্বল চোখ দুটি তুলে বলে উঠল,—'চার্মিয়ন, আর যে পারি না!'

॥ ২ ॥

গভীর-গোপন কোনো কথা শুনবে চার্মিয়ন অমনি চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলল বেদনার ছায়া, আরো ঘনিয়ে এল তার রাণীর কাছে।

'বড় ক্লান্ত আমি!'—ক্লিওপাত্রা বলতে বলতে হতাশায় হাত দু'খানি এলিয়ে দেয় দু'পাশে—'এই মিশর আমাকে যেন চেপে ধরেছে পাষাণের মতো, মৃত্যুর মতো! নেই একটুকরো মেঘ, একটুখানি ছায়া। চার্মিয়ন, একটি ফোঁটা বৃষ্টির মূল্য দেব সত্যিকার একটি মুক্তো! এই পাথুরে আকাশের ঝলসানো মণি থেকে একফোঁটা অশ্রুও ঝরে না এই মরুদেশে? আকাশ তো নয়, বিরাট এক সমাধির আবরণ! মৃত শুষ্ক আকাশ ঝুলে আছে মমির মতো। দেখে দেখে দেহ কুঁকড়ে আসে, ভয় করে আমার! মনে হয়, উঠে দাঁড়ালেই কপালে ঠুকে যাবে।······বিষণ্ণ দেশ, দুর্বোধ রহস্যে ঘেরা। মানুষের কল্পনা এখানে গড়েছে শুধু দৈত্য জানোয়ার, আর সারি সারি দানবীয় সমাধি! এই স্থাপত্য এই শিল্প দেখে আমার ভয় করে। এই যে হাঁটুর উপরে হাত রেখে পাষাণ-বন্দী হয়ে রয়েছে

বিরাট বিরাট মূর্তি'—এদের এই অন্ধ অচলায়তন রূপ দেখে ক্লান্তিতে মন ভেঙ্গে পড়ে, এরা আমার চোখে অশান্তি জাগিয়ে রাখে আমার দুনিয়ায়। কবে, কবে সত্যি সত্যি এক দানব এসে এদের হাতে ধরে নিয়ে চলে যাবে, মুক্তি দেবে এই হাজার হাজার বছরের প্রতীক্ষার যন্ত্রণা থেকে···

'এই বিরাটাকার স্ফীংক্সগুলি শিকারী কুকুরের মতো উদ্যত ভঙ্গীতে বসে অনির্বাণ চোখে নজর রাখছে কোন্ শিকার-পালের উপর, চিরদিন সতর্ক নখর মেলে রয়েছে কী ধরবার জন্যে। সারি-সারি পাথুরে চোখ এত নিষ্ঠুরের মতো তাকিয়ে আছে কেন নিরবধি কাল আর নিঃসীম শূন্যতার দিকে? বুকের কোন্ নিগূঢ় রহস্য রুদ্ধ করে রেখেছে তাদের তালা-আঁটা ঠোঁটে? ডানে বাঁয়ে যেদিকে তাকাও চোখে পড়বে শুধু মানুষ-মাথা কুকুর, আর কুকুর-মাথা মানুষ···

'রহস্য আর প্রস্তর—এই তো মিশর। হ্যাঁ, তরুণীর—তরুণী রাণীর যোগ্য অপরূপ দেশ বটে।

'আর তাছাড়া চার্মিয়ন, একটা ভাবনায় বড় ভয় পাচ্ছি। পৃথিবীর অন্যসব দেশে দাহ করা হয় মৃতদেহ, তাদের ভস্ম মিশে যায় মাটিতে; কিন্তু এখানে জীবিতদের একমাত্র কাজই যেন মৃতদের জিইয়ে রাখা! অষুধপত্রের গুণে তাজা থাকে শব,—প্রাণ-পুরুষ চলে যাবার পরেও। বর্তমানের অধিবাসীদের নিচেই পড়ে আছে বিশ-বিশটা যুগের লোক; এক-একটা শহর দাঁড়িয়ে আছে ত্রিশ-ত্রিশটা স্তর শবাধারের উপর! বাবার তলায় ঠাকুরদা, তার তলায় তার বাবা। চিরজীবন খুঁড়ে গেলেও দেখবে তলায় রয়েছে শবের পর শব। সত্যিই, মিশর একটা প্রেতের দেশ। আমার মতো হাসিখুসি চঞ্চল নারীর যোগ্য নয় সে মোটেই।······এমন দেশে কেমন করে বাঁচা যায়? বেঁচে কী সুখ?···এমন কি শোবার ঘরের মেঝেতে পা ফেললেও শুনবে ফাঁপা আওয়াজ, কারণ শবগুহাগুলি এগিয়ে এসেছে তোমার বিছানায় নিচেই! তাহলে, এখানে শুধু মমিদের রাণী হয়ে থাকা? শুধু রুক্ষদর্শন এই প্রস্তর-মূর্তিগুলি ছাড়া আলাপ করবারও কেউ নেই,—চমৎকার সৌভাগ্য বটে! এই বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি দিতে পারে এমন গভীর কোনো ভালোবাসা পেতাম যদি,—পেতাম জীবনের কোনো স্বাদ। ভালোবাসতে পারতাম কোনো মানুষকে—কোনো কিছুকে। ভালোবাসাও পেতাম যদি! কিন্তু পাইনি তো!

'তাইতো চার্মিয়ন, আমার এত ক্লান্তি! ভালোবাসার মহিমায় এই

বিষণ্ণ-গম্ভীর দেশই যে হয়ে উঠত গ্রীসের চেয়েও অপরূপ…তখন তো এই প্রেতমূর্তি আর শহরের নিচেকার এই ভৌতিক ভয়ার্ত রূপ ভাবনায়ও আসত না আমার।'

চার্মিয়ন অবিশ্বাসের হাসি হাসল,—'রাণী, এ নিশ্চয়ই আপনার দুঃখের কারণ হবার কথা নয়! কারণ আপনার একটি চাউনিতেই তো দ্বিধা হয়ে যায় মানুষের হৃদয়, কামদেবের শরের মতো!'

'কিন্তু মুখ, না মুকুট—কোনটা ভালোবাসে ওরা, রাণী কী করে জানবে? মানুষের জগৎ থেকে রাণী তো বহু দূরে, তাদের নাগালের বাইরে। সে যেন শুধু নারী নয়,—মহিমাময়ী পবিত্র সত্তা, যৌন-শ্রেণীর ঊর্ধ্বে। লোকে তাকে নতজানু হয়ে পূজো নিবেদন করে, কিন্তু ভালোবাসে না। আমার সামনে শ্রদ্ধা ও সংশয়ে কুঁকড়ে আসে মানুষের হৃদয়!'

রাণীর এই কথায় চার্মিয়ন উল্টো যুক্তি দেখতে চেষ্টা করল না, একটু অস্ফুট হাসি দেখা দিল তার ওষ্ঠে।

ক্লিওপাত্রা বলে চলল—'একেবারে নতুন, একেবারেই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে যাক আমার জীবনে, আমি আজ তাই চাই। কবির কাব্য, ক্রীতদাসীদের নৃত্যছন্দ, ভোজোৎসব, সিংহের খেলা, কুঁজো বামন, যুদ্ধ-প্রদর্শনী, নব নব সাজসজ্জা, মুঠোমুঠো মণি-মুক্তো, এশিয়ার সুগন্ধি, দুনিয়ার সেরা যত প্রসাধন, চোখ-ধাঁধানো জাঁকজমক,—না, না, কিছুই আর ভালো লাগে না। সবকিছুতেই আমার কেমন বিতৃষ্ণা, কিছুই যে সহ্য হয় না আর!'

চার্মিয়ন আপনমনে বলছিল—'সোজাই বোঝা যাচ্ছে, মাসখানেকের মধ্যে রাণীর কোনো প্রেমিক জোটেনি, বা রাণী কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেননি!'

অপ্রীতিকর দীর্ঘ আলোচনার ফলে আরো ক্লান্ত হয়ে পড়ল ক্লিওপাত্রা,—আবার পেয়ালাটা তুলে ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে নিল একটুখানি। তারপর ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে। ডানার মধ্যে মাথা গুঁজে দিল যেন একটি কপোতী! চার্মিয়ন তার চটির ফিতে খুলে ফেলে ময়ূরের পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল পায়ের তলায়। নিদ্রাদেবী ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মুঠো মুঠো স্বর্ণরেণু ছড়িয়ে দিল ক্লিওপাত্রার সুন্দর চোখ দুটির উপর!

ক্লিওপাত্রা পানসির ভিতরে ঘুমোচ্ছে, আর পানসির ছাত থেকে দেখা যাচ্ছে সূর্যাস্তের মহাসমারোহ। আকাশের নিচু দিকটা জুড়ে মোটা-মোটা

তুলির টানে বেগুনী রঙের খেলা—পশ্চিম দিকে মিলিয়ে গেছে লাল রঙের ঝলকে। নদীর জলেও পড়েছে নিষ্প্রভ লালরঙের ছায়া, ঝিলমিল করছে আনারের উল্টো পিঠের রাংতার রঙের মতো। নদীর বক্র-ভগ্ন তটরেখা ঝোপঝাড়—নদীতীরের সবকিছুই কালো হয়ে জেগে আছে আকাশের উজ্জ্বল পটের উপর গোধূলি-আলোকে দেখা যাচ্ছে দূরে দূরান্তরে—নদীর ঝিলমিল বুকের উপর কাঁপছে যেন একটি ধূসর বিন্দু। ডুব মারছে কি কোনো বেলেহাঁস? স্রোতের গায়ে আরামে ভেসে চলেছে কোনো কচ্ছপ? সন্ধ্যার শীতল বাতাস টেনে নেবার জন্যে জলের উপরে কি নাক উঁচিয়ে দিয়েছে কোনো কুমীর? নদীর মধ্য-স্রোতে চিকচিক করে উঠল হিপোপটেমাসের গা? অথবা নদীর স্রোতাঘাতের মধ্যে ন্যাড়া কোনো পাহাড়-চূড়া?

অবশ্যি, এদের কোনোটাই নয়। একটি লোক যেন হেঁটে আসছে,—ছুটে আসছে জলের উপর দিয়ে! এবার দেখা যাচ্ছে তার ডিঙ্গিটি, ছোট্ট একখানি ডিঙ্গি। দেখতে একটা মাছের মতোই। তিনখান কাঠ একত্র জুড়ে গাঁথা—তলায় একখানা দুপাশে দুখানা। লোকটি দাঁড়িয়ে আছে সোজা, ডিঙ্গির দুইপাশে দুই পা রেখে।···পঞ্চাশ দাঁড়ের পানসিটি তীরবেগে ছুটতে থাকলেও কালোরঙের ছোট্ট ঐ ডিঙ্গিটি স্পষ্টতই তাকে ধরে ফেলছে।

ক্লিওপাত্রা চেয়েছিল কোনো বিচিত্র অভিসার,—একেবারে অপ্রত্যাশিত কিছু! রহস্যময় বেগে ছুটে আসছে ওই যে ডিঙ্গিটি, ওখানেই রয়েছে হয়ত কোনো আশ্চর্য অভিযান,—কোনো আশ্চর্য অভিযানকারী!

বিশ বছর বয়সের সুন্দর এক যুবক সে, ঘন কালো তার কেশরাশি, সোনার মত রঙ, দেহগঠন এত নিখুঁত মনে হয় যেন কুঁদে-গড়া এক দেবমূর্তি। বহুক্ষণ ধরে ডিঙ্গি চালাতে থাকলেও তার কপালে দেখা দেয়নি একবিন্দু ঘাম, দেখা দেয়নি ক্ষীণতম ক্লান্তির ছাপ।

দিগন্তের আড়ালে সূর্য ডুবে গেছে আধখানা—আর সেই অর্ধবৃত্তাকার সূর্যের পিছনে ছবির মতো দিগন্তে ফুটে উঠেছে শহর-ছবি। নিভে গেল আলো, আকাশে ফুটে উঠল মুঠো মুঠো তারাফুল···পানসিটি এসে থামল প্রকাণ্ড এক মর্মর-সোপানের নিচে,—পিছুপিছু সেই ডিঙ্গিটি। সোপানের দুপাশে সারি-বাঁধা সেই পাথুরে স্ফীংক্সের মূর্তিগুলি। রাণীর গ্রীষ্মভবনের এই অবতরণ-স্রোপ্যান। দুপাশে আলো হাতে সারি বেঁধে

দাঁড়িয়ে আছে ক্রীতদাসীরা। ক্লিওপাত্রা চার্মিয়নের কাঁধে ভর করে চকিতে এগিয়ে গেল,—মিলিয়ে গেল যেন একটি উজ্জ্বল স্বপ্ন!

যুবকটি নৌকোর তলা থেকে মস্ত একটা সিংহের চামড়া তুলে কাঁধের উপর ফেলল, তীরের উপরে টেনে তুলল ছোট্ট ডিঙিখানি, তারপর এগিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে।

॥ ৩ ॥

রাণীর পানাসির পিছু নিতে সাহস করে—কে সে? কী ভেবেছে সে? সত্যিই, বিচিত্র চরিত্রের যুবক এই মিয়ামন। সাধারণ মানুষ যাতে অভিভূত হয়ে পড়ে, তাতে তার মন একটু টলে না।···তার চোখে যেন শিকারী বাজপাখীর দীপ্তি, আর মর্মর-বেদীর প্রশান্তি তার ললাটে। একটি পরম গর্বে বাঁকিয়ে রয়েছে তার উপরের ঠোঁটটি,—নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে রয়েছে তেজীয়ান ঘোড়ার মতো। তবু দেহখানি তার কুমারীর দেহের মতোই লাবণ্যময়! নেপ্থি—রোমের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে নেপ্থিও ভালোবাসে এই মিয়ামনকে। কিন্তু মিয়ামন একবার চেয়েও দেখে না নেপ্থির বড় বড় কালো চোখ দুটি কামনার অরুণালোকে হয়ে উঠেছে কেমন অপরূপ, একটি রাঙা হাসি কেমন আলো করে আছে তার মুখখানি, মুক্তোর মতো কেমন ঝলমল করছে দাঁতগুলি, বাহু দুটি কেমন নিটোল কোমল, নিখুঁত পা দুটি দেবীর চরণ-কমলের মতো! সমস্ত মিশরেও তার মতো ছোট্ট দুটি হাত, আর অমন লম্বা চুলের বাহার আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, একমাত্র ক্লিওপাত্রাই এই রূপকে হার মানাতে পারে। কিন্তু ক্লিওপাত্রা,—কার এমন সাহস ক্লিওপাত্রাকে ভালোবাসতে যাবে?

কিন্তু এই ক্লিপপাত্রাকেই ভালোবাসে মিয়ামন!

প্রথমে সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে এই ভালোবাসাকে বল্গার বাঁধনে বাঁধতে,—ভয়ানক চেষ্টা করেছে। কিন্তু সিংহকে গলা টিপে মারা যায়,—ভালোবাসাকে নয়। ভালোবাসার দ্বন্দ্বে দিগ্বিজয়ীর কলাকৌশলও হার মানে। মিয়ামনের হৃদয়-ক্ষতে বিঁধে গেছে এক তীক্ষ্ণ শর,—আর সেই শর সে বয়ে ফিরছে সারা দিনরাত। মিয়ামন স্বপ্ন দেখে রাতে: একটা সমগ্র বিস্ময়-বিমুগ্ধ দেশের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লিওপাত্রার উজ্জ্বল

অপরূপ দেহপ্রতিমা। স্বপ্ন দেখে জাগরণে! কোনো বেপরোয়া যুবক সূর্যের মুখে চেয়ে থাকলে তার চোখের সামনে দিনের পর দিন যেমন ঘুরতে থাকে একটা উজ্জ্বল বিন্দু—তেমনিই মিয়ামন দেখল ক্লিওপাত্রাকে। সূর্যের দিকে চেয়ে ঈগলের চোখ ঝলসাতে না পারে, কিন্তু কোন্ সে হীরক-চোখ অনাহত ভাবে নজর করে দেখতে পারে অপরূপ সুন্দরীকে—অনিন্দ্যসুন্দরী রাণীকে ?· ····

রাণীর প্রেমে-পড়া সত্যিই বড় বিচিত্র। এ যেন প্রেমে পড়া কোনো সুদূর তারকার! অথচ সেই তারাই রাতের আঁধারে আকাশ-পটে তার আসনে এসে বসে ঝলমল রূপ নিয়ে। এ যেন এক রহস্যময় অভিসার! বারবার চেয়ে চেয়ে তাকে শুধু দেখতে পারো, সে রাগ করবে না। এ কি দুঃখ, এ কি ব্যথা! অচেনা অজানা এককোণে সুউচ্চ সোপান-শ্রেণীর কোন্ তলায় পড়ে থাকা,—আর বুক ফেটে মরা উজ্জ্বল এক স্বপ্ন-প্রতিমার দিকে তাকিয়ে, একটি নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে—যার একটা দাসীও দেখবে তোমাকে ঘৃণার চোখে। একটিবারও যে তোমার মুখে চোখ তুলে চাইছে না, কোনোদিন চাইবেও না—তার দিকেই আমরণ চেয়ে থাকা! তোমাকে হাজারবার হয়ত সে দেখবে—কিন্তু একবারও চিনবে না, তার কাছে তুমি জনসমুদ্রের একটি নগণ্য বিন্দুমাত্র। অনন্য কবিশক্তি বিরাট-প্রতিভা অথবা কোনো লোকাতীত গুণ—এমন কিছুই তো তোমার নেই যে তার সংগে কথা বলবার সুযোগ পেলেও তার সদ্ব্যবহার করতে পারবে। আছে কি, আছে শুধু ভালোবাসা।

ভাবে-ভাবনায় বিভোর হয়ে রইল মিয়ামন! বালুর উপর শুয়ে দু' হাতের মধ্যে চিবুকটি রেখে সে নিজেকে ভাসিয়ে দিল দিবাস্বপ্নের অকূরন্ত স্রোতে। কতরকম পরিকল্পনা করল, উন্মাদের পর উন্মাদ পরিকল্পনা। সে জানে আকাশে হাত বাড়িয়েছে চাঁদ ধরতে, তবু তখনি তার কানে কানে কথা বলে যায় কোন্ গোপন সম্ভাবনা। প্রেমের দেবীর কাছে সে আপন হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করে,—'এমন কি অপরাধ করেছি তোমার পায়ে দেবী, আমাকে তুমি যে এমন শাস্তি দিচ্ছ! নেপ্থির প্রতি আমি বিরূপ বলেই কি তুমি প্রতিশোধ নিচ্ছ আমার উপর! দুর্লভ প্রেমের বিষাক্ত শরে আমার হৃদয়কে কেন আর রক্তাক্ত করছ, দেবী!'

কিন্তু সমস্ত দেবদেবীর মতোই প্রেমের দেবীর কাছ থেকেও জবাব এল না কোনো। মিয়ামন স্থির করল—নামবে সে জীবন-মরণ অভিযানে।

ক্লিওপাত্রাও প্রার্থনা করছিল,—প্রার্থনা করছিল নতুন কোনো সুখের জন্যে, নতুন কোনো শিহরণের জন্যে। ক্রীতদাসদের উপরে নতুন-নতুন বিষ পরীক্ষা করা, মানুষকে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধে নামানো, মুক্তো গলিয়ে পান করা, একটা প্রদেশের সমস্ত সম্পদরাশি এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলা—এসবই বড় পুরাতন বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে।

চার্মিয়নের বুদ্ধিতে কুলোয় না, তার রাণীর জন্যে এখন কী করবে ভেবেই পায় না।

হঠাৎ শোনা গেল শন্‌শন্‌ আওয়াজ, এবং সেই মুহূর্তেই একটা তীর জানালার কাঠে বিঁধে গিয়ে কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে।

ক্লিওপাত্রা ভয়ে মূর্ছিতপ্রায়। চার্মিয়ন জানালায় ছুটে এল, ঝুঁকে পড়ে দেখল—নদীর বুকে জেগে আছে কয়েকটি ফেনা শুধু। আর দেখল, তীরের মাথায় একটি পত্রলেখা। ফিনিশীয় অক্ষরে সেখানে লেখা শুধু—'তোমাকে ভালোবাসি!'

॥ ৪ ॥

'তোমাকে ভালোবাসি!'—আবৃত্তি করল ক্লিওপাত্রা তার কোমল আঙুলগুলির মাঝে লেখাটুকু নিয়ে—'ঐ কথাটি শুনবার জন্যেই যে পথ চেয়ে ছিলাম! আমার মনের কামনা এমন করে কান পেতে শুনলেন কোন্‌ অদৃশ্য দেবতা!'

নিঝুম ক্লান্তি থেকে সহসা জেগে উঠল ক্লিওপাত্রা……পুশি বেড়াল শিকারের গন্ধ পেলে যেমন চকিত ভঙ্গিতে লাফিয়ে পড়ে—সেও তেমনি করে ছুটে এল জানালায়। চার্মিয়ন সেখানটায় দাঁড়িয়ে তখনো চেয়ে ছিল অপলক চোখে।

স্বচ্ছশান্ত রজনী। চাঁদ উঠেছে। আকাশের নীলাভ পটের উপর আলোছায়ার তুলি-রেখায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে প্রাসাদের সকোণ ছবি। প্রাসাদের ছায়া প্রসারিত হয়ে পড়েছে নীলনদের ঝলমল জলে। ধীর সমীরণ কাঁপিয়ে তুলেছে ঝোপঝাড়, দোলা দিচ্ছে পদ্মের নীল পাপড়ি-গুলিতে। সমীরণ নয়, মনে হবে যেন বয়ে চলেছে ঘুমন্ত স্ফীংক্সের নিশ্বাস। নীলের তটে নোঙর-করা তরণীগুলির কাছিতে পড়ছে মৃদু টান, উঠেছে মৃদু আর্তনাদ……প্রাচ্যভূমির সম্মোহন-রজনী……

'ঐ যে বহুদূরে নদীর মাঝামাঝি একটি সাঁতারুর মাথা দেখা যাচ্ছে। আলো-পথ ছাড়িয়ে সে এসে পড়ল দূরান্তরে ছায়ায়। না, আর দেখা যাচ্ছে না তো!'—চার্মিয়নের কাঁধে ভর করে ক্লিওপাত্রা তার অপরূপ দেহলতার আধখানা ঝুঁকিয়ে দিল জানলার বাইরে—ঐ রহস্যময় সাঁতারুকে একটিবার দেখতে চায়! কিন্তু সেইদিকে নদীর উপর এসে পড়েছে তালকুঞ্জের ঘনকালো ছায়া, আড়াল করে রেখেছে দুঃসাহসী পলাতককে। মিয়ামন যদি একটিবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছু তাকাত তবে দেখতে পেত: রাত্রির বিষণ্ন অন্ধকারের বুক চিরে তাকেই খুঁজে ফিরছে রাণী ক্লিওপাত্রা! আর, সে কিনা—একজন নগণ্য মিশরবাসী, হতভাগ্য এক সিংহ-শিকারী!

'চার্মিয়ন চার্মিয়ন! সর্দার-মাঝিকে শিগগির পাঠিয়ে দাও, দুখানা ছিপ নিয়ে ছুটে যাক ঐ লোকটির খোঁজে।'—ক্লিওপাত্রা যেন চেঁচিয়ে ওঠে, তার ঔৎসুক্য এবার ছাড়িয়ে গেছে সকল সংযমের সীমা······

দুটি ছিপ পঁচিশ-পঁচিশ বৈঠাদারের হাতে ছুটে চলল নীলের জল কেটে। নদীতটের এদিক ওদিক বিশেষ নজর রেখে খোঁজাখুঁজি করা হ'ল, প্রত্যেকটা ঝোপ দেখা হ'ল তচনচ ক'রে। নিরালা প্রান্তে একপায়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছিল কোনো সারস, উড়িয়ে দেওয়া হ'ল তাকে; কোনো কুমীর বসে বসে ভোজন-পর্ব সমাধা করছিল, ভয় খাইয়ে দিল তাকে। কাজের মধ্যে এটুকুই হ'ল; তারপর তারা ফিরে এল প্রাসাদে।

ক্লিওপাত্রার ইচ্ছে হ'ল সর্দার-মাঝিকে ছুঁড়ে দেয় হিংস্র জানোয়ারের মুখে, লাগিয়ে দেয় পাথুরে ঘানি টানতে······চাওয়ামাত্রই সাধ পূরণ হ'ল না—এমন ঘটনা ক্লিওপাত্রার জীবনে এই প্রথম। একটা অস্বস্তিকর বিস্ময় জেগে উঠল তার অনুভূতির জগতে। প্রথমে সন্দেহ হ'ল—সে নিজে সত্যিসত্যিই সর্বশক্তিময়ী কিনা!······দেবী ক্লিওপাত্রা—তারও চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে এসে দাঁড়ায় বাধার প্রাচীর!

'আপনি আর যা চান সবি পেতে পারেন, তবে এই যে জানলার কাঠে বিঁধে গিয়ে এখনো থরথর করে কাঁপছে তীরটি—ওটি যে ছুঁড়ে মেরেছে তাকে খুব সম্ভব আজ রাতে নিশ্চিতই পাবেন না!'

কিন্তু কে সে দুঃসাহসী, তীরের মুখে পাঠাল তার হৃদয়ের কথা? সে কি নোমার্ক—নিজেকে যে সুন্দরভাবে সূর্যদেবতার চেয়েও? তুমি কি বলো, চার্মিয়ন? অথবা সে কুশ-বিজয়ী সেনাপতি সেপ্‌চিরো? অথবা তরুণ সেক্সটাস?'

'রাণী, এদের কেউই নয় !······এদের কেউ এমন দুঃসাহসের—এমন জীবন-মরণের ব্যাপারে মাথা গলিয়ে দেবে না। রাণীকে তারা অতটা ভালোবাসে না !······কাল পার্নাসিতে বসে আপনি বলেছিলেন, লোকে আপনার মুখের দিকে চোখ মেলে তাকাতে ভরসা পায় না : তারা জানে শুধু আপনার সামনে ভয়ে বিবর্ণ হতে,—জানে আপনার পায়ে পড়ে করুণা ভিক্ষা করতে······তা, আজ পেলেন একটি একনিষ্ঠ তরুণ প্রাণ— সত্যিই যে আপনাকে ভালোবাসে। এবার কি করবেন তা নিয়ে ?'— চার্মিয়ন বলে যায়।

সেদিন রাতে ক্লিওপাত্রা বৃথাই দুচোখ বুঁজতে চেষ্টা করল বারবার— পালঙ্কে শুধু এপাশ ওপাশ করে কাটাল, বৃথাই বারবার আহ্বান করতে লাগল তার মৃত্যু-দেবতাকে। বারবার আপনমনে বলতে লাগল—সারা দুনিয়ার সবচেয়ে অসুখী রাণী সে-ই ! চার্মিয়ন এসব কথায় কণামাত্রও অভিভূত হ'ল না, তবু শুনতে শুনতে ধারণ করল সহানুভূতির ভাব।

······ওদিকে মিয়ামন ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীলের বুকে, স্রোত উজিয়ে মাঝিদের আগেই উঠে এসেছে এক তালকুঞ্জে। এমন কি তার খোঁজে তখনো ওরা নৌকোই ছাড়েনি !

মিয়ামন লম্বা একটা দম টেনে নিয়ে কালো চুলগুলি হাত দিয়ে বিন্যস্ত করে দিল পিছনে। এবারে সে নিশ্চিন্ত খানিকটা, তার অন্তরে এসেছে শান্তি। তারই কিছু-একটা চলে গেছে ক্লিওপাত্রার হাতে,—তাদের দুজনের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে একটা যোগাযোগ। ক্লিওপাত্রা ভাবছে তাকেই,—মিয়ামনকেই ! হয়ত সে ভাবনা হ'ল ক্রোধের, তবুও সে তার বুকেই একটা অনুভূতির আলোড়ন জাগাতে পেরেছে তো ! তা, ভয়ই হ'ক, ক্রোধই হ'ক, বা করুণাই হ'ক। তার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুলেছে তো ! পত্রে তার নিজের নামটা অঙ্কিত করে দিতে ভুলে গেছে সত্যি, কিন্তু নামাঙ্কন থেকে তার সম্বন্ধে কী আর বেশী জানত সে ? তার চোখে তো রাজা-ভৃত্য সবই সমান। তা, কোনো দেবী রাজা-মহারাজার বদলে এক রাখালকে ভালোবাসলে তো আর ছোট হয়ে যায় না !

জগদ্দল পাথরের মতো যে ভাবনাটি তাকে পিষে মারছিল তা থেকে যেন মুক্তি পেল মিয়ামন···মিয়ামন দেবতার নামে শপথ করল : একটি রাতের জন্যে—শুধু একটি প্রহরের জন্যে হ'লেও ক্লিওপাত্রার প্রেম লাভ করবে, এতে যদি জীবন বিসর্জনও দিতে হয় সেও ভালো।

যাকে শুধু দূরে থেকে দেখেছে, যার সামনে চোখ তুলে একটিবার তাকাতেও সাহস পায়নি—তাকেই সে কেমন ক'রে এমন পাগলের মতো ভালোবাসল? এক খেয়ালের মাথায় ছড়িয়ে-দেওয়া প্রেমের বীজ কী করে এত চকিতে শিকড় মেলল গভীরে গিয়ে? এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলা যায় —সে এক রহস্য, দুর্ভেদ্য রহস্য!

বৈঠাদারদের নিয়ে সর্দার-মাঝি ফিরে গেছে নিশ্চিন্ত বুঝেই আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলের স্রোতে, আবার সাঁতারে এল প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদের জানালার পর্দার আড়ালে তখন আলো জ্বলছিল—একটি চিত্রিত তারা।

প্রাসাদ-প্রাচীরের গা ঘেঁষে চলল সে সাঁতার কেটে। মর্মর-প্রাচীরের নিচু দিকটা তলিয়ে রয়েছে নদীর গভীরে। মিয়ামন এক পলক থমকে দাঁড়াল একটা জলমগ্ন অর্ধচন্দ্রাকার খিলানের কাছে। সেই খিলানের মধ্য দিয়ে জলস্রোত ছুটে চলেছে ঘূর্ণিপাকে। দু-তিনবার সে ডুব দিয়ে দেখল—তারপর হঠাৎ খুঁজে পেল প্রবেশ-পথ, এবং অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে।

এই খিলান-পথে এগোলেই পড়বে একটা নালা, নীলের জল সেই নালাপথে নামছে এসে ক্লিওপাত্রার স্নানাগারে।

॥ ৫ ॥

স্বপ্নেরা যখন ডানা মেলে ফিরে যায় তাদের গজদন্ত-মিনারে—সেই ভোর অবধি ক্লিওপাত্রা একটুও বিশ্রাম নিতে পারেনি। অর্ধ-জাগরণে স্বপ্ন-মরীচিকার মাঝে সে দেখতে লাগল: কত প্রণয়ী সাঁতারে আসছে নদী, বেয়ে উঠছে দেয়াল—তারই কাছে আসবার জন্যে, আর তার স্বপ্নের সংগে রহস্যের মতো জড়িয়ে গেল প্রণয়-লিপি-বেঁধা তীরটি। অনিদ্রার ও অস্বস্তির মাঝে ছটফট করছিল সে। চার্মিয়ন তার পা-বালিশের স্থান নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল বিছানার একপ্রান্তে; হঠাৎ ক্লিওপাত্রার ছোট্ট পা-দুটির লাথি এসে লাগল চার্মিয়নের বুকের উপর।

রাণী যখন চোখ খুলল, জানালার পর্দার ফাঁকে ফাঁকে লুটোপুটি খাচ্ছে খুশিভরা সোনার রোদ!...রুগ্ন শিশুর মতো ক্ষীণস্বরে ক্লিওপাত্রা

তাকে তুলে নিতে বলল। দুটি পরিচারিকা তাকে বাহুতে তুলে নিয়ে আলগোছে শুইয়ে দিল মেঝেতে বিছানো বাঘের চামড়ার উপর, দুধের চেয়েও সাদা সূক্ষ্ম-বসন পরিয়ে দিল তার অঙ্গে অঙ্গে, রুপালি তারে জড়িয়ে দিল চুলের গোছা···

ক্লিওপাত্রার স্নানাগারে সময় হ'ল। পরিচারিকাদের সঙ্গে স্নানে গেল ক্লিওপাত্রা।

সুবিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে রাণীর স্নান-নিকেতন। চারদিকে দেশী বিদেশী তরুলতার সারি আর কুঞ্জবন। লাল পাথরের সোপান-শ্রেণীর উপর দিয়ে ওঁচিয়ে উঠেছে নানা লতা, তাদের ফুলগুলি যেন আকাশ-ছোঁয়া ···কত অপরূপ নারী-মূর্তি চারদিকে। কী নিখুঁত তাদের নাসারন্ধ্র, কী নিটোল দুটি স্তন! কারো দেহের নিম্নভাগ মাছের লেজের মতো, কারো দেহভঙ্গি ডানা-মেলে-দেওয়া পাখীর মতো।

এইসব অদ্ভুত মূর্তি সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লিওপাত্রার প্রাসাদ থেকে স্নানাগারের হলঘর পর্যন্ত। এই পথের শেষে ঝরে পড়ছে বিরাট এক ফোয়ারা, চারদিক থেকে চারটি সোপানশ্রেণী নেমে গেছে নিচে। হীরক-স্বচ্ছ গভীর জলের তলদেশটা দেখা যাচ্ছে, স্পষ্ট—সিঁড়ির ধাপগুলি নেমে গেছে বিরাট এক জলাধারের তলদেশে। জলাধারের তলদেশে বালু নয়, ছড়ানো রয়েছে স্বর্ণরেণু! অনিন্দ্য-সুন্দর নারীমূর্তি কত বেদীস্তম্ভে দাঁড়িয়ে রয়েছে জলের উপর, তাদের স্তনাগ্র থেকে উৎসারিত হচ্ছে সূক্ষ্ম সুরভিত জলধারা, পড়ছে এসে জলাধারের মধ্যে। আরশি-স্বচ্ছ জলে জেগে উঠছে কম্পন-রেখা।

এ ছাড়াও সাত-আটটি হলঘর রয়েছে, তাপ-বৈচিত্র্যে রমণীয়। কোথাও গরম বাষ্প, কোথাও বা হিম, রয়েছে সুগন্ধি-কুঠুরী, রয়েছে তেল, রঞ্জনী ও গাত্রমার্জনার পাথর,—কামনা-বিলাসের চূড়ান্ত উপকরণ-সম্ভার।

চার্মিয়নের কাঁধে ভর করে এখানেই নেমে আসছিল ক্লিওপাত্রা। কম করেও ত্রিশটি সিঁড়ি সে কি নিজে নিজেই নেমে আসেনি! বড় কঠোর শ্রম, বড় গভীর ক্লান্তি! তার গালের স্বচ্ছ চামড়ার তলে তলে ফুটে বেরুচ্ছে রক্তাভা,—মুছে দিয়েছে মুখের উপরকার কামনার পাণ্ডুর ছায়াটি। মর্মর-শোভন অনিন্দ্য-গঠন কপাল, তার মাঝখান থেকে শোভা পাচ্ছে কুঁদে-গড়া একটি নাক; গোলাপী রঙ—ফুটে-বেরুচ্ছে যেন। নাসারন্ধ্র ঈষৎ কামনার আবেগেও ফুলে ফুলে উঠতে থাকে, কাঁপতে থাকে—কামোন্মত্তা

বাঘিনীর নাসারন্ধ্রের মতো! তার ওষ্ঠে বাঁকিয়ে রয়েছে ঘৃণা-রেখা, তবে একটা উদ্দাম কামনা একটা অবর্ণনীয় জীবন্ত উত্তাপ জ্বলে জ্বলে উঠছে যেন লাল টকটকে অধরে! সে যেন আগুন······এমন কি, তাকে দেখলে দেবতারাও লুব্ধ না হয়ে পারে না।

উপর-সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল ক্লিওপাত্রা—গর্বিত লীলাভঙ্গিতে, দাঁড়িয়েছে তার ঊর্ধ্বাঙ্গ পেছন দিকে একটুখানি হেলিয়ে, সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে একখানি পা। মনে হয় যেন আকাশের দিকে চেয়ে বেদীভূমি ছেড়ে উড়ে চলেছে এক দেবী! তার পোশাক স্তন-চূড়া থেকে খসে গিয়ে দুভাঁজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল পায়ের তলায়। শিল্পী ক্লিমোনিস যদি বেঁচে থাকতেন, আর তাকে এই রূপে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করতেন—তবে তার ভিনাস মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলতেন মর্মান্তিক হতাশায়!

জলে নামবার আগে চার্মিয়নকে ডাক দিল সে। একটা নতুন সাধ হয়েছে। চুল থেকে রূপোর জাল খুলে ফেলবে, পরবে পদ্মফুল আর জলপাতা। ঠিক জলপরীর মতো! চার্মিয়ন কথামতো কাজ করে গেল। মুক্ত কেশজাল ছড়িয়ে পড়ল, কালো কালো চূর্ণ-অলকে ঢেকে দিল কাঁধ, ঘিরে রাখল তার সুন্দর গাল দুটি।

গায়ে জড়ানো শুধু একখানি সূক্ষ্ম সুতোর বসন—একটি সোনার কটিবন্ধনে আঁটা। এবারে তাও খুলে পড়ল তার মর্মর-তনু বেয়ে বেয়ে, পায়ে এসে জড়ো হ'ল একখানি শুভ্র মেঘের মতো। দেবী লিডার পদ-তলের শুভ্র রাজহংসীটি যেন!

আর, মিয়ামন তখন কোথায়?

হায় হায়, এ কি নিষ্ঠুর নিয়তি! কত জড় পদার্থের উপরেও তো বর্ষিত হয় সুন্দরীর অনুগ্রহ, অথচ সেইটুকুই হাতে পেলে স্বর্গ পেত কোনো প্রেমিক পুরুষ! সাধনার দেবীর মতো তার সুন্দর তনুলতাটিকে জলরাশি জড়িয়ে ধরেছে একটি সর্বাংগীণ চুম্বনে, তবু সে তো জানে না তার কী নিবিড় সুখ!

ক্লিওপাত্রা তার রাঙা পা দুটি জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে কয়েকটি সিঁড়ি নামল। অমনি তার কোমরে এসে বন্ধনী জড়িয়ে দিল যেন রূপালি-চঞ্চল জলরেখা, বাহুতে পরিয়ে দিল বলয়! চঞ্চল জল মুক্তোর মতো ছোট ছোট ঢেউয়ে দুলে দুলে ভেঙে পড়ল তার বুকের উপর, কাঁধের উপর। একটি মুক্তোর কণ্ঠহার ছিঁড়ে যেন ছড়িয়ে পড়ল মুক্তোগুলি! কেশরাশি

স্রোতের টানে ছড়িয়ে পড়েছে তার পিছন দিকটা জুড়ে। এদিক ওদিক সাঁতার কাটছিল সে, ডুব দিয়ে দিয়ে তুলে আনছিল স্বর্ণরেণু, আর হাসতে হাসতে ছুঁড়ে মারছিল পরিচারিকাদের গায়ে।

হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল। কাছের ঝোপে দেখেছে সে একটা চোখ! হলদে, ফসফরাসের মতো জ্বলছে—কুমীরের বা সিংহের চোখের মতো

ঐ হ'ল মিয়ামন! গুঁড়ি মেরে বসে ছিল একগোছা পাতার পেছনে॥ রাণীর স্নানলীলা দেখার বিপজ্জনক এক ভয়ঙ্কর সুখে সে আত্মহারা হয়ে ছিল, দেহ রোমাঞ্চিত হচ্ছিল—গমক্ষেতে তৃপ্ত হরিণের দেহের মতো! একান্ত একরোখা সাহস থাকলেও ক্লিওপাত্রার চিৎকার তার বুকের মধ্যে বিঁধল গিয়ে—তীক্ষ্ন তলোয়ার-ফলক মৃত্যুর হিম-স্বেদে ঢেকে গেল সর্বাঙ্গ, সমস্ত মুখের শিরাগুলি দপ দপ করতে লাগল তীব্র বেগে একটা ভয়ঙ্কর ভয় লৌহ-হস্তে টিপে ধরেছে তার গলাটা।

বর্শা-হাতে ধেয়ে এল নপুংসক দল। ক্লিওপাত্রা দেখিয়ে দিল একটা ঝোপ। মিয়ামনকে তারা সেখানে লুকিয়ে থাকতে দেখল। আত্মরক্ষার চেষ্টার কোনো অর্থই হবে না,—কাজেই সে চেষ্টা করল না, ধরা পড়ল। নপুংসকদের স্বভাবোচিত নৃশংসতায় তারা তাকে হত্যাই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্লিওপাত্রা ইতিমধ্যে দেহে একটা বসন জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে এল, তাদের নিবৃত্ত হতে ইশারা করল, বন্দীকে নিয়ে আসতে বলল তার সামনে।

মিয়ামন নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনায় তার দিকে বাড়িয়ে দিল হাত দু'খানা।

'যে পবিত্র ভূমিতে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ কী উদ্দেশ্যে ঢুকলে সেখানে? রোমের ঘুষ খেয়ে এসেছে তুমি কোনো গুপ্তঘাতক?'

'আপনার প্রতি যদি আমি একটুও কুমৎলব পোষণ করে থাকি তবে শাস্তি দিন আমাকে।'

সততা আর আনুগত্য এত স্পষ্টভাবে লেখা তার চোখে মুখে যে নিমেষেই অন্তর্হিত হ'ল ক্লিওপাত্রার সমস্ত সন্দেহ। তার চোখের দৃষ্টির ক্রোধ আর কাঠিন্য কিছুটা কমে এল যেন। যুবকটি সুন্দর,—ক্লিওপাত্রা চেয়ে চেয়ে দেখল।

'তাহলে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনে-শুনেও তুমি কোন্ মৎলব ঢুকছে এখানে?'

'আপনাকে ভালোবাসি আমি।'—নম্র কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে বলল মিয়ামন। আবার ফিরে এসেছে তার সাহস,—চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পড়লে যেমনটা হয়।

'আ-হা!'—মিয়ামনের কাছে ঝুঁকে পড়ে তার একখানি বাহু খপ্ করে ধরে বলে ওঠে ক্লিওপাত্রা,—'তাহলে তুমিই পত্রলেখা ছুঁড়ে মেরেছিলে তীরের মুখে! সত্যি বলছি, খুব একরোখা লোক তুমি তো হে!··· এবারে চিনেছি তোমাকে। আমার বাসভবনের আশেপাশে চঞ্চল ছায়ার মতোই ফিরতে দেখেছি তোমাকে······দেবী আইসিসের মিছিলে, হারমনথিসের উৎসবে দেখেছি তোমাকেই: পিছু নিয়েছিলে আমার পানসির! ও. তোমার একটি রাণী দরকার!···তোমার আশা তো খুব ছোট নয়! তা,—তুমি বেশ ভালো কিছু প্রতিদানই প্রত্যাশা করছ নিশ্চয়···সত্যিই তোমাকে ভালো না বেসে পারি?···তুমিই বলো!'

মিয়ামনের চোখে মুখে ফুটে উঠল গভীর বেদনার ছায়া,—'রাণী, আমাকে ভর্ৎসনা করবেন না। আমি আজ পাগল—সেকথা সত্যি। মৃত্যুই আমার যোগ্য প্রতিদান,—তাও জানি আমি। দয়া করুন, এবং এখনি আমার জীবন অবসান করুন।'

'না, আজ আমি নিষ্ঠুর হব না ঠিক করেছি। আমি তোমাকে জীবন দান করব।'

'আমার জীবন দিয়ে কী হবে বলুন! আমি যে আপনাকে ভালোবাসি!'

'তবে তাই হোক, মৃত্যুই হবে তোমার। বল্গা-ছেঁড়া উন্মাদ স্বপ্নে গা ভাসিয়েছ তুমি; কল্পনার ডানায় তোমার কামনা পেরিয়ে গেছে সম্ভাবনার সমস্ত সীমারেখা। নিজেকে ভেবেছ তুমি সীজার বা এন্টনির মতো! তুমি ভালোবেসেছ রাণীকে! প্রলাপ-স্বপ্নের মাঝে হয়ত বা কখনো—কালোস্রোতের মাঝখানে কোনো এক দিব্য মাহেন্দ্র লগ্নে—বিশ্বাস করেছ ক্লিওপাত্রা ভালোবাসবে তোমাকেই! তা, এতদিন ভেবেছ যা স্বপ্ন শুধু, আজ তাই সত্যি হয়ে উঠবে তোমার জীবনে। তোমার স্বপ্নকে আমি সার্থক করে তুলব। একটি উন্মাদ আশাকে সফল রূপ দেব······ছিলে সিঁড়ির তলায়, আমি তোমাকে আচমকা তুলে নেব শিখর-চূড়ায়। শূন্যদেশ থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে দেবতা বানাব,—

তারপর আবার ছেড়ে দেব শূন্যতার মাঝখানে। বেশ, তাই হোক! আমাকে কিন্তু নিষ্ঠুর বলবে না, ভিক্ষে চাইবে না আমার করুণা। নেমে আসবে যখন শেষের প্রহর, টলবে না। এই মুহূর্তেই তোমাকে হত্যা করার আদেশ দিতে পারি, কিন্তু তুমি বলেছ আমাকে ভালোবাসো!···আজ রাতে তোমার জীবন হোক আমার। তা বলে নিষ্ঠুর নই আমি, তোমার কাছ থেকে বিনামূল্যে নেব না···কিন্তু একি, আমার পায়ের উপরে কেন? ওঠো, হাতে হাত দাও,—চলো প্রাসাদে যাই।'

॥ ৬ ॥

······বাঞ্ছিত রজনী হবে অনিন্দ্য অভিনব। মানব জীবনের সমস্ত আনন্দ ও উল্লাসে উপচে পড়বে কয়েকটি প্রহর। তারপর মৃত্যু···স্বেচ্ছা-মৃত্যু হ'লেও আসে যেন অদৃশ্যরূপে একান্ত অগোচরে।

প্রমোদভবন। ক্লিওপাত্রা ও মিয়ামন ঘনিয়ে এসেছে এ-ওর কাছে ······ক্লিওপাত্রার ওষ্ঠে হাসি ফুটে আছে, তবু যেন কী ভাবনার ছায়া পড়েছে তার শুভ্র ললাটে, মাঝে মাঝে ভ্রূ-রেখা কুঞ্চিত হচ্ছে যেন কী জ্বরালো নেশায়। কোন্ সে ভাবনা রাণীকে বিব্রত করতে পারে? আর, মিয়ামনের মুখে ফুটে আছে একটি উজ্জ্বল প্রেমের স্বপ্ন। তার প্রতিটি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে বুকভরা একটা গভীর আনন্দ। চঞ্চলা দেবীকে পেয়েছে সে আলিঙ্গনের মধ্যে,—আলিঙ্গন থেকে সে তো সরে যায়নি! সে এসে পৌঁছেছে তার জীবনের আদর্শে! তার সবচেয়ে পাগল স্বপ্নও সফল হয়েছে, দুনিয়ায় তার আর চাইবার নেই কিছুই!

ক্লিওপাত্রা মিয়ামনকে এনে বসাল তার পাশে সিংহাসনের উপর, তারপর হাততালি দিল ছোট্ট দুটি হাতে। আর, পলকের মধ্যে জ্বলে উঠল সারি সারি প্রদীপ, ঝলমল করে উঠল বিচিত্র ভাস্কর্য, জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল স্ফীংক্সদের জোড়া জোড়া চোখ, বৃষ-শির মূর্তিগুলি ফেলতে লাগল স্ফুলিঙ্গ-নিশ্বাস, দেয়াল থেকে প্রসারিত সারি সারি ব্রোঞ্জ-হাতে ধরা কারুকার্য-খচিত যে মৃণাল ও পদ্মফুল,—আলো জ্বলে উঠল তাদের মর্মকোষে!······সমস্ত কিছুই যেন প্রাণ পেল এক সঞ্জীবনী মন্ত্রে।

কালো পাথরের ভেড়াগুলি ডেকে উঠল ব্যঙ্গ-স্বরে, তাদের শৃঙ্গে শৃঙ্গে তুলল বিচিত্র সমর-ঝনঝনা! দেবমূর্তিগুলির বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে পড়তে লাগল সঘন নিশ্বাস।

জমে উঠেছে রাত্রির উৎসব। বিচিত্র পাত্রে সাজানো রয়েছে অতিবিচিত্র খাদ্যসম্ভার,—সারি-সারি পালঙ্কে হেলান দিয়ে বসে বসে খাবার জন্যে। গোলাপের মালা দিয়ে সাজানো পানপাত্র, তাতে টলটল করছে সুরা। বাজনদারেরা বাজিয়ে চলেছে সাম্বুক দুন্দুভি; একুশ-তারের বীণা-ঝঙ্কারে ঝমঝম করছে সমস্ত উৎসব-ভবন। ভয়ঙ্কর বজ্র-গর্জনও সেখানে শোনা যাবে না!

মিয়ামন মাথা এলিয়ে দিয়েছে ক্লিওপাত্রার কাঁধের উপর,—যেন লোপ পেয়ে আসছে তার চেতনা। সমস্ত ভোজ-ভবনই চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে যেন—দুঃস্বপ্নের মতো! তার হাতের মধ্যেই ক্লিওপাত্রার কোমল শীতল হাতটুকু—এই চেতনাটুকু না থাকলে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হ'ত কোন্ ঐন্দ্রজালিক প্রভাবেই সে বুঝি চলে এসেছে এক রূপকথার দেশে!

উৎসব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শেষ হয়ে গেছে কুঁজো বামন ও মুখোশধারীদের নৃত্য এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ। মিশরীয় ও গ্রীসীয় যুবক-যুবতীরা নেচে গেল অপরূপ লীলাভঙ্গীতে উন্মাদনা জাগিয়ে।

এবারে ক্লিওপাত্রা উঠে দাঁড়াল সিংহাসন থেকে, খুলে ফেলে দিল রাণীর পোশাক, মুকুটের জায়গায় পরে নিল ফুলের মালা, পায়ে পরে নিল শিঞ্জিনী। নৃত্যলীলা শুরু হ'ল মিয়ামনের সামনে! হাত দুখানি লীলায়িত হতে লাগল ছন্দে ছন্দে, আর বেজে উঠল শিঞ্জিনীর ধ্বনি। পায়ের গোলাপী আঙুলের মাথায় ভর করে এগিয়ে এসে চুমো খেল মিয়ামনের কপালে। এবারে শুরু হ'ল তার অপরূপ ললিত-নৃত্য—মিয়ামনকে ঘিরে ঘিরে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো। কখনো সে পেছনে এলিয়ে দিল তার দেহলতা, মাথাটি দিল হেলিয়ে, চোখ আধো-নিমীলিত, হাত দু'খানি শিথিল, খুলে খুলে ছড়িয়ে পড়ছে অলকগুচ্ছ। তার পরেই আবার জীবন-চঞ্চল হাস্যমুখর রূপ! অদম্য অক্লান্ত প্রাণাবেগে সে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল চঞ্চল দোলায়—ভ্রমরের মতো! হৃদয়-জ্বালানো ভালোবাসা, কামনা-বিলাস, উদগ্র কামোন্মত্ততা, অফুরন্ত চিরযৌবন, সমাগত মিলন-সুখের আশা···নাচের মধ্যে সমস্ত ভাবই সে রূপ দিল···

শান্ত তারাদল আর চেয়ে চেয়ে দেখতে পারছে না এ দৃশ্য ; শিহরণে কাঁপছে তাদের সোনালি চোখগুলি। ঢাকা পড়েছে আকাশ, উৎসব-ভবনে ভাসছে শুধু উজ্জ্বল বাষ্পরাশি !

ক্লিওপাত্রা আবার এসে বসল মিয়ামনের পাশে। শেষ হয়ে আসছে রাত। উড়ে চলছে কালোরঙ শেষের প্রহর। একটি অস্ফুট নীলাভা এসে পড়ছে লাল আলোর সমুদ্রের মধ্যে,—চাঁদের আলো পড়ে যেমন চুল্লীর উপর। থামগুলির মাথায় মাথায় লেগেছে নিষ্প্রভ নীলিমা। ভোর হ'ল। ভয়ঙ্কর-দর্শন এক নপুংসক এনে রাখল বিষভরা একটা শিঙা। মিয়ামন হাতে তুলে নিল। সে বিষ এত তীব্র যে অন্য কোনো পাত্র হ'লে তার তেজে ফেটেই যেত।

একটি চাউনির মাঝে সমস্ত জীবন সমর্পণ করে মিয়ামন তার প্রেমের দেবীর দিকে চেয়ে রইল, চেয়ে চেয়ে অধর-প্রান্তে তুলে ধরল টগবগে বিষে ভরা পাত্রটি।

বিবর্ণ হয়ে উঠল ক্লিওপাত্রা, বিরত হবার জন্যে হাতখানি রাখল মিয়ামনের কাঁধের উপর। মিয়ামনের সাহস তার অন্তর স্পর্শ করেছে। সে বলতে যাচ্ছিল,—'না, না, তুমি আরো বেঁচে থাকো, আমাকে ভালোবাসো, আমি তাই চাই······' কিন্তু সেই মুহূর্তেই বেজে উঠল তুরীধ্বনি। চারজন সৈনিক-দূত অশ্বপৃষ্ঠে প্রবেশ করল উৎসব-ভবনে। মার্ক এন্টনির অনুচর তারা, প্রভুর কিছুটা আগে আগে এসে পড়েছে। ক্লিওপাত্রা নীরবে খুলে দিল মিয়ামনের বাহুবন্ধন। চকিতে এক ঝলক রোদ এসে পড়ল ক্লিওপাত্রার কপালের উপর,—অনুপস্থিত মুকুটটির জায়গা নেবারই চেষ্টা করছে যেন।

'যাবার সময় হ'ল, রাণী! ভোর হ'ল। এই সময়েই তো উড়ে চলে যায় রাতের যত সুখ-স্বপ্ন !'—এই কথা বলেই মিয়ামন এক চুমুকে নিঃশেষ করল বিষপাত্র, চকিতে পড়ে গেল বজ্রাহতের মতো! ক্লিওপাত্রা মাথা নত করে রইল। এক ফোঁটা বুকফাটা অশ্রু—সমস্ত জীবনের একটিমাত্র অশ্রুবিন্দু পড়ল গিয়ে তার হাতের পেয়ালার মধ্যে, মিশে গেল গলিত মুক্তোর সংগে!

ঠিক তখনি উৎসব-ভবনে ঢুকেই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল এন্টনি—'রাণী, সুন্দরী রাণী! সত্যিই খুব দ্রুত ছুটে এসেছি, তবু সব চেষ্টাই বিফল হ'ল। এখন দেখছি খুবই দেরী হয়ে গেছে; ভোজ-পর্বও শেষ

হয়ে গেছে! এ কি, মেঝেতে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে—এর অর্থ?'

'ও কিছু নয়!'—ক্লিওপাত্রা হেসে ওঠে,—'একটা বিষ পরীক্ষা করছিলাম। আগস্টাস যদি আমাকে বন্দী করে নেয় তখন কাজে লাগবে কিনা—ভেবে দেখছিলাম। এস সম্রাট, আমার পাশে বসে গ্রীসীয় মুখোশ-নৃত্য দেখবে না একবার?'

মৃত্যুর চেয়ে বড়

ফ্লোরেন্স শহরের প্রাচীন দুটি পরিবার অনেককাল থেকেই মাংস ও পশমের ব্যবসায়ে বিখ্যাত ছিল। দুই পরিবারের দুই ভাই গিওভান্নি ও আমেরি। গিওভান্নির মাংস ব্যবসায়ের জায়গা হ'ল ভেশ্‌শিও নামক পুরানো বাজার, আমেরির পশমের কারখানা হ'ল আর্নোতে। খরিদ্দারেরা কিন্তু গিওভান্নির দোকানে ভিড় জমাতে খুবি পছন্দ করে। তার দোকানের মাংস যেমন টাটকা মুখের ভাষাও তেমনি মিষ্টি,...তবে পশম ব্যবসায়ী আমেরি হ'ল অন্য ধরণের লোক। ফন্দীবাজ ও শঠ সে. মেজাজ খুব কড়া, মুখখানা সব সময়েই হাঁড়ির মতো। ব্যবসা চালায় সে পাকা হাতে, গিওভান্নির মতো অমন হাল্কা হিসেবে নয় : নামের লোভ ভয়ানক, তার ব্যবসাকে সে গ্রহণ করেছে ভবিষ্যতে মোটা বহরের কোনো সরকারী পদ বাগাবার পন্থা-রূপেই। আমেরি প্রায়ই তার ভাইকে বলে মাংসের ব্যবসা ছেড়ে দিতে। কারণ, ও ব্যবসা নাকি ভদ্রলোকের সাজে না ; টাকাটা খাটাতে বলে তার পশমের ব্যবসায়ে...

একদিন গ্রীষ্মকালে গিওভাগ্নি দোকান থেকে বাড়ী ফিরল খুবি ক্লান্ত. খাওয়াদাওয়ার পরেই হঠাৎ আক্রান্ত হ'ল সন্ন্যাস রোগে এবং রাতেই মারা গেল...গিওভান্নির স্ত্রী ছিল সাদাসিধে ভালোমানুষটি,—একটু বোকা ধরণের আর কি! ব্যবসা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার সে তুলে দিল আমেরির হাতে, আমেরির মধুমাখা ছলনায় সহজেই প্রতারিত হ'ল। সরল মানুষ পেয়ে আমেরি তাকে বোঝাল—দোকানে লালবাতি জ্বালাবার ঠিক আগেই মরে গিয়ে আসলে বেঁচে গেছে তার স্বামী...

আমেরি মাসিক যে পরিমাণ টাকা বিধবা ভ্রাতৃবধূর জন্য বরাদ্দ করল তাতে তার ভয়ানক টানাটানি হতে লাগল। কারণ, সে তো আর একা নয় ; আদরের একটি মেয়ে আছে তার, নাম তার জিনার্ভা। উপযুক্ত যৌতুকের জোর না থাকলে আজকালকার মতো তখনো ভালোছেলে পাওয়া ভার ছিল। কিন্তু ধর্মপ্রাণা-মা মোনা ভরসা হারায়নি। সমস্ত সাধু-সন্তদের ও ভগবানের কাছে সে নিবেদন করল ব্যাকুল প্রার্থনা। নিরাশ্রয় অসহায় বিধবার একমাত্র আশ্রয় হলেন ভগবান—নিশ্চয়ই তিনি মুখ তুলে চাইবেন, যৌতুক না দিতে পারলেও তাঁর কৃপায় নিশ্চয়ই মেয়ের একটি ভালো বর জুটে যাবে।

একদিক থেকে অবশ্য, এরকম ধারণা করার কারণও রয়েছে। অনিন্দ্য সুন্দরী ছিল এই জিনার্ভা!···জিনার্ভার বেশবাস ছিল খুবি সাদাসিধে. পড়ত সে কালো রংয়ের পোশাক, তার শুভ্র মরাল-গ্রীবাটিকে জড়িয়ে থাকত শুধু একছড়া মুক্তোর হার, লকেটের উপর আঁকা সুন্দর একটি পদ্ম। পাতলা মসলিন-ওড়নাটির আড়াল দিয়ে উঁকি মারত তার সোনালি কেশরাশি। শিল্পী রাফেল-চিত্রিত ম্যাডোনার মতো তার শান্ত মুখখানি! তার ব্যথানত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, ভ্রু-রেখায়, শিশু-সরল ওষ্ঠাধরেও ফুটে থাকত সেই নির্মল সৌন্দর্য; তার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে থাকত কমল-শুভ্র পবিত্রতা। তার জীবন যেন ফুলের মতোই ক্ষণিকের, সে যেন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার মতো নয়!···

ভাইঝির প্রশংসা শুনে শুনে আমেরি তাকে ফ্লোরেন্স গণতন্ত্রের নামজাদা এক সেক্রেটারীর সঙ্গে বিয়ে দেবে ঠিক করল। প্রস্তাবিত পাত্র অর্থাৎ ফ্রান্সেসকো আগোলান্তি ছিলেন বুড়ো, তবে সকলের কাছেই তিনি সম্মান পেতেন এবং সহরের শাসন-বিভাগের বড়কর্তাদের সঙ্গেও ছিল তাঁর যথেষ্ট সৌহার্দ। ফ্রান্সেসকো নিজে লাতিন ভাষায় পণ্ডিত এবং তাঁর রচনায়ও রয়েছে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা। রুক্ষ এবং নৈরাশ্যবাদী প্রকৃতির লোক হলেও খাঁটি লোকই, প্রাচীনকালের পণ্ডিতদের মতোই খাঁটি। তবে, মুখের ভাবটি হ'ল নির্মম বিচারকের মতো! প্রাচীন ভাষা বা দেবভাষার তিনি এতটা ভক্ত ছিলেন যে রোমে গ্রীকভাষা নতুন প্রবর্তিত হওয়ার সময় স্কুলের ছোটছোট ছেলেদের পাশে বসেই শিক্ষা করতে কণামাত্র লজ্জা বোধ করেননি। আসল কথা, পশম ব্যবসায়ী আমেরি তার চক্রান্ত কাজে ফলাবার দিক থেকে এর চেয়ে ভালো পাত্রের কথা ভাবতেই পারে না। বিবাহের উপযুক্ত যৌতুক দান করতে স্বীকৃত হ'ল আমেরি—তবে এক বিশেষ শর্তে। ফ্রান্সেসকো-কে তাঁর যশ ও প্রতিপত্তির অংশীদার হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে আমেরিকে। প্রস্তাবিত পাত্রের এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও জিনার্ভা বহুদিন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখল তার কাকার সঙ্কল্পকে। কয়েক বছর গড়িয়ে চলল নীরবেই। শেষপর্যন্ত আমেরি শুরু করল জোর তাগাদাঃ অবিলম্বেই নিশ্চিত জবাব চাই। জিনার্ভাও জানাতে বাধ্য হ'ল অন্য একটি পাত্র রয়েছে এবং তাকে সে আগোলান্তির চেয়ে বেশী পছন্দ করে।

এন্তানিওর নাম উল্লেখ করতেই ধর্মপ্রাণা মোনা তো অবাক হয়ে যায়,

এমন কি ভয় খেয়ে যায়! এস্তানিও হ'ল তরুণ ভাস্কর, অনামা একটি সরু গলির মাথায় তার শিল্পালয় : কয়েক মাস আগে জিনার্ভাদের ঘরেই পরিচয় হয়েছিল। বিখ্যাত একটি গির্জার জন্যে তৈরী করতে হবে শহীদ-সাধ্বী বারবারা-র পবিত্র প্রতিকৃতি—তাই এস্তানিও জিনার্ভার কমল-শুভ্র মুখখানিই মডেল-রূপে ব্যবহার করার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। এমন ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে জিনার্ভার মা সেদিন এই শিল্পীকে প্রত্যাখান করতে পারেনি। কাজ করতে করতে এস্তানিও ভালোবেসে ফেলল তার অপরূপ মডেলটিকেই। তারপর সর্বজনীন উৎসবে গির্জায় সভা-সমিতিতে আরো অনেকবার দেখা হয়েছে ; কারণ, সৌন্দর্যের খ্যাতির জন্যে সর্বত্রই সে সাদরে আমন্ত্রিত হ'ত। মা-মোনা ভয়ে ভয়ে আমেরিকে জানায়—জিনার্ভা ভালোবাসে আর একটি পাত্রকে।

এস্তানিওর নাম উল্লেখ করতেই আমেরি তো রেগে আগুন। তবুও সে নম্রভাবেই বলতে লাগল—'দেখুন, আপনার এই কথা আমি নিজ কানে না শুনলে কক্ষনোই বিশ্বাস করতে পারতাম না। কেমন করে আপনার মতো একজন বুদ্ধিমতী ধর্মপ্রাণা মহিলা কিনা অমন একটি কাঁচা মেয়ের খেয়ালখুশিকেই এত সহজে আমল দিলেন! আজকালকার কাজ-কারবারের খোঁজখবর রাখি না, তবে আমাদের সময়ে পাত্র-পছন্দ করার ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা টুঁ শব্দটি করতেও সাহস পেত না ; সমস্ত বিষয়েই অভিভাবকের নির্দেশ মেনে নিতে হ'ত। আর, একথাও ভেবে দেখুন না, আপনার মেয়ে যাকে বরণ করতে চায় আসলে কে এই এস্তানিও? আপনি কি জানেন না, সম্মানজনক বা লাভজনক কোনো কাজ-কারবার চালাবার সামর্থ্য নেই বলেই তো যত কারিশিল্পী ভিখিরী ও গায়কেরা বেশ ধরে নানা নানা ঢঙের। সারা দুনিয়ায় এদের চেয়ে হাল্কা-প্রকৃতির—এদের চেয়ে অবিশ্বাস-যোগ্য জীব আর নেই। এরা হ'ল মাতাল উচ্ছৃংখল কুঁড়ে ধর্মভ্রষ্ট, আর কিনা অমিতব্যয়ী! এরা নিজেরটা তো দু'হাতে ওড়ায়ই, অন্যেরটাও ওড়াতে ছাড়ে না। এস্তানিওর কথা সারা ফ্লোরেন্সের লোকে কি বলে থাকে নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনি। আমি শুধু তার একটা খেয়ালের কথাই উল্লেখ করব। তার শিল্পালয়ে সে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে একটা ঝুড়ি, দড়ির গোড়াটা বেঁধে রেখেছে একটা হুকের সঙ্গে। এই ঝুড়িটার মধ্যে

এস্তানিও ফেলে রাখে তার সব টাকাপয়সা, গুণে দেখার ধারও ধারে না। তার ছাত্র বা পরিচিত যে-কেউ ইচ্ছে হ'লেই ঝুড়ি নামিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে নিতে পারে খুশিমতো, মালিকের অনুমতি নেওয়াটাও দরকার হয় না! তাহলে, আপনি কি মনে করেন, এই ধরণের একটি পাগলকে আমি যৌতুক দান করব?

শুধু কি তাই! আপনি কি জানেন না এস্তানিও হ'ল নাস্তিক। ওদের জীবন-নীতি হ'ল: খাও দাও নৃত্য করো মনের আনন্দে। অর্থাৎ শয়তানের নীতি। গির্জায় যায় না কখনো, শাস্ত্র-গ্রন্থ দেখলে নাক শিঁটকোয়, ভগবানে বিশ্বাস নেই একটুও!···অনেকে আরো বলেছে, সে ও তার ছাত্রেরা নাকি রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে হাসপাতাল থেকে মড়া কিনে আনে চড়া দামে, এবং সেগুলির সাহায্যেই নাকি মানব-দেহের সংগঠন, মাংসপেশী, স্নায়ুতন্ত্রী এইসব শরীর-বিদ্যা অধ্যয়ন করে— শিল্পোন্নতির জন্যে জ্ঞানার্জন করে। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে, সে তার উপাস্য শয়তানকেই পুজো করে! শয়তানই তাকে যাদুবিদ্যা শেখায় এবং সেই যাদুবিদ্যার জোরেই এহেন এক পাগল বশ করে ফেলেছে আমাদের নির্মল-প্রাণ জিনাভাকে।'

মা-কে ভয় দেখাতে ও নিজের সততা প্রমাণ করতে সফল হয় আমেরি। মা এসে মেয়েকে বুঝিয়ে বলে,—সে যদি আগোলান্তিকে বিয়ে করতে রাজি না হয় তো আমেরি তাদের মাসিক ভাতা বন্ধ করে দেবে। মেয়েটি বুকফাটা দুঃখে ভেঙে পড়লেও মেনে নিল তার দুর্ভাগ্য, রাজি হ'ল কাকার আদেশ পালন করতে।

সে বছর ফ্লোরেন্সের উপরে নেমে এল এক করাল বিভীষিকা। গ্রীষ্ম থেকে শুরু হয়ে শীতের মুখেও প্লেগ থামবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, ঠাণ্ডা হাওয়ায়ও কোনোই উপশম হ'ল না। কাজেই, ফ্লোরেন্সের ধনী লোকেরা শহর ছেড়ে চলল গাঁয়ের বাড়ীতে বিশুদ্ধ হাওয়ার দেশে,— প্লেগের বিভীষিকা থেকে বহু বহু দূরে। শহরে পড়ে পড়ে মরবার ঠেকা কি তাদের?

আমেরির আশঙ্কা হ'ল ইতিমধ্যে জিনার্ভা হয়ত তার মত বদলে ফেলতে পারে, তাই সে তাড়া লাগাবার একটা ফন্দি আঁটল। সে বলল, জিনার্ভা ও তার মাকে অবিলম্বেই শহর ছেড়ে যেতে হবে। আলবানুর ঢালু প্রান্তরে আগোলান্তির একটি রমনীয় পল্লী-ভবন আছে; সেখানে মা

ও মেয়েকে তিনি বাস করার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন। আমেরিও চাইছিল ঠিক তাই। এবারে বিয়ে হবে কয়েক দিনের মধ্যেই। নীরবে এবং অনাড়ম্বরে শেষ হ'ল পরিণয়-উৎসব,— সেই দুর্দিনে যেরকমটা হওয়া স্বাভাবিক। বিয়ের সময় জিনার্ভা দাঁড়িয়ে ছিল মলিন একখানি ছায়ামূর্তি: মুখখানি দেখাচ্ছিল কী শান্ত থমথমে! আমেরি কাকা ভাবল, বিয়ের পরেই এসব ছেলে-মানুষি চলে যাবে কোথায়, ফ্রান্সেসকো আগোলান্তি সুদে আসলে আদায় করে নিতে পারবেন তরুণী ভার্যার প্রণয়।

কিন্তু ভুল হ'য়ে গেল তার ধারণাটা। তরুণী বধূ গির্জা থেকে ফিরে এসে স্বামীর ঘরে পা দিতেই কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল এবং খানিক পরেই হঠাৎ সে মেজের উপর পড়ে গেল মড়ার মতো। সবাই ভাবল, অচেতন হয়ে পড়েছে। তাজা করে তুলবার চেষ্টা হ'ল খুবই কিন্তু মেয়েটি চোখ আর খুলল না এবং ক্রমেই ক্ষীণতর হ'য়ে এল নিশ্বাস প্রশ্বাস। শুধু মুখখানি নয়, তার সর্বাঙ্গই হয়ে উঠল শবের মতো ফ্যাকাশে আর ঠাণ্ডা হিম। কয়েক ঘণ্টা পরে এক ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার এসে জিনার্ভার নিষ্প্রাণ ওষ্ঠের সামনে একখানা আরশি ধরতে সেখানে নিশ্বাসের ক্ষীণ ছাপও দেখা গেল না। জিনার্ভার যে মৃত্যু হয়েছে এ বিষয়ে কারো আর কোনো সংশয় রইল না। পাড়া-পড়শীরা বলাবলি করতে লাগল,—এই দুর্দিনে বিয়ে হয়েছে বলেই এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে, গির্জা থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই প্লেগে ধরেছে···

একমাত্র বুড়ী ধাত্রী ছাড়া আত্মীয়বর্গের আর কেউই কিন্তু জিনার্ভার মৃত্যু বিষয়ে সন্দিহান হয়নি। এই বুড়ীকে অবশ্যি সবাই বলে মাথা-পাগলা। সে কেঁদেকেটে চারদিক মাথায় করে তুলল। তার সনির্বন্ধ অনুরোধ: জিনার্ভাকে যেন কবর দেওয়া না হয়, ডাক্তারেরা নিশ্চয়ই ভুল করেছে—জিনার্ভা মরেনি, ঘুমুচ্ছে শুধু! 'খুকী'র বুকের উপর হাত রেখে সে টের পেয়েছে—আলগোছে খুব আলগোছে কাঁপছে তার বুক, প্রজাপতির ডানার চেয়েও আলগোছে! শেষ হ'ল দিন, কিন্তু মেয়েটির দেহে আর জেগে উঠল না প্রাণের সাড়া। তাকে একটা চাদরে ঢেকে শবাধারে করে নিয়ে আসা হ'ল গির্জাসংলগ্ন কবর-ভূমিতে, প্রাচীন সাইপ্রেস বনের নিবিড় ছায়ায়। এটাই হ'ল ফ্লোরেন্সের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সমাধি-স্থান। আমেরি এই বিশিষ্ট ভূমিতে কবরদানের জন্য ব্যয় করল যথেষ্ট অর্থ—টাকাটা অবশ্যি জিনার্ভার যৌতুক থেকেই দিয়ে দাওয়া হ'ল।

বিষন্ন গাম্ভীর্যে শেষ হ'ল শেষকৃত্য। জিনার্ভার পবিত্র আত্মার কল্যাণ-কামনায় সমাগত প্রত্যেকটি দরিদ্রকে দান করা হ'ল পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী। প্রচণ্ড শীত ও প্লেগের ভয় সত্বেও কবর-ভূমিতে সমবেত হ'ল বহু লোকজন। এমন কি, কয়েকটি অপরিচিত লোকও এই তরুণী বধূটির মৃত্যু-কাহিনী শুনে চোখের জল সামলে রাখতে পারল না, তারা আবৃত্তি করতে লাগল পেত্রার্কার মধুর কবিতা: 'মনোরম মুখে তার নেমে এল মোহন মরণ!'

ফ্রান্সেসকো কবর-দান উপলক্ষে বক্তৃতা দিলেন, শুধু লাতিন থেকে নয়—প্লেতো ও হোমর থেকেও উদ্ধৃতি দিয়ে অলংকৃত করলেন নিজ বক্তৃতা। তখনকার দিনে গ্রীক-প্রীতি হালের আমদানি ছিল বলে অনেকেই গভীর মনোযোগে শুনল,—এমন কি যারা গ্রীক ভাষা বোঝে না তারাও। সমাধিকৃত্যের শেষে মৃতদেহকে 'শেষ-চুম্বন' দানের সময় শুরু হ'ল একটুখানি সোরগোল! শোকের কালো পোশাক-পরা মলিন এক ক্ষীণাঙ্গ যুবক মৃত জিনার্ভার কাছে এগিয়ে এসে বসল, তার মুখের উপরকার রেশমী ওড়নাটি তুলে চেয়ে রইল অপলক! বারবার তাকে চলে যেতে বলা হ'ল,—জিনার্ভার আত্মীয়দের সামনেই তার মতো এক অপরিচিত লোকের এরকম ব্যবহার মোটেই শোভন নয়। সে শুনল, তাকে বলা হচ্ছে 'অপরিচিত' এবং আর্মোর ও ফ্রান্সেসকোকে 'আত্মীয়'! একটি তিক্ত হাসি ফুটে উঠল তার মুখে; সে বিগতা জিনার্ভার ওষ্ঠাধরে নীরবে এঁকে দিল একটি নিবিড় চুম্বন, এবং আলগোছে রেশমী ওড়নাটি দিয়ে তার মুখখানি ঢেকে রেখে চলে গেল—কারো সঙ্গে একটি কথাও বলল না। জনতার মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে উঠল গুঞ্জন-ধ্বনি: ঐ হ'ল এস্তানিও—জিনার্ভা যাকে ভালোবাসত। ওর জন্যেই তো মরেছে জিনার্ভা!

ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা, সমাধিকৃত্য শেষ হতেই ভেঙ্গে গেল ভিড়। বিধবা মা মেয়ের সমাধির পাশেই রাতটা কাটিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু আর্মো তা'তে রাজি নয়। কারণ, শোকে সে এতটা ভেঙে পড়েছে যে তার জীবনই এখন সংশয়াপন্ন। কবর-ভূমিতে রইলেন পাদ্রী মোরিয়ানা। সারা রাত তিনি মৃতের মুক্তি কামনায় কবরের পাশে প্রার্থনা করবেন।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল নীরবে, রাত্রির অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে উঠছে পাদ্রীর প্রার্থনার ভাষা ও গির্জা-ঘড়ির ঘণ্টা-নিনাদ। মাঝরাতের পরে পাদ্রী মোরিয়ানার পিপাসা পেয়ে গেল, গভীর তৃপ্তিতে জল খেলেন

এক গ্রাস। তখন, হঠাৎ শোনা গেল কার মৃদু নিশ্বাস। কান খাড়া করে রইলেন, আবার সেই নিশ্বাস! মৃতের মুখের উপরকার পাতলা ওড়নাটাও যেন নড়ে উঠল! হিম হয়ে এল পাদ্রীর সর্বাঙ্গ। তবে শবের কাছে থাকা তাঁর এই নতুন অভিজ্ঞতা নয়, তিনি জানেন এমন কি বিশেষ অভিজ্ঞ বা অভ্যস্ত লোকেরাও রাতে এমন অবস্থায় পড়লে কতসব আজগুবি ব্যাপার জল্পনা-কল্পনা করে থাকে কাজেই, এদিকটায় তিনি খেয়ালই করলেন না; খ্রীষ্টের নাম স্মরণ করে প্রার্থনা পাঠ করতে লাগলেন উদাত্ত স্বরে।

কিন্তু—হঠাৎ আটকে গেল তাঁর স্বর, একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন মৃত মেয়েটির মুখের দিকে। না, এবার আর দীর্ঘশ্বাস নয়, স্পষ্টতই একটা গোঙানি! আর তো সংশয়ের অবকাশ নেই, পাদ্রীটি স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন : আলগোছে উঠছে নামছে মেয়েটির বুক, কাঁপছে রেশমী চাদরটা। নিশ্বাস টানছে। পাদ্রী তো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আর খ্রীস্টের নাম জপতে জপতে দে ছুট! এক লাফে গেটটা পেরিয়েই ঝড়ের বেগে ছুটে এলেন বাইরে। তাজা হাওয়ায় কতকটা সুস্থ হলেন এবং সমস্ত ব্যাপারটা নিছক মনের খেলা মনে করে খ্রীষ্টের অভয় বাণী স্মরণ করতে করতে আবার ফিরে এলেন গির্জায়। কিন্তু দোর দিয়ে তাকাতেই, মুখ থেকে বেরিয়ে এল এক ভয়ার্ত চীৎকার। মৃত মেয়েটিই উঠে বসেছে শবাধারের মধ্যে, চোখ দুটি বিস্ফারিত! পাদ্রীটি কবরভূমির মধ্য দিয়ে সোজা ছুটে চলেছেন, পেছন ফিরে তাকাতেও আর সাহস হচ্ছে না—ছুটে চলেছেন সামনের পার্কটা পেরিয়ে সোজা সদর রাস্তা ধরে। স্তব্ধ রাতের বুকে বারবার আঘাতের মতো বেজে উঠতে লাগল তার ধাবন্ত পায়ের শব্দ।

জিনার্ভা ঘুম থেকে বা মৃত্যু-সম অচৈতন্য অবস্থা থেকে জেগে উঠে শবাধারটা নজর করে দেখতে লাগল—বিমূঢ়ের মতো! তাকে তা হ'লে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল! ব্যাপারটা বুঝতেই সে শিউরে উঠল আতঙ্কে; কষ্টেসৃষ্টে শবাধারটা থেকে বেরুল, চাদরটাকে মাফলারের মতো করে গলায় জড়াল; গির্জার খোলা দোর দিয়ে চলে এল বাইরে, চলতে লাগল কবরভূমি ও পার্কটা পেরিয়ে। হাওয়ার বেগে দ্রুত ভেসে চলেছে শাদা মেঘের দল, ফাঁকে ফাঁকে ঝরে পড়ছে চাঁদের আলো। ভরা জ্যোৎস্নায় অদূরে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে একটি মর্মর-স্তম্ভ। জিনার্ভার ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়, মাথা ঘুরতে থাকে। তার মনে হয়, সে

এবং মর্মর স্তম্ভটি একসঙ্গেই উড়ে যাচ্ছে কোন্ জ্যোৎস্না-ধবল মেঘের দেশে। সে কি জীবিত, না মৃত? সমস্তই কি স্বপ্ন, না সত্যি? কিছুই সে যে বুঝে উঠতে পারছে না!

দিশেহারার মতোই একে একে সে পেরিয়ে গেল কয়েকটি নির্জন পথ। তারপর পরিচিত একটা বাড়ী দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল, এগিয়ে এসে ঠকঠক শব্দ করল দোরে। বাড়ীটা তার কাকা আমেরির।

রাত গভীর। ব্যবসায়ী আমেরি তখনো ঘুমোয়নি। কনস্তান্তি-নোপল্ থেকে কয়েকটা জাহাজ এসে পোঁছানোর কথা,—সেই প্রসঙ্গেই জরুরী খবরের প্রতীক্ষা করছে। শহরে সংবাদ রটে গেছে অনেক জাহাজই ঝড়ে মারা পড়েছে,—আমেরির জাহাজও আছে তাদের মধ্যে। প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে ক্ষিদে পেল তার। সুন্দরী পরিচারিকা নেন্সিয়াকে সে পাঠাল মাংস রাঁধতে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পৌঢ় আমেরি বিয়ে করেনি। নেন্সিয়া মাংস রান্না করছিল, আর আমেরি তার পাশে বসে বসে আগুন পোয়াচ্ছিল। আগুনের লাল শিখা ঝিলিক মেরে উঠছিল বাসনকোষনের উপরে।

'নেন্সিয়া, কিছু শুনতে পাচ্ছ?'—আমেরি নিজেও কান খাড়া করে শোনে।

'ও তো হাওয়ার শব্দ। আমি যেতে পারব না আর, আপনি এর মধ্যেই আমাকে তিন-তিনবার পাঠালেন যে!'

'না, না, হাওয়া নয়। কে যেন ঠক ঠক করছে। খবর এসেছে। যাও, শিগগির দোরটা খুলে দাও।'

নেন্সিয়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে আলস্য-ভরে, আমেরি সিঁড়ি-পথে আলো তুলে ধরে। 'কে?'—পরিচারিকা জানতে চায়।

'আমি—আমি জিনার্ভা!'—দোরের ওপাশ থেকে আসে ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ।

'বাঁচাও ভগবান, বাঁচাও, বাঁচাও! ভূত, ভূত!!'—নেন্সিয়ার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না, কাঁপতে থাকে পা; হাত দিয়ে দোরটা ধরে রাখে—পড়ে না যায়। ভয়ে তো আমেরির মুখ ফ্যাকাশে, লণ্ঠনটা হাত থেকে পড়ে যায় আর কি!

'নেন্সিয়া, নেন্সিয়া! দোরটা খোলো, শিগগির খোলো!'—জিনার্ভা অনুনয় করে—'একটু গরম হ'তে দাও, ঠাণ্ডায় জমে গেছি আমি।

কাকাকে বলো, আমি······'

পরিচারিকাটি খুব সাহসী মেয়ে হলেও এক দৌড়ে সরে পড়ে উপরে, সিঁড়িগুলি বেজে ওঠে দুমদাম শব্দে।

'এই হ'ল আপনার খবর আসা! আগেই বলেছি, তার চেয়ে শুয়ে পড়ুন। ঐ, ঐ আবার! দোরে ধাক্কা মারছে, শুনছেন? হায়রে বেচারা, গোঙাচ্ছে! ওঃ, কী করুণভাবেই না গোঙাচ্ছে! হে ভগবান, হা ভগবান! আমরা পাপী, আমাদের বাঁচাও, বাঁচাও আমাদের!'

'শোনো, নেনসিয়া!' —আমেরি বলে, 'নেমে গিয়ে দেখো কী ব্যাপার! কী জানি, হয়ত—'

'হ্যাঁ, কী আর করব?'—নেনসিয়া বলে উঠল, 'আচ্ছা, আপনি কি ক্ষেপেছেন নাকি? আহা, কী আমার বীর পুরুষ! আপনি ভেবেছেন আপনাকে যেতে দেব আমি। বলি, আপনি কি ইহলোক ছেড়ে যাচ্ছেন নাকি? না, না, আপনার ওখানে গিয়েই কাজ নেই। বসে থাকুন এখানে, বসে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন—আরো ভয়ানক কিছু না ঘটে আবার।'

আলমারী থেকে জর্ডন নদীর পুণ্য-সলিলের কলসীটা নামিয়ে এনে ছড়িয়ে দেয় সে দোরে মেঝেতে টেবিলে রান্নাঘরে, এবং আমেরির গায়ে। আমেরি তার সুন্দরী পরিচারিকার সঙ্গে তর্ক করে না। ভৌতিক ব্যাপার তার চেয়ে নেনসিয়াই ভালো বোঝে, তাই সে তার কথাই মেনে নেয়। নেনসিয়া উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে চলে অভয় মন্ত্রবাণী—'পবিত্র আত্মা মিলিত হউক ভগবানের সঙ্গে, মৃত চলিয়া যাউক মৃতের রাজ্যে। ভগবান যেন তোমার আত্মাকে পুণ্যধামে শান্তি দান করেন!'

জিনার্ভা বুঝল এখানে আর কোন আশা-ভরসা নেই, এরা তাকে মনে করছে 'মৃত'!

নিদারুণ ক্লান্তিতে সে বসে পড়েছিল টলতে টলতে; এবার দাঁড়িয়ে উঠে এগোতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। এখনি একটা আশ্রয় খুঁজে পেতে হবে। কন্টেসন্টে ঠাণ্ডা অবশ পা দুটি টেনে টেনে এল সে পাশের রাস্তায়। এখানেই থাকেন তার স্বামী ফ্রান্সেসকো আগোলান্তি।

ফ্লোরেন্স গণতন্ত্রের এই সেক্রেটারিটি তখন প্রাচীন-সাহিত্যের ভক্ত তাঁর বন্ধু মিলানের কাছে দুরূহ এক দার্শনিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে চলছিলেন। প্রবন্ধটি পারলৌকিক তত্ত্বমূলক। বিষয় হ'ল—"প্রিয়তমা পত্নী

জিনার্ভার মৃত্যু অবলম্বনে আত্মার অবিনশ্বরতা'।

লণ্ঠন জ্বলছে, পড়ার টেবিলে একটি জলদেবীর মূর্তি ধরে আছে লণ্ঠনটিকে। প্রাচীন সবকিছুই তো ফ্রান্সেসকোর প্রিয়!···ফ্রান্সেসকো সবেমাত্র পুনর্জন্মবাদ বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন, এমন সময় হঠাৎ দোরে শুনতে পেলেন ঠক্ ঠক্ শব্দ। ভুরু কুঁচকে উঠল—কাজের সময় তিনি টুঁ শব্দটিও সহ্য করতে পারেন না, তবু উঠে গেলেন; জানলা খুলে রাস্তার দিকটায় চেয়েই দেখেছেন: চাঁদের মলিন আলোয় চাদর গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিনার্ভা! কোথায় এবার পড়ে রইল তাঁর প্লেতো ও আরিস্ততল্! ঝপাং করে জানলাটা তিনি এমনভাবেই বন্ধ করলেন যে জিনার্ভা মুখ ফুটে একটি কথাও বলার সুযোগ পেল না। ফ্রান্সেসকো প্রার্থনা পাঠ করতে করতে বারবার যীশুর নাম নিতে থাকেন, আর নেনসিয়ার মতোই কাঁপতে থাকেন ভয়ে!

কিন্তু শিগ্‌গিরই তিনি সামলে ওঠেন এবং প্রেতচ্ছায়া সম্পর্কে বিশিষ্ট মহাপুরুষদের বাণী স্মরণ করে নিজের দুর্বলতার জন্যে লজ্জিতই হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে জানলা খুলে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে লাগলেন—'স্বর্গের বা মর্তের—যেখানকার প্রেতই হও না কেন, চলিয়া যাও, স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। অভ্রান্ত দর্শনালোকে যাঁহার চিত্ত সমুজ্জ্বল তাঁহাকে তুমি বৃথাই ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিতেছ। তুমি আমার চর্মচক্ষুকে প্রতারণা করিতে পার, আমার মর্মচক্ষুকে প্রতারণা করিতে পার না। শান্তি হউক তোমার আত্মার, মৃত ফিরিয়া যাও মৃতের রাজ্যে!'

সঙ্গেসঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল জানলাটা, হাজার প্রেতাত্মারো সাধ্য নেই সে জানলা খোলে আর! জিনার্ভা চলতে শুরু করল আবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল তার মায়ের বাড়ীর সামনে।

মা তখন খ্রীষ্টের পবিত্র ক্রুশের সামনে নতজানু হয়ে ছিল, পাশেই দাঁড়িয়ে উপবাস-ক্ষীণ পাদ্রী! দুঃখিনী মা পাদ্রীর দিকে করুণভাবে চেয়ে চেয়ে বলছিল,—'সাধুবাবা, কী করব বলুন—আমাকে বলে দিন আপনি। আমার প্রাণে তো একটুও শান্তি পাচ্ছি না। মনে হয়, ভগবানই এই হতভাগীর উপর বিরূপ হয়েছেন, আমার বুঝি আর মুক্তি নেই!'

'ভগবানে বিশ্বাস রাখো, আমরণ তাঁর নির্দেশ পালন করে যাও।'—পাদ্রী তাকে বল-ভরসা যোগাতে চান—'মনের মধ্যে অশান্তি রেখো না,

অবাধ্য দেহরিপুকে দমন করো ; কারণ, তোমার মেয়ের জন্যে এই যে একান্ত ভালোবাসা এ তোমার দেহজাত। তার দেহের মৃত্যু হয়েছে বলে দুঃখ করো না ; বিচারক ভগবানের সামনে তাকে যে পাপীরূপে দাঁড়াতে হবে—আসল দুঃখের বিষয় হ'ল তাই।'

ঠিক তখনি দোরে শোনা গেল ঠক্ ঠক্ শব্দ—'মা, মা, আমি এসেছি—আমি ফিরে এসেছি ; দোর খোলো মা, ভিতরে আসতে দাও।'

'আমার জিনার্ভা !'—মা দোরের দিকে ছুটে আসতেই পাদ্রী থামিয়ে রাখেন।

'কোথায় যাচ্ছ ? তোমার মেয়ে পড়ে রয়েছে কবরের তলায়, ভগবানের বিচারের আগে সে জাগবে না আর। এ তো প্রেতাত্মা, তোমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছে—তোমার কণ্ঠে তোমার রক্তমাংসময় দেহের আকর্ষণে তোমাকে প্রতারণা করছে। ক্ষমা চাও, অনুশোচনা-ভরে শিগগির প্রার্থনা করো,—সময় থাকতে এখনো প্রার্থনা করো তোমার মেয়ের জন্যে। আর নইলে, তোমাদের কারো আত্মাই মুক্তি পাবে না, পচে মরবে নরকে !'

'মা, মা ! তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না, আমার গলা শুনেও বুঝতে পারছ না ? আমি···আমি···জিনার্ভা। বেঁচে আছি আমি, মরিনি !'

'সাধুবাবা ! আমাকে যেতে দিন, আমাকে—'

কিন্তু পাদ্রীটি হাত উঁচিয়ে বলতে লাগলেন—'যাও, সরে যাও। শুধু তুমি নও, তুমি তোমার মেয়ের আত্মাকেও নরকস্থ করছ। সাবধান, ইহলোক বা পরলোক কোথাও তুমি শান্তি পাবে না বলে দিচ্ছি।'

পাদ্রীর মুখখানা কুঁচকে ওঠে রাগে বিরক্তিতে,—চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোয়। মা-মোনা থমকে দাঁড়ায়, করজোড়ে সভয়ে আছড়ে পড়ে পাদ্রীর পায়ের উপর।

পাদ্রী মেরিয়ানা দোরের দিকে এগিয়ে এসে বলতে থাকেন—'পিতা পুত্র ও পরমাত্মা ঃ ঈশ্বরের এই ত্রিশক্তির নাম লইয়া বলিতেছি, ক্রুশবিদ্ধ যীশু-প্রভুর পুণ্য শোণিতের নাম লইয়া বলিতেছিঃ দূর হও অশুভ আত্মা ! এ যে পুণ্যভূমি। হে ঈশ্বর, প্রলোভন হইতে মুক্তি দাও, পাপ হইতে উদ্ধার করো।'

'মা, মা ! তোমার কি দয়া হচ্ছে না, আমি যে মরে যাচ্ছি মা !'

মা আবার ছুটে যেতে চায়, মেয়ের উদ্দেশে বাড়িয়ে দেয় ব্যগ্র বাহু দুটি,—কিন্তু মাঝখানে পাদ্রীটি দাঁড়িয়ে থাকেন নিষ্ঠুর যম।

জিনার্ভা পড়ে যায় মাটির উপর। ঠাণ্ডায় জমে মরতে হবে তাকে। দু'হাত দিয়ে সে হাঁটু আঁকড়ে ধরে, মাথাটি গুঁজে রাখে দুই হাঁটুর ভিতরে। সে যেন কোনোদিনই আর জেগে উঠবে না, ধীরে ধীরে মরে যাবে এমনি করেই। 'জ্যান্তের জগতে মরা মানুষের স্থান নেই।'—ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে যায় এস্তানিওকে—'সেও কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে?' তার কথা আগেও কতবার ভেবেছে, কিন্তু কেমন একটা লজ্জা এসে বাধা দিয়েছে। একেলা রাতে তার কাছে যেতে চায়নি,—সে নিজে অন্যের স্ত্রী তো! কিন্তু—এখন তো সে জীবন্ত জগতের কাছে মৃত!

অস্ত গেছে চাঁদ। ভোরের ফ্যাকাশে আকাশের পটে দাঁড়িয়ে আছে তুষার-ঢাকা পাহাড়। জিনার্ভা তার মায়ের বাড়ীর দোর থেকে উঠে দাঁড়ায়, নিজের আত্মীয়দের কাছে আশ্রয় না পেয়ে চলে আসে অনাত্মীয়ের কাছে। এস্তানিও সারারাত জেগে তৈরী করছিল জিনার্ভারই এক মর্মর-মূর্তি। কখন যে রাত ভোর হয়ে এল টেরও পায়নি, জানালা-পথে কখন ফুটে উঠল ভোরের আলো! সহকারী হিসেবে কাজ করছিল তারই প্রিয়ছাত্র বারতোলিনো। এস্তানিওর মুখে ফুটে উঠেছে পরম শান্তি: সে যেন প্রাণ সঞ্চার করছে পাষাণ-মূর্তিতে, মর্মর-প্রতিমার ভিতরে নতুন করে সঞ্চালিত করছে সঞ্জীবনী অমৃতধারা। এখনি যেন নড়ে উঠে খুলে যাবে মূর্তিটির আনত চোখের পাতা দুটি, বুকখানি যেন দুলে উঠছে নিশ্বাসে নিশ্বাসে; নিটোল দেহে বয়ে চলছে যেন স্ফুরিত শোণিত-ধারা!

হাতের অন্যসব কাজ শেষ করে এস্তানিও এবার জিনার্ভার ঠোঁট দুটিতে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছিল নির্মল একটি হাসি। দোরে হঠাৎ শোনা গেল ঠক্ ঠক্ শব্দ।

কাজ করতে করতেই বলে ওঠে এস্তানিও—'দোরটা খুলে দাও তো!'

ছাত্রটি দোরে এসে জিজ্ঞেস করে—'আপনি কে?'

'আমি জিনার্ভা!'—ক্ষীণকণ্ঠের অস্পষ্ট উত্তর শোনা যায়, সান্ধ্য সমীরণ-সঞ্চরণের মতো!

বারতোলিনো কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে আসে দেয়ালের উপর, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় ভয়ে, ভগবানের নাম করে বলে ওঠে—'ভূত!'

কিন্তু এস্তানিও ঠিকই চিনেছে তার প্রিয়তমার কণ্ঠস্বর, ছুটে এসে বারতোলিনোর হাত থেকে দোরের চাবিটা কেড়ে নেয় যেন।

'স্যর, ভেবে দেখুন আগে! সর্বনাশ করবেন না, স্যর!'—ছাত্রটির গলা কাঁপতে থাকে ভয়ে।

এস্তানিও ছুটে এসে দোর খুলে দেখে, দোরের কাছে মরার মতো পড়ে রয়েছে জিনার্ভা, তার শিথিল চুলের গোছা ভরে উঠেছে তুষারে তুষারে।

এস্তানিও ভয় পায়নি, নিবিড় করুণায় উথলে উঠেছে তার বুক; স্নেহের কথা বলতে বলতে সে তাকে দুই বাহুর মধ্যে করে তুলে আনে নিজের ঘরে। বিছানায় শুইয়ে রেখে দেহখানি সে ঢেকে দেয় তার সবসেরা কম্বলটিতে,—বারতোলিনোকে পাঠায় বাড়ীর কর্ত্রীর কাছে। ইতিমধ্যে নিজেই আগুন জেলে নিয়ে গরম করে খেতে দেয় খানিকটা সুরা। জিনার্ভা এবারে সহজভাবে নিশ্বাস টানতে পারছে; এখনো কথা বলতে পারছে না, তবে চোখ মেলে দেখছে। আনন্দে ভরে উঠেছে এস্তানিওর প্রাণ।

ঘরের মধ্যে সে অধীরভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে,—'লোকজন এই এল ব'লে! সবকিছুই ঠিকঠাক করে ফেলছি। মাদাম জিনার্ভা, আমার ঘরের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্যে কিন্তু ক্ষমা করবে আমাকে।'

এস্তানিও দিশেহারার মতোই টেনে নামায় ঝুড়িটা এবং বারতোলিনোর হাতে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দেয় রুটি মাংস কিনতে, গৃহকর্ত্রী এলে তাকে লাগিয়ে দেয় মুরগীর ঝোল রাঁধতে।

বারতোলিনো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে বাজারে। বাড়ীর কর্ত্রীও ব্যস্ত থাকে রান্নাঘরে। ঘরে এখন এস্তানিও আর জিনার্ভা : দুজনে একা।

এস্তানিওকে ডেকে পাশে বসিয়ে জিনার্ভা বলে যায় সব ঘটনা। কাহিনীর শেষে জিনার্ভা বলে—'তুমি আমার প্রিয়তম, মৃত্যুর জগৎ থেকে ফিরে এলে একমাত্র তুমিই ভয় পাওনি আমাকে দেখে,—শুধু তুমিই আমাকে ভালোবাসো।'

'তোমার আত্মীয়দের ডাকব, তোমার মা কাকা বা তোমার স্বামীকে?'—এস্তানিও জানতে চায়।

'আমার কোনো আত্মীয় নেই! কোনো স্বজন নেই! আমার স্বামী নেই, তুমি ছাড়া সবাই আমার কাছে অচেনা, কেউই চেনে না আমাকে! তাদের কাছে মরে গেছি আমি—শুধু তোমার কাছেই বেঁচে আছি, আমি তোমারি!'

প্রভাত-সূর্যের সোনালি কিরণে ধীরে ধীরে ভরে উঠল ঘর ; জিনার্ভা হাসিমুখে তাকাল তার প্রিয়তমের দিকে। রোদ উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সঙ্গেসঙ্গেই তার গাল দুটিতে ফুটে উঠল জীবনের লালিমা, তনুখানির তলে তলে বয়ে চলল প্রাণের জোয়ার। এন্টানিও তাকে জড়িয়ে ধরল নিবিড় আলিঙ্গনে, মধুর চুম্বন এঁকে দিল তার নির্মল ওষ্ঠপুটে। আর মনে হ'ল নতুন প্রভাতের সূর্য-কিরণে ফুলের মতোই ফুটে উঠল জিনার্ভার চির-সুন্দর প্রাণ-প্রতিমা !

'প্রিয়, আমার প্রিয়তম !'—জিনার্ভা আদরের সুরে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—'ধন্য এই মৃত্যু, মৃত্যুই আমাদের ভালোবাসায় দীক্ষা দিয়েছে ! আর, ধন্য এই ভালোবাসা—যে ভালোবাসা মৃত্যুর চেয়ে বড় !'

বুলবুল ও গোলাপ

সে বলেছে,—'একটি টকটকে লাল গোলাপ নিয়ে আসতে পারো তো তোমার সঙ্গে নাচব!' কিন্তু সমস্ত বন-বাগান খুঁজেও তো লাল গোলাপ পেলাম না!—তরুণ ছাত্রটি আপনমনে ভাবছিল।

দেওদার গাছের মাঝে ছোট্ট নীড়টিতে বসে দোয়েল শুনতে পেল সেকথা, পাতার ফাঁক দিয়ে মাথাটি বাড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

'না, আমার সমস্ত বাগানে একটিও লাল গোলাপ নেই!'—বলতে বলতে অশ্রু টলমল করে উঠল তরুণের চোখে—'হায় হায়, কত ছোট্ট একটুখানি জিনিষের উপরেই না সুখ নির্ভর করে! দুনিয়ার বিজ্ঞজনদের লেখা পড়েছি আমি, আমার বুকে গাঁথা রয়েছে সমস্ত দর্শনের মর্মবাণী,—তবু কিনা আমার জীবন হাহাকারে ভরে উঠল একটি লাল গোলাপের অভাবে!'

দোয়েল ভাবল,—'নাঃ, এবারে এক সত্যিকার প্রেমিকের দেখা পেলাম। একে আমি চিনি না, তবু এর জন্যেই তো গান গেয়েছি রাতের পর রাত,—রাতের পর রাত এর কথাই শুনিয়েছি তারাদের কানে কানে। আর, আজ কিনা তারই দেখা পেলাম! চুল তার ভ্রমরের মত কালো, ঠোঁট দুটি তার সাধের গোলাপের মতোই টুকটুকে লাল! কিন্তু কামনার ছায়ায় তার মুখখানি হয়ে উঠেছে মলিন —মলিন ছায়ার মতো, প্রাণের যন্ত্রণা ভুরু দুটিতে এঁকে দিয়েছে কুঞ্চিত রেখা!'

'রাজবাড়ীতে আজ নাচগান হবে!'—তরুণ ছাত্র বলতে থাকে আপনমনে—'আমার প্রাণের পাখীও যাবে আজ সেখানে। আজ যদি তার হাতে একটি টকটকে লাল গোলাপ এনে দিতে পারি—তবে ধরা দেবে সে আমার আলিঙ্গনের মাঝে,, আমার কাঁধে এলিয়ে দেবে তার মাথাটি, তার হাতখানি লুকোবে এসে আমার হাতের মধ্যে। কিন্তু আমার বাগানে যে লাল টকটকে গোলাপ নেই, আমি তাই বসে থাকব একা। আর, সে আমার পাশ দিয়ে চলে যাবে, আমাকে একটিবার চেয়েও দেখবে না। তখন ভেঙে যাবে আমার বুক।'

'হ্যাঁ, এবারে সত্যিকার প্রেমিকের দেখা পেয়েছি!'—ভাবল দোয়েল—'আমি যা নিয়ে গান গাই—এ তাই নিয়ে ব্যথা পায়। আমার কাছে যা আনন্দ, এর কাছে তাই যন্ত্রণা! প্রেম নিশ্চয়ই আশ্চর্য জিনিষ—মণির চেয়ে দামী, মুক্তোর চেয়ে আদরের! মণিমাণিক্য দিয়ে তা কেনা যায় না, বাজারেও মেলে না। বনিকের কাছে পাওয়া যায় না, সোনার পাল্লায় মাপা যায় না।'

'গায়কেরা আসরে এসে বসবে, তারযন্ত্রে তুলবে সুর-ঝংকার, আর আমার প্রিয়তমা নাচতে থাকবে তালে তালে,—বেহালা-বীণার সুরে সুরে! সে এত হালকা পায়ে নাচবে যে তার পা দুটি মেজেটা শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে। আর পাত্রমিত্রেরা মিলে ঝলমল সাজসজ্জা দিয়ে ঘিরে রাখবে তাকে চারদিক থেকে। কিন্তু আমার সঙ্গে সে তো নাচবে না, আমি যে তাকে লাল গোলাপ দিতে পারিনি!'—তরুণ ছাত্র এসব কথা বলতে বলতে ঘাসের উপর উবুড় হয়ে পড়ে রইল, কাঁদতে লাগল দুহাতে মুখখানি ঢেকে।

'কাঁদছে কেন?'—পাশ দিয়ে লেজ উঁচিয়ে ছুটে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল এক সবুজ গিরগিটি।

'সত্যি তো?'—এক ঝলক রোদের চারপাশে ডানা মেলে ঘুরতে ঘুরতে বলল এক প্রজাপতি।

'সত্যি তো?'—চামেলি বলল তার পাশের ফুলটিকে কোমল সুরে ফিসফিস ক'রে।

'টকটকে লাল একটি গোলাপের জন্যে!'—দোয়েল বলল।

'লাল টকটকে একটি গোলাপের জন্যে?'—সবাই বলে উঠল,—'ভারী হাসির কথা তো!' এক গিরিগিটি ছিল একটু পাগলাটে ধরণের,—কথাটা শুনে সে তো হোহো করে হেসেই বাঁচে না!

দোয়েল কিন্তু ছাত্রটির গোপন ব্যথার কথা বুঝতে পেরেছে, তাই সে চুপটি করে বসে রইল দেবদারু গাছের ভিতর, ভাবতে লাগল রহস্যময় প্রেমের কথা।

তারপর হঠাৎ সে ডানা মেলে দিয়ে উড়ে চলল বাগিচার ভিতর দিয়ে, উড়ে চলল ছায়ার মতো; ছোট্ট দুটি ডানার পাল মেলে দিয়ে ছায়ার মতোই পেরিয়ে গেল বন-বাগান।

সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটির বুকে দাঁড়িয়ে ছিল সুন্দর একটি গোলাপ

গাছ। গাছটিকে দেখতে পেয়েই দোয়েল এসে বসল তার কাঁচ একটি ডালে, বসে বলল,—'আমায় একটি লাল গোলাপ দাও, তোমাকে আমি আমার সবচেয়ে মধুর গানটি শোনাব।'

গাছটি কিন্তু শুধু মাথা নাড়ল, মাথা নেড়ে বলল,—'আমার আছে সাদা গোলাপ! সাগরের ফেনার মত সাদা! গিরিচূড়ার তুষারের চেয়েও সাদা! তবে, আমার ভাইয়ের কাছে গিয়ে দেখতে পারো, তুমি যা চাও সে হয়ত দিতে পারবে।'

দোয়েল উড়ে এল সেই গোলাপগাছের কাছে। তাকে বলল,—আমাকে একটি লাল গোলাপ দাও না, আমি তোমাকে শোনাব আমার সবচেয়ে মধুর গানটি!'

কিন্তু গাছটি শুধু মাথা নাড়ল,—'আমার আছে সোনালি গোলাপ। স্ফটিক সিংহাসনে বসে থাকে যে পাতালকন্যা—তার চুলের চেয়েও সোনালি! মাঠের বুকে শনফুলের চেয়েও সোনালি! তবে আমার ভাইয়ের কাছে গিয়ে দেখো, ছাত্রটির জানালার পাশেই থাকে সে : তুমি যা চাও সে হয়ত দিতে পারবে।'

দোয়েল অমনি উড়ে এল তার কাছে, ছাত্রটির ঘরের জানালার পাশে : ডেকে বলল—'আমাকে একটি লাল গোলাপ দাও, তোমাকে শোনাব আমার সবচেয়ে মধুর গানটি!'

গাছটি কিন্তু মাথা নাড়ল শুধু—'আমার গোলাপ টকটকে লাল। পায়রার পায়ের চেয়েও লাল, সাগরের গুহাতলে হাজার পাপড়ি মেলে দেয় যে প্রবাল—তার চেয়েও লাল! কিন্তু দারুণ শীতে আমার দেহের শিরাগুলি কনকন করছে, হিম-ঝাপটায় আমার মুকুলগুলি না ফুটতেই ঝরে পড়েছে, ঝড়ের দাপটে ভেঙে গেছে ডালপালা,—তাই সারাটা বছরে আমার বুকে গোলাপ ফোটেনি।'

'শুধু একটি গোলাপ চাইছি আমি।'—দোয়েল যেন কেঁদে ওঠে—'শুধু একটি গোলাপ! তা, পাবার কি কোনোই উপায় নেই!'

'একটা উপায় আছে। কিন্তু সে এমন ভয়ানক যে তোমাকে বলতেই ভরসা পাচ্ছি না!'

'বলো, বলো আমাকে। আমি ভয় পাচ্ছি না!'

'লাল গোলাপ চাও তো, ফুটিয়ে তুলতে হবে জ্যোৎস্না রাতের গানের সুরে সুরে। তারপর তাকে রাঙিয়ে দিতে হবে তোমার বুকের লাল

রক্তে ! তোমাকে গাইতে হবে একটা কাঁটার উপর বুক ঠেকিয়ে : সারাটি রাত ধরে গাইতে থাকবে,—আর কাঁটাটি ঢুকতে থাকবে তোমার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে ; তোমার জীবন-শোণিত তখন বয়ে যাবে আমার শিরায় শিরায়, —এক হয়ে যাবে আমার শোণিতে !'

'একটি লাল গোলাপের মূল্য হ'ল মৃত্যু !'—বলে ওঠে দোয়েল—'সকলের কাছেই জীবন কত প্রিয় ! এই শ্যামলবনের ছায়ায় বসে থাকতেও কী যে আরাম ! আকাশে যখন সোনার রথে চড়ে ঘুরে বেড়ান সূর্য্যিঠাকুর, আর রুপোর রথে চাঁদের রাণী,—চেয়ে চেয়ে দেখতে কী যে আনন্দ ! মাঠের বুকে লুকিয়ে ফোটে যে 'ব্লু-বেল,' পাহাড়ের গায়ে হাওয়ায় হাওয়ায় দোলে যে উলুখড়-বন—কী সুন্দর সেসব ! কী মিঠে গন্ধ নাম না-জানা বনফুলের ! তবু প্রেম যে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ! আর, মানুষের প্রাণের কাছে পাখীর প্রাণ কত ছোট কত তুচ্ছ !'

ধূসর ডানাটি মেলে দিয়ে পাখীটি উড়ে এল চকিত ছায়ার মতো, ডানা দুটির পাল মেলে দিয়ে ছায়ার মতোই পেরিয়ে গেল বাগিচা।

ছাত্রটি তখনো ঘাসের বুকে পড়ে রয়েছে সেইভাবে,—তার সুন্দর চোখ দুটির অশ্রু শুকোয়নি তখনো।

দোয়েল এসে বলল,—'সুখী হও তুমি, সুখী হও ! লাল গোলাপ পাবে তুমি। জ্যোৎস্না-রাতের গানের সুরে সুরে ফুটিয়ে তুলব গোলাপ, রাঙিয়ে দেব আমারই বুকের রক্তে ! এর বিনিময়ে আমার শুধু একটি কথা : সত্যি করে ভালোবাসবে তুমি, হবে সত্যিকার প্রেমিক ! দর্শন হ'ল জ্ঞানের আধার, শক্তির আশ্রয়,—তবু দর্শনের চেয়ে গভীর জ্ঞান, শক্তির চেয়ে মহাশক্তি রয়েছে প্রেমের বুকে। আগুনের মতো টকটকে লাল তার পাখা, টকটকে লাল তার তনু ! পদ্মমধুর মতো মধুর তার ঠোঁট দুটি, তার নিঃশ্বাসে নিশ্বাসে বয় সুরভি মলয় !'

তরুণ ছাত্রটি ঘাসের বুক থেকে মুখ তুলে তাকাল, কান পেতে শুনতে লাগল ; কিন্তু দোয়েল তার কাছে কি যে বলছে কিছুই বুঝল না। কারণ, সে বোঝে শুধু ছাপার অক্ষরে বইয়ে যা লেখা হয় !

ছাত্রটি বুঝল না, কিন্ত ওকগাছটি বুঝল। বুঝে সে দুঃখ পেল। দোয়েলটি কতদিন থেকে তার ডালে বাসা বেঁধে আছে, এবং এই দোয়েলকে সে খুব ভালোবাসে ! ওকগাছটি স্নেহের সুরে বলল,—'শেষবারের মতো একটি গান শোনাও আমাকে ! তুমি চলে গেলে

আমার বড়ই একা একা লাগবে !'

দোয়েল তখন ওকগাছের কাছে গান গাইতে লাগল। তার গলায় সুর ঝরে পড়তে লাগল ঃ রুপোলি কলসী থেকে উছলে-পড়া কলকল জলধারা !

দোয়েলের গান শেষ হ'লে ছাত্রটি উঠে দাঁড়াল,—পকেট থেকে একটা নোটবুক আর একটা পেনসিল বের করে নিল।

বাগানের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে সে আপনমনে লিখতে লাগল—'এর আকার আছে একথা অস্বীকার করা যায় না : কিন্তু অনুভূতি আছে তো ? নেই বলেই তো মনে হচ্ছে ! বস্তুত, এ হ'ল অধিকাংশ শিল্পীর মতো,—শুধুই ভঙ্গিমা, হৃদয় বলে পদার্থ নেই ! নিশ্চয়ই অন্যের জন্যে এ কখনো আত্মোৎসর্গ করতে রাজি হবে না। এ শুধু নিজের গানেই মশগুল ! আর, এটা তো জানা কথা যে শিল্প জিনিষটাই হ'ল আত্মসর্ব্বস্ব। তবু, একথা বলা যায় যে এর গলায় কিছুটা মিষ্টি সুর আছে। কিন্তু কী লজ্জার কথা, তার কোনো অর্থ হয় না—বা, দুনিয়ার কোনো কাজেও আসে না !'—বলতে বলতে বলতে ঘরে ফিরে এল ছাত্রটি, বিছানায় শুয়ে পড়ে ভাবতে শুরু করল তার প্রণয়িণীর কথা। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল শিগগির।

আকাশে চাঁদ উঠলে দোয়েল উড়ে এল গোলাপগাছটির কাছে, একটা কাঁটার মুখে চেপে ধরল তার বুক। সারাটি রাত সে গান করতে লাগল কাঁটার মুখে বুক ঠেকিয়ে রেখে। শুনতে লাগল রুপোলি চাঁদ দিগন্তের কোলে গা এলিয়ে। সারাটি রাত ধরে গাইতে লাগল দোয়েল,—আর কাঁটাটি ক্রমে ক্রমে ঢুকে যেতে লাগল তার বুকের ভিতর, ধীরে ধীরে ঝরতে লাগল তার জীবন-শোণিত !

প্রথমে গাইল সে ঃ কিশোর-কিশোরীর বুকে ভালোবাসার জন্মকথা। গোলাপ গাছটির মগডালটিতে অমনি দেখা দিল একটি কুঁড়ি ! তারপর গানের পর গানে খুলে যেতে লাগল পাপড়ি পর পাপড়ি। শুরুতে পাপড়ির রঙ ছিল কেমন মলিন—নদীর বুক ছেয়ে-থাকা কুয়াশায় মতো মলিন, উষায় পায়ের ছাপটির মতো মলিন। আর, রুপোলি—প্রভাতের পাখা দুটির মতো রুপোলি ! আরসীর মাঝে গোলাপের ছায়া যেমন, সরোবরের জলে পদ্ম যেমন,—গোলাপটি ফুটে রইল তেমনি।

গাছটি এদিকে দোয়েলকে তার বুকখানি চেপে ধরতে বলছে আরো

জোরে—'দোয়েল, দোয়েল! আরো ঘনিয়ে এস, নইলে যে সম্পূর্ণ গোলাপটা ফুটবার আগেই জেগে উঠবে দিন।'

দোয়েল কাঁটার উপর আরো জোরে চেপে ধরল তার বুক, ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠতে লাগল তার কণ্ঠের স্বর। সে তো গাইছিল তরুণ-তরুণীর মধু-মিলনের গান!

গোলাপের পাপড়িতে অমনি ফুটে উঠল লাল আভা। বাসর-রাতে যেমন রাঙা হয়ে ওঠে কনের মুখখানি,—প্রেমিক যখন ওষ্ঠে এ'কে দেয় প্রথম চুম্বনটি। কিন্তু কাঁটাটি তো দোয়েলের মর্মমূলে গিয়ে বেঁধেনি এখনো, তাই গোপালের মর্মকোষটিও আরক্ত হয়ে ওঠেনি। দোয়েলের হৃদয়-রক্তে নেয়ে উঠলে তবেই তো লাল হয়ে উঠবে!

গোলাপগাছটি দোয়েলকে তাই কাঁটার উপরে আরো জোরো চাপ দিতে বলল,—'দোয়েল ভাই, আরো ঘনিয়ে এস, আরো জোরে চাপ দাও,—নইলে যে গোলাপটি ঠিক ঠিক তৈরী হবার আগেই ভোর হয়ে যাবে।'

দোয়েল অমনি কাঁটার উপরে আরো জোরে চাপ দিল আরো ঘনিয়ে। কাঁটাটিও এবারে ঢুকে গেল তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। একটা নিদারুণ যন্ত্রণা বিদ্যুতের মতো বয়ে গেল তার সর্বাঙ্গে! ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে,—গানের স্বরও ছড়িয়ে পড়ে বাঁধাভাঙ্গা উচ্ছল আবেগে! কারণ, সে তখন গাইছিল সেই প্রেমের কথা—যে প্রেম মৃত্যুর সিংহদ্বার পেরিয়ে হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ, যে প্রেমও মরে না কবরের তলায়!

গোলাপ এবার হয়ে উঠল লাল—টকটকে লাল। পূব-আকাশের গোলাপটির মতো লাল পাপড়িগুলি। এবারে টকটকে লাল পদ্মরাগমণির মতোই লাল গোলাপের মর্মকোষটি!

কিন্তু দোয়েলের স্বর যে এদিকে হয়ে এসেছে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর —ছোট্ট ডানা দুটি থেমে এসেছে ঝাপট মারতে মারতে, চোখের উপরে ঘনিয়ে এসেছে একটা আবছা পর্দা। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল গানের স্বর। দোয়েলের হঠাৎ মনে হ'ল—কে যেন টিপে ধরেছে তার গলা।

তার কণ্ঠ থেকে শেষবারের মতো উৎসারিত হ'ল এক ঝলক স্বর। সেই স্বর শুনল ফুটফুটে চাঁদ, শুনতে শুনতে ভুলে গেল ভোরের ডাক, শুধু দাঁড়িয়ে রইল আশমানের প্রান্তে! সেই স্বর শুনল লাল

গোলাপটি, শুনে থর থর করে কাঁপতে লাগল আনন্দে—ভোরের সোনালি হাওয়ায় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিল তার পাপড়িগুলি। প্রতিধ্বনির মুখে মুখে সেই সুর পেঁাছল গিয়ে লালপাহাড়ের গুহায়, ঘুমে থেকে জাগিয়ে তুলল স্বপ্ন-বিভোর রাখালদের। সেই সুর নদীর শেওলাদের গা বেয়ে বেয়ে ভেসে চলল। সেই সুর তারা বয়ে আনল সাগরের কানের কাছে।

'দেখো, চেয়ে দেখো! গোলাপটি এবারে কেমন ফুটে উঠেছে!' —গাছটি বলল, কিন্তু দোয়েলের কাছ থেকে কোনো সাড়া এল না। সে তো মরে পড়ে রয়েছে বড় বড় ঘাসের মধ্যে, বুকে বেঁধা সেই কাঁটাটি!

দুপুর বেলা ছাত্রটি জানলা খুলে বাইরে তাকাতেই সোল্লাসে বলে উঠল—'বাঃ, কী সুন্দর লাল গোলাপ! এমন গোলাপ তো আমি জীবনেও দেখিনি। এত সুন্দর গোলাপ,—নিশ্চয়ই এর একটা বিদেশী নাম থাকবে।'—বলতে বলতে সে জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে গোলাপটি ছিঁড়ে নিল।

এবার সে টুপিটা মাথায় চড়িয়েই ছুটল সেই মেয়েটির বাড়ী, হাতে গোলাপটি। মেয়েটি তখন বারান্দায় দোরের সামনে বসে একটা রিলে জড়াচ্ছিল নীল রেশমী-সুতো, পায়ের পাশে বসে তার ছোট্ট কুকুরটি।

ছাত্রটি এসে বলল,—তুমি তো বলেছিলে একটা লাল গোলাপ এনে দিলে আমার সঙ্গে নাচবে। এই নাও লাল গোলাপ! এমন লাল গোলাপ সারা দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। আজ রাতে তুমি বুকের মাঝখানে পরবে এই লাল গোলাপ, আমাকে পাশে নিয়ে নাচবে। আমার এই গোলাপই তখন বলে দেবে—তোমায় কত ভালোবাসি!'

মেয়েটি কিন্তু চেয়ে রইল ভ্রূকুটি হেনে, তারপর বলল,—'তোমার ওই গোলাপ আমার দামী পোশাকের সঙ্গে মানাবে না। আর শোনো, মন্ত্রীর ভাইয়ের ছেলে আমাকে পাঠিয়েছে একমুঠো সত্যিকার মুক্তো! আর, এটা তো মুর্খেও বোঝে—তোমার ওই ফুলের চেয়ে সেই মুক্তো ঢের ঢের দামী।'

'সত্যিই তুমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ!'—ছাত্রটি রেগে ওঠে। গোলাপটি সে ছুঁড়ে ফেলল পথের উপর, পড়ল গিয়ে কাদার মধ্যে। একটা ঠেলাগাড়ীর চাকা উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল গোলাপটিকে থেতলে দিয়ে।

'অকৃতজ্ঞ? আমি?'—মেয়েটিও মুখের উপর শুনিয়ে দেয়—

যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! কে তুমি এমন একটা? ছাত্র—এই তো! তা দেখো, মন্ত্রীর ভাইপোর জুতোয় যে রকমের রুপোর বকলেশ আঁটা আছে, তোমার সেটুকু রাখবারও যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ!' এইকথা বলেই সে চেয়ার ছেড়ে হনহন করে চলে গেল ভিতরে।

'সত্যিই, প্রেমের মতো এমন বাজে জিনিষ আর নেই!' চলে যেতে যেতে ভাবছিল ছাত্রটি—'তর্কশাস্ত্রের অর্ধেকটা কাজও এ দিয়ে হাসিল হয় না। কারণ, আসলে এ কিছুই প্রমাণ করে না। আর, যা-হবে-না শুধু তার কথাই বলে; যা সত্যি নয়, তাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে। আসলে, প্রেম একেবারেই অকেজো জিনিষ! আর আজকালকার এই যুগে কাজের হওয়াটাই হ'ল সবকিছু! তা, এর চেয়ে আমার দর্শন-শাস্ত্রই ভালো,—এখন পড়ব বসে দুনিয়ার যত মৌলিক তত্ত্ব-সংগ্রহ!'

কাজেই, সে তার ঘরে ফিরে এসে মস্ত মোটা একটা ধুলোপড়া বই টেনে নিয়েই পড়া শুরু করে দিল।

দূরের স্বপ্ন : কাছের ভালোবাসা

[সন্ধ্যাবেলা। পুরোনো বাড়ীর একটা ঘর। পিছন দিকের নিচু বড় জানালাটার শার্সি-পথে ঘরের ভেতর উঁকি মারছে একফালি জ্যোৎস্না ; ঘরের ভিতর বাঁ দিকের চুল্লী থেকে বেরুচ্ছে আগুনের খুশিভরা লাল আভা। বাইরে বাঁধানো সড়ক। ঘরের জানালার ডান হাতেই দোর, সড়কের মুখোমুখী। চুল্লীটার উল্টো দিকে শেলফ, সেখানে লাল আগুনের আভায় ঝকমক করছে পিয়ালা পিরিজ। এক বুড়ো ওকগাছ শীতের ভয়ে জানালার কাছে পিঠটা বাঁকিয়ে দিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে, তাতিয়ে নিচ্ছে অতিবৃদ্ধ দারু-দেহ। ঘরটির মাঝখানে চাদর-ঢাকা টেবিল, দুপাশে চেয়ার। উনুনের একধারে গরম হচ্ছে একটা কেট্‌লি, আর চিমনীর মাথার ঢাকনীটার তলায় মিটমিট জ্বলছে একটা বাতি।

জানালার পাশ দিয়ে একটা ছায়া চলে গেল। ক্যাঁচ করে খুলে গেল দোর, ঢুকল এসে প্রীতি। ওভারকোটটা খুলে দোরের পাশে ঝুলিয়ে রাখল, শীতে গা ঝাঁকুনি দিয়ে তাড়াতাড়ি একটুখানি গরম হতে এল। তারপর বাতিটার শিখা বাড়িয়ে দিয়ে কেট্‌লিটা রাখল আগুনের উপর। আল্‌না থেকে টেবিল-ক্লথটা এনে বিছিয়ে দিল টেবিলে, তার উপর দুটো পিয়ালা রেখে আয়োজন করতে লাগল। একবারটি জানালায় এসে লালরঙের পর্দাটা সরিয়ে নিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল, বিমর্ষ মুখে ফিরে এসে মন দিল কাজে। টি-পটের ভিতরে দিল এক চামচ চা, আরো এক চামচে, আরো একটা। হঠাৎ বাইরের দিকে কান খাড়া হয়ে উঠল, উন্মুখ হয়ে শুনতে শুনতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখখানি। বাইরে শোনা যাচ্ছে কার গান] :

চাঁদ মুখ চেয়ে বসে থেকো নাকো খুকু,
        মেঘজাল-ফাঁদে কাঁদে সাথীহারা সে যে ;
মলয়-মধুর চৈতী চামেলি রাতে
        শুকনো পাতায় কাঁদন উঠেছে বেজে।

[গানের সুর ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। জানালার পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে একটি ত্রিকোণ টুপি। ঢুকল এসে পিতম]

পিতম : [প্রীতির দিকে টুপিটা ছুঁড়ে দিয়ে] বাব্বাঃ যা ঠাণ্ডা! পা দুটো জমে বরফ হয়ে গেছে।

প্রীতি : এই যে তোমার মোজা, রোদে শুকিয়ে রেখেছি।
[চুল্লীর পাশে বসলে প্রীতি তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে, জুতো খুলে দিতে লাগল]

পিতম : [গান ধরে]

চাঁদমুখ চেয়ে থেকো নাকো আর ব'সে,
জিভ বের করে দেবে সে ভেঙ্গচি কেটে .
মলয়-মধুর চৈতী চামেলি রাতি
আকাশের গায়ে তারাদের দিল এ'টে।

চা হ'ল ?

প্রীতি : এই হ'ল বলে, জলটা ফুটলেই হয়।

পিতম : কী হিমটাই পড়ছে আজ বাজারের পাশের মাঠে। গান খুব জমাতে পেরেছি বলে মনে হয় না। হিমে গানের গলা জমে আসে যেন।

প্রীতি : তুমিও ঠিক কেটলির মতো। ঠাণ্ডা থাকলে কেটলিও গাইতে পারে না। বলি কি মশাই কেটলি, একটুখানি চটপট করো না বাপু!

পিতম : ও নিজের কথার সুরেই ভরে উঠত যদি!

প্রীতি : উঠছে বলেই তো মনে হয়। ওই শোনো, কি সুন্দর গান ধরেছে। যেন এক ছোট্ট পাখী! এস, আজ এই দোয়েলের সুরে সুরে আমাদের চায়ের পিয়ালা ভরে তুলি। [প্রীতি ফুটন্ত জল ঢেলে দেয় টি-পটে] এই যে নাও।

পিতম : [আগুনের লাল শিখার দিকে চেয়ে] এ কী আশ্চর্য! অপরূপ সুন্দরী সে, তন্বী তনুলতা···কিন্তু অমন একটি প্রাণ আছে তো?

প্রীতি : [টেবিলের উপরে রুটি কেটে রেখে, মাখন লাগাতে লাগাতে] কৈ, এবারে আরাম করে বসো, হাসিমুখে খাও···আগুনের কাছে কি সব বকছ খালি!

পিতম : ভাবছিলাম !

প্রীতি : আগে চা-টা খেয়ে নাও। তা না, আগুনের পাশে বসলেই তোমার মন ডানা মেলে দেয়, চিমনীর ভিতর দিয়ে উড়ে যায় কোথায় !

পিতম : এই সারা দুনিয়াটাই হ'ল মস্ত বড় একটা চিমনী। লোকের কাছে বাজে একটুকরো কাগজের মতো কিছু-একটা ছুঁড়ে দাও না —অমনি সেটা জ্বলে উঠে হৈচৈ লাগিয়ে দেবে ; কিন্তু সত্যিকার চিন্তাধারা ধোঁয়ার সঙ্গেই হারিয়ে যায় কোথায় !

প্রীতি : একটু খুশি হয়ে বসো না, পিতম। এই দেখো, কী পুরু করে মাখন লাগিয়ে দিয়েছি।

পিতম : তোমাকে দেখছি সব সময়েই খুব খুশি।

প্রীতি : আমি যে খুশিই থাকতে চাই, পিতম।

পিতম : খুশি ? ফুঃ, তা—তা বটে !

[পিতম টেবিলের দিকে এগিয়ে আসে। কারো মুখে কথা নেই। পিতম কী ভাবতে ভাবতে চায়ের পিয়ালায় ঠোঁট ছুঁইয়ে একটু একটু করে চুমুক দেয়]

প্রীতি : চা ঠিক হয়েছে ?

পিতম : এই একরকম।

প্রীতি : একরকম ! নতুন করে বানিয়ে দিই তা হ'লে ?

পিতম : না, না, ঠিক আছে। সত্যিই, লোককে তুমি কী যে বিরক্ত করতে পারো।

প্রীতি : আঃ, বাইরে গিয়ে কুকুরটাকে শেকল দিয়ে রাখব ?

পিতম : বলছিলাম কি, মেয়েটিকে দেখেছিলে আজ ?

প্রীতি : কোথায় ?

পিতম : বড়গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কী অপরূপ সে ভঙ্গিমা।

প্রীতি : না, দেখিনি।

পিতম : আমি অবিশ্যি দেখেছি, সেও দেখেছে আমাকে। যতক্ষণ বসে গান গেয়েছি, অপলক চোখে চেয়ে ছিল ; আমার গানে গানে হাততালি দিয়ে খুশিতে যেন উপচে পড়ছিল ! আমি ভেবে পাই না, অমন অপরূপ লাবণ্যের সঙ্গে নারীর অমন প্রাণ থাকে কি না।

জীবনটা হ'ল জিলিপীর ঘোরপ্যাঁচ,
পারো যদি ফেলো খুলে,
মানুষ ব'লে তো বড়াই করেছ খুবই
[একটুখানি ভেবে তাড়াতাড়ি মিলটা দিয়ে নেয়]
তর্জনী তুলে তুলে।
অবশ্য, এটা হ'ল শুধুই খসড়া।

প্রীতি : আসরে গাইবে তো এটা ?

পিতমঃ [টেবিলের উপর থেকে এক লাফে নেমে] সব সময়েই তুমি বড্ড হিসেব কষো। মনে রেখো, শিল্পী মানুষ একেবারে কচি শিশুর মতো কোমল !

প্রীতি : পিতম, ঘরে থাকো তুমি, বাইরে আজ বড্ড ঠাণ্ডা।

পিতম : ঘরে বসে বসে তোমার গজরানি শুনব, না ?

প্রীতি : এক্ষুনি তো বলেছিলে আমি খুব হাসিখুশি।

পিতম : বেশ কথার প্যাঁচ শিখেছ তো ?

প্রীতি : আমার অন্যায় হয়েছে পিতম, তুমি বাইরে যেও না। বাজারের যাত্রার জায়গাটা বড্ড স্যাঁতসেঁতে, তোমার জুতোর চামড়াও তেমন পুরু নয়।

পিতম : তোমাকে বলেছি তো, বসব না কোথাও। তাকে খুঁজতে যাচ্ছি আমি। তা কে জানে, সেই আমার মনের মানসী কিনা !

প্রীতি : সব সময়েই তুমি আদর্শ নারীর ছবি খুঁজে বেড়াও কেন ?

পিতম : তুমিই কি তোমার স্বপ্নের মানসকুমারকে খোঁজো না ?

প্রীতি : না, আমি বাস্তব জগতেই থাকতে চাই।

পিতম : মেয়েদের মন এত মোটা ! করুণ মাতৃমূর্তি শুধু ! মাতৃত্ব ছাপিয়ে কিছু যদি বুকের ভিতর অনুভব করে তো বলে— 'আমি প্রেমে পড়েছি।' সত্যিই এতো খেলো, আর এতো করুণ ! আমি চাই এমন নারী—যাকে দেবতার আসনে বসানো যাবে, যার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শুধু ভালোবাসায় ভরে উঠব !

প্রীতি : [ব্যথাভরা সুরে] পিতম,
চাঁদমুখ চেয়ে থেকো নাকো আর ব'সে,
একটি হৃদয় কাঁদে জ্যোৎস্নায় এসে ;

মলয়-মধুর চৈতী চামেলি রাতি
বিদায় মাগিবে ত্রিশটি দিনেরই শেষে !

পিতম ঃ হায় রে, আমাকে কখনোই বুঝবে না তুমি ! আচ্ছা আসি। [যেতে যেতে ঘাড়টা একটুখানি বেঁকিয়ে পরিহাসের সুরে গাইতে থাকে—'চাঁদমুখ চেয়ে, বসে থেকো নাকো, খুকী !' দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে পিতমের কণ্ঠস্বর,—প্রীতি শুনতে থাকে ; তারপর চুল্লীটার কাছে ঘনিয়ে এসে আগুনটা নেড়ে দেয়। সেখানে বসতেই একটা পুরানো কবিতা তার ঠোঁটে ঠোঁটে কেঁপে ওঠে ঃ কেমন তন্দ্রাচ্ছন্নের মতোই সে আবৃত্তি করে যায়, শুনতে থাকে লাস্যময়ী অগ্নিশিখা আর চিন্তামগ্ন লাল কয়লারা]

প্রীতি ঃ দিশেহারা এই দুনিয়ার ঘন জন-অরণ্য পাশে
একলা ব্যথার নির্জনে থাকে একটি কুমারী মেয়ে ;
পথিকেরা তারে দেখে মাথা নাড়ে, চলে যায় নিজ পথে,
কানাকানি করে নিজেদের মাঝে—'বুভুক্ষু নারী কে এ ?'
বুক ফাটে তবু বলিতে পারে না যে কথাটি মুখ ফুটে
শুধু বারবার কেঁপে ওঠে তার রক্তিম ঠোঁটে ঠোঁটে ;
চোখের ছায়ায় বেদনা ঘনায়,—অশান্ত প্রাণ-পাখী
সোনালি ঊষার মধু লগনেও হুহু করে কেঁদে ওঠে !
অতি সুগোপন স্বচ্ছ নিঝুম স্বপন-সায়র বুকে
জেগে আছে তার প্রাণের দেবতা—মানসকুমার তার,
ঘুমভরা চোখে চুমু খেয়ে সে যে আলগোছে সরে যায়,
মধু জ্যোৎস্নায় ভরে ওঠে তাই রজনীর আঁধিয়ার !
দুনিয়া মাঝেই আছে সে মানুষ—মনের মানুষ তার,
মধু ফাগুনের আগুন ধরাতে পারে যে গো তার মনে ;
তবু দিশেহারা প্রাণের পিয়াসা ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে,
মনের মানুষ পায় না তো এ জীবনে !
বিফল প্রেমের এ পশারিণীর দেখা যদি পাও কভু,
বিচারের চোখে দেখো না,—বরং নীরবে দাঁড়ায়ো যেন ;
নিভৃত বুকের ভগ্ন দেউলে জ্বলুক একেলা বসে
ক্ষুধিত প্রাণের ব্যথিত স্বপন বেদীর শিখার হেন !

[হু হু করে কেঁদে উঠে দুহাতে মুখখানি ঢেকে রাখল। দোরে মৃদু আওয়াজ হ'ল—ঠক ঠক! প্রীতি বিস্ময়ে তাকায়। আবার সেই আওয়াজ]

আসুন।

[দুলতে দুলতে খুলে যায় দোর,—যেন আপন খুশিতে। বাইরে দোরের সামনেই স্পষ্ট দেখা যায় ভরা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বৃদ্ধ শিল্পী,—দেখতে কেমন যেন একটু অদ্ভুত ধরণের। বুড়ো হ'লেও মোটেই অশক্ত বলে মনে হয় না। ছেলের দল দেখলেই এসে ঘিরে ধরবে এমন ধরণের সহজ মানুষ। গায়ে ঢিলে আলখাল্লা। সব দেখে খুব ভালো যাচ্ছে বলে মনে হয় না,—হাতে বেহালাটা না থাকলে তো গাঁয়ের বাজনদার বলেই ভুল হ'ত! কোনো কথা না বলে সে সোজা এগিয়ে এল ঘরের ভিতরে,—দোরটাও অমনি স্বেচ্ছায় বুজে গেল খুব আলগোছে। তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এসে]

সত্যিই ভারী অন্যায় হয়ে গেছে, দোরে আওয়াজ শুনেই খুলে দেওয়া উচিত ছিল।

শিল্পী : না, না, তাতে কি হয়েছে! দোর খুলে আসাই আমার অভ্যেস। তোমার দোরটা বরং অন্যের দোরের চেয়ে সহজেই খুলে গেল দেখছি। হ্যাঁ সত্যিকথা। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না—অনেক লোক আছে দোর একেবারে খিল দিয়ে আটকে রাখে, হাজার ঠকঠকানিতেও সুবিধে হয় না কোনো। ও তাইতো, তুমি হয়তো থ খেয়ে যাচ্ছ লোকটা কে?

প্রীতি : না, আমি ভাবছিলাম আপনার হয়তো ক্ষিদে পেয়ে থাকবে।

শিল্পী : হ্যাঁ, অনুমানটি ঠিক নারী-হৃদয়ের! তবে তোমাকে বহুৎ ধন্যবাদ, ঘটনাটা সত্যিই তা নয়। আমি অল্পাহারী, স্বল্পাহারী বললেই বরং ঠিক বলা হয়। একটুকরো হাসি, একটুখানি ছোঁয়া—ব্যস, অমনি আমি একেবারে কানায় কানায় ভরে উঠি।

প্রীতি : কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার? এ জায়গাটাকে আপন বাড়ীর মতোই মনে করবেন।

শিল্পী : [ঘনিয়ে বসে] সব জায়গাকেই আপন বাড়ীর মতো মনে করা

আমার অভ্যেস। আর বাস্তবিকই, প্রায় লোকেই ভাবে—আমাকে ছাড়া কেউ ঘর বাঁধতেই পারে না। পা দুটি চুল্লীর কাছে রাখব একটুখানি? এটি আমার বহুদিনের অভ্যেস, ওটুকু বাদ গেলে যেন কেমন লাগে।

প্রীতি : সবাই তো তাই বলে থাকে,—

চুল্লীর পাশে পা দুটি ছড়াতে
পেল না যারা,
তাদের প্রেম যে কাঁদিছে সঙ্গীহারা!

শিল্পী : ঠিকই বলেছ তুমি। গার্হস্থ্য সুখের এটিই হ'ল আসল পরিচয়। শোনো প্রীতি, তুমি বসে বসে কাঁদছিলে!

প্রীতি : হ্যাঁ।

শিল্পী : ষাট ষাট! জানি আমি জানি,—পিতম তো! তাহ'লে কথাটা হ'ল তুমি তাকে ভালোবাসো, কিন্তু তার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। সত্যিই এই বুড়ো দুনিয়াটা কী অদ্ভুত! অথচ তুমি কিন্তু তার জন্যেই কেঁদে কেঁদে দু'চোখ অন্ধ করছ!

প্রীতি : না, না, কাঁদি না তো! তবে আজকে তাকে বড্ড নিষ্ঠুর মনে হ'ল। তার মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়ে তুলবার জন্যে এত সাধ্য-সাধনা করলাম।

শিল্পী : নিষ্ঠুর, তাই কি?

প্রীতি : অবশ্যি সে ঠিক তাই হতে চায়নি। যা ঠাণ্ডা পড়েছে বাইরে, তা ছাড়া বিশেষ কিছুই হাতে আসছে না কয়েকদিন থেকে···

শিল্পী : আচ্ছা, পিতম কি তোমার অশ্রুমালার যোগ্য বলে মনে করো?

প্রীতি : নিশ্চয়ই!

শিল্পী : কিন্তু তুমি তো জানো, চোখের জল তো ফেলবার মতো নয়। আমাদের ভিতরটা ভিজিয়ে নরম করে রাখার মতো পরিমিত অশ্রুই সঞ্চিত রয়েছে বুকের ভিতর। কিন্তু সবই যদি খরচ হয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়—তবে প্রাণও যে শুকিয়ে ওঠে!

প্রীতি : কিন্তু কী চমৎকার লোক এই পিতম,—আমার মতো করে তো চেনেন না তাকে! কিছুতেই যে তার মন ওঠে না—সে-কথা অবশ্যি সত্যি। তবে, তারো কারণ আছে। আসলে,

কাউকেই সে বুকের ভালোবাসা উজাড় করে দিতে পারেনি! ভালোবাসা যে মানুষকে একেবারেই নতুন করে তোলে।

শিল্পী : সেকথা সত্যি। কিন্তু তোমার বেলায়ও নতুন কিছু হয়েছে কি?

প্রীতি : হয়নি আবার! আজকাল আমি পিতমের পায়ের জুতো রোদে দেই, ঝেড়ে-পুছে রাখি, তার মনের মতো করে চা করে দিই। আর মনটা সব সময়েই ভরে থাকে কেমন হাসিখুশিতে। তার জন্যে কিছু করেছি যে তাই! ভালো না বাসলে এসব মনে হ'ত দাসীপনা।

শিল্পী : তা, তোমার এটা সত্যিকার ভালোবাসা বলে বিশ্বাস?

প্রীতি : নিশ্চয়ই, এ যে মিথ্যে হ'তে পারে না।

শিল্পী : আচ্ছা, পিতমের কথা ভাবলেই শুনতে পাও কি তার পায়ের শব্দ? তার কথা শুনলে তোমার গালের উপরে তোমার বুকের ভিতরে অনুভব করো কি তার দুখানি হাতের আদর?

প্রীতি : [উচ্ছ্বসিত স্বরে] হ্যাঁ তাই, ঠিক তাই!

শিল্পী : তাহলে চিনেছ ঠিকই। কিন্তু পিতম তোমার বুকে এমন কবিতা এমন স্বপন জাগিয়ে তোলে কেন?

প্রীতি : কেন? সে যে পিতম, সে যে আমার পিতম!

শিল্পী : ঠিকই বলেছ, যেহেতু সে তোমার পিতম। সেই পুরানো যুক্তি আর কি!

প্রীতি : অবশ্য, পিতম একটু ভাবুক, তা ঠিক। কিন্তু—সেটুকুই যে তার প্রাণ। ঠিক জানি, ইচ্ছে করলে সে বড়-কিছু করতে পারে। লক্ষ্য করে দেখেছেন তার হাসিটুকু? সত্যিই খুব সুন্দর নয়! মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি অমন হাসি ফোটাতে চেষ্টা করি,—অমন করে হাসলে আমাকে কেমন দেখায় তাই। [বিষণ্ণভাবে] কিন্তু অন্যের দিকে চেয়ে চেয়ে না হেসে, সে যদি আমার দিকে আর একটুখানি হাসিমুখে তাকাত!

শিল্পী : তা হ'লে, সে অন্যের দিকে চেয়েও হাসে? তাই নাকি!

প্রীতি : আসরে প্রায় রোজই দু'একটি সুন্দরী মেয়ে আসে। আজকেও ছিল একজন। বেশ লম্বা, টুকটুকে লাল তার গাল। এই তো,

পিতম তাকে খুঁজতে বেরিয়ে গেল। তবে মেয়েদেরও তো দোষ দেওয়া যায় না ; পিতমের দিকে চোখ পড়লে বেচারীরা যে প্রেমে না পড়ে পারে না ! [গর্বের ভঙ্গীতে] আমি ঠিক জানি, তারা সকলেই তার প্রেমে পড়েছে, সকলেই !

শিল্প : কিন্তু মনে করো, সেই সব সুন্দরী মেয়েদের মধ্য থেকেই কেউ পিতমকে বিয়ে করে ফেলল।

প্রীতি : না না, তা করবে না। ভদ্রমহিলারা গরীব এক গায়ককে কক্ষনো বিয়ে করতে যাবে না। তবু পিতম যদি বিয়েই করে তো, আমি—আমি তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব······ও তাই তো, আমি কেন আপনার কাছে এমন করে কথা বলছি ! মনে হয়, আপনাকে চিনি যেন সেই কতকাল থেকে, কত যুগ-যুগান্তরের ওপার থেকে !

[শিল্পী উঠে প্রীতির কাছে এগোতে থাকে। প্রীতি টেবিলক্লথটা ভাঁজ করে]

শিল্পী : [খুব নিচু গলায়] হ্যাঁ, তুমি আমাকে চেনো—চেনো কত যুগ-যুগান্তরের ওপার থেকে।

[শিল্পীর কণ্ঠস্বর এত দরদভরা এত মর্মস্পর্শী যে প্রীতি শুনতে শুনতে টেবিলক্লথটা ভাঁজ করতে ভুলে যায়, চেয়ে থাকে শুধু। শিল্পী তার বিভোল চোখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে, তারপর গিয়ে বসে আগুনের কাছে, একটুখানি মৃদুহাসি লেগে থাকে তার ঠোঁটে,—সব সময়েই লেগে আছে যে হাসিটুকু]

[শিল্পী জামার পকেট থেকে ছোট্ট একটি ধনুক বার করে]

প্রীতি : বাঃ রে, এটা কী !

শিল্পী : [আঁৎকে ওঠার ভান করে] ; না, না ও কিছু নয় ! এ তো তোমার দেখার কথা ছিল না। তাই তো, পকেট থেকে বেরিয়ে ছিল, লক্ষ্য করিনি তো ! এক সময় তীর-ধনুকে বেশ ভালোই হাত ছিল আমার। এখন আর বিশেষ একটা সুযোগই মেলে না।

[ধনুকটি আবার পকেটে পুরে রাখে, দূরে পিতমের গান]

চাঁদমুখ চেয়ে থেকো নাকো আর ব'সে,
উত্তল সাগর টানে সে জ্যোৎস্না-জালে ;

মলয় মধুর চৈতী চামেলি রাতি
সান্ত্বনা আনে গোলাপের ঝরা-ডালে।

শিল্পী : [গানের সুর ঘনিয়ে আসতে আসতে চুপি চুপি] কে ?

প্রীতি : পিতম!

[জানালার পাশ দিয়ে এবার আসতে দেখা গেল একটি ত্রিকোণ টুপি, ঢুকল এসে পিতম!]

পিতম : নাঃ, কোথাও পেলাম না! [শিল্পীকে দেখে] ও তাই তো, আপনি কে ?

শিল্পী : চিনবে না, প্রীতি কিন্তু দেখেই চিনেছে।

পিতম : ও, তার মানে পুরানো প্রেমের শিখা!

শিল্পী : সত্যিই আমি পুরানো প্রেমের শিখা। বহুদিন থেকেই আমি দুনিয়ায় আলো জেবলে আসছি। তা—তুমি আমাকে বুড়ো ভাবছ বটে, তবে অনেকেই কিন্তু আমার বয়স হিসেব করে করে আমাকেই বলে নবীন। আচ্ছা, কতকাল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি বলে মনে করো।

পিতম : [পরিহাসের ভঙ্গীতে হাত দিয়ে মাপটা দেখিয়ে] তা—তা এতটা হবে!

শিল্পী : সারাটা দিন প্রহসন করে করে তোমার খুব ভালো যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না তো!

প্রীতি : পিতম, তোমার কিন্তু রাগ করা উচিত হবে না।

শিল্পী : [পিতমের সঙ্গে একলা থাকবার সুযোগ খুঁজে] দেখো প্রীতি, তোমাদের খাবারটা আনিয়ে রাখতে ভুলে যাওনি তো ?

প্রীতি : ওঃ তাই তো! এক্ষুনি ছুটে যাচ্ছি, দোকান তো বন্ধ হ'ল বলে! তা, ফিরে এসে আপনাকে পাব তো ?

শিল্পী : কথা দিতে পারছি না। তবে চেষ্টা করব, সত্যিই চেষ্টা করব।

[চলে গেল প্রীতি। দুজনেই নীরব। শিল্পী উৎসুক চোখে দেখছে পিতমকে]

আচ্ছা পিতম, তোমার ব্যবসা-পত্র মন্দা যাচ্ছে, না ?

পিতম : মন্দা! হাসিতে হাসিতে ঝরত যদি টাকার ফুলঝুরি, তবে তবে তো কথাই ছিল না। তা, কোথায় টাকা ? যা হ'ক, আজ তবু ভালো একটা কাজ হয়েছে। এক সম্পাদকের

সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছি ; তাদের পত্রিকায় আমাদের যাত্রার প্রশংসাপত্র বেরোবে। হ্যাঁ, ওতেই লোক টেনে নিয়ে আসবে। [গান শুরু করে],

বনের কোলে মোদের কুটির একদিন এসো চলে ;
বিকেল বেলায় এসো নাকো যেন, গরুদের দেই খেতে,
চান যে করাই হাঁসেদের আর নীল বিহঙ্গ-দলে,
তরমুজ-ফুটি রাখি কুটি কুটি চিনি মেখে উঠানেতে।

—এই গানটা লিখছি।

শিল্পী : দেখো পিতম, কুবেরের ধনভাণ্ডার উজাড় করে দিলেও তুমি সুখী হবে না !

পিতম : হব না! কুবেরের ধনভাণ্ডারটি আগে দিয়েই দেখুন না, তারপর না হয় ঝক্কিটা পোয়ানো যাবে। এই ধরুন যেমন, লোককে উঁচু উঁচু বিষয় শেখাবার জন্যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করব।

শিল্পী : তুমি স্বপ্ন দেখছ যশের, সম্পদের—ফাঁপা আদর্শের ! অথচ তোমার চোখের সামনে দিয়েই পিছলে যাচ্ছে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু ভালো। তোমার মনেই রয়েছে অসন্তোষ। কিন্তু কেন? কি করে সুখী হতে হয় জানোই না তুমি।

পিতম :

জীবনটা হ'ল চলন্ত ঝর্ণাঝোরা,
তার মাঝে ধরো মাছ ;
কাব্য তো এক লিখেছ দেখেই
নারীর অলক-সাজ।

এই গানটাও লিখেছি। এটা হ'ল দ্বিতীয়টা,—কথাগুলো হঠাৎ এসে যায় চমৎকার ! তৃতীয়টাও লিখে শেষ করছি।

শিল্পী : কোথাও-শেষ-নেই এমন গান রচনা করো না কেন, যা চলতে থাকবে চিরদিন চিরকাল।

পিতম : সে কি নেহাৎ ছেলেমানুষি হবে না ?

শিল্পী : তা অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করে, এবং সেরকম লোকের মন হওয়া চাই আলাদা,—খুব সন্তুষ্ট ধরণের।

পিতম : তার অর্থ ? আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে ?

শিল্পী : এবার ছোটখাট একটা কাজের কথায় আসা যাক।

পিতম : উত্তম প্রস্তাব। কোন্ আসনটি চাই আপনার? সামনের সারিতে পাবেন মখমলের—এক টাকা। পিছনে রয়েছে কাঠের চেয়ার—ছ' আনা ; ডান দিকে চার আনা! আপনি নিশ্চয়ই এক টাকার আসন নিচ্ছেন, ক'টা?

শিল্পী : তুমি জানো না আমি কে?

পিতম : তাতে তফাৎ হচ্ছে না কিছুই, সবার জন্যেই দোর খোলা আছে। সত্যিই, আপনারা যে অনুগ্রহ করে এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন সেজন্যে ধন্যবাদ।

শিল্পী : পিতম, আমি হ'লাম স্বপন-শিল্পী।

পিতম : কি?

শিল্পী : এই দুনিয়াময় যে সব স্বপ্ন ডানা মেলে ঘুরে বেড়ায় তাদের সৃষ্টি করি আমি।

পিতম : অর্থাৎ আপনার শরীরটা আজ ভালো নেই! মাথা ধরেছে?

শিল্পী : পিতম, তোমার কঠিন মন আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না ; কিন্তু অন্য যে কোনো মানুষ,—সাধারণ যে কোনো মানুষই একডাকে সাড়া না দিয়ে পারত না। যেসব স্বপ্ন যেসব ছোটখাট কথা মানুষের প্রাণের তলে তলে মুকুলিত হয়ে ওঠে, জীবনে খুশির জোয়ার আনে—আমি তাদেরি সৃষ্টি করে থাকি।···আচ্ছা, শীতের দিনে কোথায় চলে যায় চাতকের দল,—ভেবে ভেবে কখনো কি অবাক হয়ে যাওনি? তারাই তো উড়ে আসে আমার স্বপন-কুঠিতে, এসে বলে যায় দুনিয়ায় কারা হ'ল স্বপন-পিয়াসী। আর, যেসব স্বপ্ন তারা নিয়ে গিয়েছিল আগের বসন্তে···তাদেরি বা কী হ'ল!

পিতম : ও, আপনি বুঝি ভেবেছেন আপনার সবকথাই বিশ্বাস করছি।

শিল্পী : আচ্ছা, ফুল শুকিয়ে গেলে কোথায় চলে যায় তাদের রঙ, শীতের দিনে কোথায় উড়ে যায় রঙীন প্রজাপতির দল, তুমি কি কখনো অবাক হয়ে ভাবোনি? আমার স্বপনকুঠির ধারে-কাছেও তো শীত ব'লে কিছু নেই!

পিতম : এসব কথা তো ভাবিনি কোনোদিন।

শিল্পী : আমার স্বপনকুঠিকে বলা যায় হারানো মালের দপ্তর। দুনিয়ার অবহেলিত সমস্ত সুন্দর জিনিষই এখানে এসে বাসা

বাঁধে ; আর এখানেই আমি রচনা করি আমার অমূল্য স্বপনমালা। সে স্বপন হ'ল ভালোবাসা !

পিতম : হাঃ হাঃ, বেশ বলেছেন কিন্তু।

শিল্পী : বিশ্বাস করছ না ?

পিতম : তা—তা—এক রকম করি বৈকি ! তবে কথাটা হচ্ছে কি, টেঁকে না, রঙ্ টেঁকে না। রূপ আছে তো প্রাণ নেই, প্রাণ আছে তো রূপ কোথায় ? আমি অবশ্যি বিশ্বাস কায়েম রাখবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা না করেছি তা নয়,—কিন্তু প্রথম ধোপেই মিলিয়ে যায় রঙ !

শিল্পী : তুমি শুধু নকলটাই দেখেছ। খাঁটি রতন না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

পিতম : তা, কি করে চিনব ?

শিল্পী : চিনবার লক্ষ্মণ রয়েছে কতো। পেলেই বুকের ভেতরে দুরু দুরু হবে শুরু। তার অর্থ গজিয়ে উঠেছে প্রেমের ডানা। তারপর মনে হবে, যেন উড়ে চলে গেছ তারাদের মাঝে, মেঘের মিনারে বসে গান গাইছ চাঁদের কাছে। আমার স্বপন-রচনায় চাঁদের বিশেষ দরকার হয় কিনা ! আমি টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে তার সবটাই একে একে কাজে লাগিয়ে নিই, তার পরে তা আবার ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। রোজই তো তোমরা তাই দেখে থাকো······

পিতম : বাঃ, বেশ মজার তো ! আচ্ছা, চাতকেরাই কি স্বপ্নদের নিয়ে আসে ?

শিল্পী : তা কেন ? আরো কতো দূত রয়েছে আমার। রোজ রাতে বড় ঘড়িটায় যখন বারোটা বাজে, দিনপঞ্জী থেকে খসে খসে পড়ে এক' একটি দিন—অমনি তারা উড়ে চলে আসে আমার স্বপনকুঠিতে—'সে-অনেক-দিন-আগের কথা'-র দেশে ! আমি তাদের গায়ে গায়ে নরম তুলিতে বুলিয়ে দেই লালিমা আর সোনালি ঝিলিমিলি ! বলি—'যাও বিগত দিনেরা, চলে যাও মাটির দুনিয়ার বুকে, হয়ে থাকো স্মৃতিকথা।' তবে আমার নিজের স্বপ্নেরা হ'ল বর্তমানের। কচি-কচি শিশুদের ডেকে এনে আমি স্বপ্নমালায় সাজিয়ে রাখি, তারপর তাদের পথ-খরচ

চুকিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিই···কেমন করে পাঠাই তো জানোই।

পিতম : আমিও আজীবন স্বপ্ন দেখে আসছি, কিন্তু সেইসব স্বপ্ন আমার নিজের মনগড়া···মনে হয় তাদের ঠিকমতো সাজাতে পারিনি।

শিল্পী : তুমি যে তার প্রাণটুকুই বাদ দিয়ে দিয়েছ। একটুখানি দুঃখ মিশিয়ে দাও, যেটুকু কড়ামিষ্টি রয়েছে তবেই তো তা মধুর হয়ে উঠবে। এ কথাটা আমি বেশ মনে প্রাণে বুঝেছি। সোনালী উষার শিশির-বিন্দুরা রচনা করে যে অপরূপ মুক্তো-মালা—আমি অশ্রু-অভিষেকে সিক্ত করে তুলি আমার ভালোবাসার সেই স্বপ্ন!

পিতম : [উৎফুল্ল হয়ে] অশ্রু-অভিষেকে! বাঃ, কী সুন্দর! সত্যি সত্যি বলছি, এবার আমি সত্যিকার একটিকেই দেখতে চাই, আমার নিজের মনগড়া কাউকে নয়।

শিল্প : তা তো কতোই রয়েছে, খুঁজে নিলেই হ'ল।

পিতম : সে তো ভালো কথাই ছিল, কিন্তু ছন্নছাড়া স্বপ্নের পিছুপিছু কে আর ঘোরে—বলুন।

শিল্পী : ঠিক তোমার মনের মতো করেই একটি স্বপ্ন আমি রচনা করেছিলাম, তারপর তাকে দিয়ে দিলাম একটি শিশুর বুকের ভিতর। সে আজ বিশ বছর আগের কথা; আজ সেই শিশুই হয়ে উঠেছে ভরা বয়সের তরুণী। বড় বড় কালো চোখ তার সোনালি চুল।

পিতম : বলুন, বলুন, তার কথা শুনতে ভারী ভালো লাগছে।

শিল্পী : আরো বলছি, তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবার সময় আমি একটা রসিদ নিয়ে রেখেছি। এই যে নিয়ে নাও তুমি।

পিতম : সে তো খুবি ভালোকথা, কিন্তু ও দিয়ে কী হবে আমার?

শিল্পী : তার অর্থ? এই রসিদ যার হাতে থাকবে সেই তো জিনিষটির উপর দাবী খাটাতে পারবে। রসিদের মধ্যে বিস্তৃত ফর্দ লেখা আছে দেখতে পাবে। আমি বলছি, সত্যিই তোমার কপাল খুলে গেল!

পিতম : আচ্ছা, তার গাল কি গোলাপের মতো, গলায় কি বড় বড় মুক্তোর মালা?

শিল্পী : না।

পিতম : ও, তবে তো সে নয়। কোথায় পাব তাকে ?
শিল্পী : তা, তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে—এটুকু করতেই হবে।
পিতম : বেশ, এক্ষুনি যাচ্ছি আমি। [বেরোবার উদ্যোগ করে]
শিল্পী : এই দুপুর রাতে ! আমি হ'লে তো বেরোতাম না।
পিতম : কিন্তু আমার যে আর তর সইছে না ; আমার আগেই আর কেউ হয়ত তাকে খুঁজে পেতে পারে।
শিল্পী : এক ছিল লোক, সে কেবল ভুঁইফোঁড় কুড়িয়ে ফিরত।
পিতম : [ভুঁইফোড়ের মতো অতি তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখ শুনে বিস্ময়ের সুরে] ভুঁইফোঁড় !
শিল্পী : হ্যাঁ। ভয় ছিল, তার আগেই কেউ যদি গিয়ে পড়ে। তাই রাতারাতি রওনা হ'ল সে। ভোর হ'লে দেখা গেল সেখানে ভুঁইফোঁড়ের নামগন্ধও নেই। কাজেই ক্ষুন্নমনে সে বাড়ী ফিরছিল। বাগানের পথে আসতে আসতে দেখে কি—তারি ঘরের দোর-গোড়ায় রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে মস্ত এক ভুঁইফোঁড়ের ক্ষেত। তাই, অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ শোনো তো আর একটুখানি অপেক্ষা করো।
পিতম : তাহলে···আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলতে পারেন,—আমি কি তাকে খুঁজে পাব।
শিল্পী : নিশ্চিত কী করে বলি ! তুমি নিজেকে এত খেলো মনে করো ?
পিতম : তা অবশ্যি—তা অবশ্যি—তা এমন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলে···অর্থাৎ কিনা মুশকিলের কথা হ'ল···তবে সোজাসুজি বলতে গেলে, মানুষ যেমন মানুষের—পুরুষ মানুষ যেমন··· (দ্বিধা করে)
শিল্পী : [এগিয়ে দিয়ে] হ্যাঁ, বলো।
পিতম : আমার কিন্তু কেবলি নিজের কথা মনে হয়—
শিল্পী : ঠিকই বলেছ ! সেই তো তোমার গোড়ার গলদ ! তারার দিকে চেয়ে চেয়ে চলতে গিয়ে ছোট্ট একটি জোনাকীকেও পিষে ফেলতে পারো পায়ের তলায় ! আচ্ছা, আর একটা গানের ভাব দিচ্ছি—

জীবন নারীর মতো ডাকিছে তোমায়,
জেগে ওঠো দাও সাড়া ;

রজনী ঘনায়ে এলে ঝরিবে আঁধারে
করুণ অশ্রুধারা !

[শিল্পীর দরদী কথার সুর পিতমের মনের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করল, অভিভূত হয়ে পড়ল পিতম। কিছুক্ষণ আগেই প্রীতি হয়েছিল যেমন। তাকিয়ে আছে এ-ওর মুখের দিকে। তখন জানালার পাশ দিয়ে দেখা গেল একটি লাল ওভারকোট,—ঢুকল এসে প্রীতি ! হাতে রয়েছে কিনে-আনা জিনিষগুলি]

প্রীতি : আঃ, আপনি রয়েছেন তা হ'লে ! ভারী খুশি হলাম।

শিল্পী : কিন্তু—এখনি যে উঠতে হবে আমাকে ! জানো না কত বড় পর্যটক আমি !

প্রীতি : [যেতে না দেবার উদ্দেশ্যে দোর আগলে দাঁড়িয়ে] না, না, আপনি চলে যাবেন না।

শিল্পী : তবে কি আমাকে জানলা দিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে ! খুবি অসুবিধেয় না পড়লে তো ও-পথ নিই না !

পিতম : [একটু চঞ্চল ভঙ্গীতে, প্রফুল্ল সুরে] মনে রেখো, উনি অতিথি ! কাকে অভ্যর্থনা করছ জানো না তুমি ! স্রোতের বুকে মাছের মতো এই দুনিয়াময় যে সব স্বপ্নেরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় তাদের সৃষ্টি করেন—এই তোমার সামনে যিনি বসে রয়েছেন ! উনি ওঁর শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন-সৃষ্টিকে গ্রহণ করবার রসিদটিই আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন তাকে খুঁজে পেলেই হয় ! [হঠাৎ নিচু গলায় নেমে] কোথায় যে তার ঠিক-ঠিকানা মিলবে জানতে পেতাম একটিবার।

শিল্পী : যাবার আগে তোমাকে কয়েকটি কথা ছন্দে গেঁথে দিয়ে যাচ্ছি :

পুরুষেরা হ'ল বোকা,
তাদের উচিত মেয়েদের স্কুলে ঢোকা !

[অভিবাদন জানিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল]

প্রীতি : [দোরের কাছে ছুটে গিয়ে চারদিকটা চেয়ে চেয়ে দেখে] এর মধ্যেই চলে গেল ! কোথাও তো দেখছি না আর !

পিতম : এবারে আমি আমার প্রাণের স্বপ্নকে খুঁজে পাব ! তারপর বেশ জাঁকজমক করে বিয়ে হবে আমার : পরব জমিদার জামা,

হাতে নেব সোনায় মোড়ানো ছড়ি ! [গানের সুরে]
খেলা ছেড়ে এসো, সখি ! ভিজা ঘাসে ঘাসে
পায়ে বুঝি হিম লাগে, মরি তাই ত্রাসে !
রাতের বেলায় মুছে দেব পথখানি,
হে আমার প্রিয়তমা হৃদয়ের রাণী !

মনে হয় আমি যেন প্রবেশ করতে চলেছি পুরুষের স্বপ্নের দেশে—নারীর প্রেমের দুনিয়ায়।

প্রীতি : হ্যঁ, সুখী হও তুমি !

পিতম : [খোঁচা দিয়ে গান ধরে]
দেখা হবে গোপনে রাতের স্বপনে,
তবে নিশ্চয় নয় নয় জাগরণে।
তুমি হয়ো স্বপন-সরোবর,
আমি বন মনোহর ;
সরোবর তটে তোমা সাথে দেখা হবে,
বনে এলে যদি—মোরেই দেখিবে তবে !

প্রীতি : তবে আগে থেকেই কিন্তু টাকাকড়ি জমিয়ে নিতে হবে। সেই মেয়ে এসে যা-যা চায় দিতে হবে তো। তা, আমি আসরে গিয়ে গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে লুটিয়ে পড়ব মাটিতে, আর সবাই বলবে—'হ্যাঁ, নেচেছে বটে ! নাচতে নাচতেই মরে গেল !'

পিতম : ঠিকই বলেছ—দুজনে মিলে এখন আসর জমাতে হবে। এক্ষুনি আমি পত্রিকার প্রবন্ধটা শেষ করে ফেলছি।

[ড্রয়ার থেকে কালি-কলম নিয়ে টেবিল এসে লিখতে শুরু করল] :
কয়েকদিন হইল শহরে একটা মজলিশী নাচগানের দল আসিয়াছে,—আসরে যুগপৎ নৃত্যগীত পরিবেশন করা হইতেছে। দর্শকেরা পিতমের নাচে ও গানে মন্ত্রমুগ্ধ। ...প্রীতির ললিত নৃত্যকলা সকলেরই মন হরণ করিয়াছে। প্রীতি বিশ বছরের সুন্দরী তরুণী। চুল—কি রকম ?

প্রীতি : সোনালি, পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে।

পিতম : বেশ অদ্ভুত ব্যাপার তো ! একটা লোক রোজ রোজ দেখছে, অথচ জানে না চুলটা কি রকম ? আচ্ছা বেশ, সোনালি চুল—পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। চোখ দুটি আসমানের মতো নীল !

নীল আর সোনালি ! অবশ্য, এর কোনো অর্থ হয় না।

প্রীতি : কিসের অর্থ হয় না ?

পিতম : না, একটা কথা ভাবছিলাম আমি। তা, প্রায় মেয়েরি তো নীল চোখ আর সোনালি চুল !

প্রীতি : হ্যাঁ পিতম, আমরা তো আর মানস-সুন্দরী নই !

পিতম : বাঃ, কী মিষ্টি শোনাচ্ছে তোমার কথা ! এ আমার হ'ল কী ? অবশ্য এর কোনো অর্থ হয় না !

[পকেট থেকে রসিদটা বার করে পড়তে লাগল]

প্রীতি : কিসের অর্থ হয় না পিতম, বলবে না আমাকে ?

পিতম : আলোতে একটু দাঁড়াও তো এসে !

প্রীতি : ব্যাপার কি বলো তো !

পিতম : ব্যাপারটা যে কিছুই নয় তা ঠিকই ! [প্রীতির মুখের দিকে তাকায়]

চোখে বলে, ভালবাসি তোমাকেই !
বাহু বলে, চাই আমি তোমাকেই !
ঠোঁট বলে, আর কেন দ্বিধা এই !

—একি সত্যি, একি সত্য ? এত সুন্দর তুমি, এত অপরূপ ! কৈ, আর কখনো তো লক্ষ্য করিনি ! তুমি যেন মোটেই আর সেই আগের তুমি নও ! মনে হয়, নতুন এক শিল্পীর হাতেই গড়ে উঠেছে তুমি—একেবারে নতুন রূপে !

প্রীতি : আজ তোমার হ'ল কি, পিতম !

পিতম : এ যে ভালোবাসা ! এত দিনে-রাতের শেষে আজ খুঁজে পেয়েছি ভালোবাসা। তুমি কি কিছুই বুঝছ না, প্রীতি !

বোকা ছিনু আমি,
তোমার হতেই শিখেছি প্রথম
জীবনে যা-কিছু দামী।

একি আশ্চর্য ! রোজ রোজ দেখছি তোমাকে, অথচ স্বপ্ন দেখিনি ! ভুলেও স্বপ্ন দেখিনি ? হ্যাঁ, তুমিই সেই মধুর স্বপ্ন ! শিল্পীর সেরা স্বপ্ন ! তাই তো আজ মনে হচ্ছে, আমার সারা বুক ভরে উঠেছে সোনালি উষায় !

প্রীতি : পিতম।

পিতম : ওই শোনো আমার বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে! সাধ হয়, ডানা মেলে উড়ে যাই নীল আকাশের ওপারে! উড়ে চলে যাই, মেঘের মিনারে বসে গান গাই তারাদের মাঝে।

প্রীতি : চাঁদের দেশে বসে আমার প্রাণের দেবতার পথ চেয়েছিলাম—সে যে কত যুগ যুগান্তর! পিতম, তোমার মুখের ঐ মধুর হাসিটি আমার ঠোঁটে লাগিয়ে দাও—মধুর চুম্বনে!

[হাত দুটি পিছনে রেখে দুজনেই ঝুঁকে আসে, অধর যুগল মিলিত হয় নিবিড় চুম্বনে। প্রীতি পরম পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে]

আঃ, আমার চেয়ে সুখী নয় কেউই—সাধ হয়, মরে যাই!

পিতম : প্রীতি, এসো আমরা আগুনের কাছে পা ছড়িয়ে বসি,—আনন্দে কাটিয়ে দেই সারাটি জীবন!

[দুজনেই ধীরে ধীরে চুল্লীর কাছে ঘনিয়ে বসে, পিতম চাপা সুরে গান ধরে]

বড্ড পিছল আকাশের খাড়া সিঁড়ি,
চাঁদ-মুখ চেয়ে থেকো নাকো খুশিমনে ;
দুয়ারে সোহাগ-শীতল মাধবী রাতি,
ঘুম পাড়াতে সে এলো মৃদু চুম্বনে!

[চিমনির মাথায় বাতির সলতে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়েছে, চুল্লীর আগুনের লাল আভাটিই শুধু লেগে আছে দুজনের মুখে। যবনিকার পর্দা চুপিচুপি এগিয়ে এসে দুজনকে আড়াল করে রাখল]

॥ বাড়ির পথে ॥

খিভার দিক থেকে হাওয়া দিচ্ছে প্রবল বেগে, দাঘেস্তানের কালো কালো পাহাড় শ্রেণীতে ঝাপটা মেরে এবং ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়ছে কাস্পিয়ান সাগরের হিমজলে, তীরে তীরে ভেঙ্গে পড়ে হয়ে উঠেছে তরঙ্গ-ফেনিল।

হাজার হাজার শুভ্র পাহাড়শ্রেণী বুকে ক'রে বিরাট সমুদ্র অনবরত দুলছে—নেশাখোরের মতো পাক খেয়ে খেয়ে নাচছে। যেন এক অতিকায় পাত্রের মধ্যে ভীষণভাবে উথলে উঠছে গলে-যাওয়া অফুরন্ত কাচ। জেলেরা সাগর ও বাতাসের এই খেলাকে বলে 'জড়াজড়ি নাচ'!

শুভ্র শীকররাশি সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হালকা মেঘ-মসলিনের মতো, আর ভিজিয়ে দিচ্ছে দিমাস্তুল এই বুড়িয়ে-যাওয়া স্কুনারটাকে। শুকনো ফলে বোঝাই-করা একটা মাল-জাহাজকে সঙ্গে নিয়ে স্কুনারটা চলেছে পারস্য থেকে অস্ত্রাখানের পথে, সঙ্গে বহন করে নিচ্ছে প্রায় শ'খানেক জেলে—যারা 'আল্লার কারবার'-এ জীবনধারণ করে।

উত্তর-ভল্‌গার বনাংশ থেকে চলে এসেছে এরা সবাই—বলিষ্ঠ বীর্য-বান জাতি: পাথরে-গড়া মাংসপেশী, আগুনে হাওয়ায় পোড়া, সমুদ্রের লোনা জলে লালিত—দাড়িওয়ালা সরল প্রাণী সব। বেশ-কিছু পকেটে নিয়ে এবার তারা বাড়ি ফেরার উল্লাসে উন্মত্ত, ডেকের উপরে তারা হৈ-হল্লা করছে বুনোদের মতোই।

তরঙ্গের শুভ্র মেখলার নিচে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের অতিকায় সবুজ-রঙ দেহ, স্কুনারের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ জল কেটে চলেছে হালের ফলার মতো। আর, শরতের শীতল সমুদ্রের তুষার-ফেনায় ভিজে যাচ্ছে তাদের নিচু ত্রিকোণ-পাল। উপরের পালগুলি ফুলে উঠেছে উল্লাসে—তালি-দেওয়া জায়গায় শব্দ হচ্ছে সড়্‌সড়্‌। পালের থামগুলিতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ কথা, টং টং করে উঠছে জোর-টান দড়িগুলিও—তারের মতো। সমস্তই সামনের টানে ঝুঁকে-পড়া।

মেঘগুলি ছুটে চলেছে আকাশপথে, উজ্জ্বল রুপোলি সূর্য তাদের মধ্যে ডুব মারছে। আশ্চর্য, নিচে যেমন সমুদ্র উপরেও ঠিক তেমনি বিক্ষুব্ধ আকাশ!

সকলে অনেকক্ষণ ধরে সঙ্গীতে মত্ত, কিন্তু এখনো সুর ঠিক মিলছে না। আক্রোশে ধেয়ে আসছে শোঁ-শোঁ প্রবল হাওয়া—উড়িয়ে নিচ্ছে সকলের কণ্ঠস্বর উচ্ছহাসি গানের ভাষা সমস্তকিছুই। দমকা হাওয়া এসে জলকণার ঝাপটা মারছে গায়কদের মুখের মধ্যে। মাঝে মাঝে দু'-একবার একটা মেয়ের ভাঙাগলা শোনা যায়, একটানা করুণ সুরে গেয়েই যাচ্ছে—'আগুনে সাপের মতো···'

শুকনো খুবানীর ঝাঁঝালো-মিষ্টি গন্ধ অবাধে ছাপিয়ে উঠছে সমুদ্রের তীব্রগন্ধকেও। ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে আকহুক বন্দর। শীঘ্রই চেকেন দ্বীপপুঞ্জ দেখা দেবে অদূরে। কতো প্রাচীনকাল থেকে এই জায়গাটা রুশিয়ার লোকের কাছে সুপরিচিত,—এইখান থেকেই তো কিয়েভের কতো লোক বেরিয়েছে তাবারিস্তান বিজয়-অভিযানে! বন্দর-প্রান্তে শরতের নির্মল নীলের মধ্য দিয়ে ককেশাশের কালো পর্বতশ্রেণীর ছবি জেগে উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান মাস্তুলটার ওখানে প্রশস্ত পিঠটায় হেলান দিয়ে বসে আছে একটি লম্বা-চওড়া যুবক, এখনো মুখে তার দাড়িগোঁফ দেখা দেয়নি। পরনে সাদা একটা পশমী সার্ট, আর নীল পারসিক ট্রাউজার; উজ্জ্বল-লাল দুটি পরিপূর্ণ অধরোষ্ঠ, নীলাভ নির্মল চোখ দুটি ঠিক শিশুর মতো সরল—জ্বলজ্বল করছে যৌবনের উল্লাস-নেশায়। ডেকের উপরে পা দুটি খুশিভরে ছড়ানো, তার উরুদেশে শুয়ে আছে একটি কিষাণ যুবতী—মাছ-ধোয়া বা মাছ-কাটা কাজের মেয়েদের একজন। ছেলেটির মতোই দীর্ঘ বিপুল তার দেহ, রোদে জ্বলে-পুড়ে মুখখানা কঠিন লালচে পোড়-খাওয়া, চাতকের পাখার মতো ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ ভ্রু-যুগল, নেশা-ধরানো চোখ দুটি আধোবোজা। ছেলেটির উরুর উপর মাথাটি রেখে সে এলিয়ে আছে আলস-ভরে। তার বোতাম-খোলা লাল কাঁচুলিটার ভাঁজ ঠেলে ঠেলে উপরে উঠেছে দুটি স্তন—সে স্তন এত দৃঢ় যে মনে হয় পাথরে কুঁদে গড়া! ছেলেটির দীর্ঘ পেশী-বহুল বাহু দুটি কনুই পর্যন্ত খোলা। সে তার চওড়া থাবা দিয়ে ধরে আছে মেয়েটির বাম স্তনটা, আর সেখানে আঙুলগুলি বাজাচ্ছে আস্তে আস্তে তাল ঠুকে। অন্যহাতে টিনের একটা পাত্রে ঘন সুরা, তা থেকে নীলাভ ফোঁটা টপটপ পড়ছে বুকের শার্টের উপর।

ঈর্ষাভরা উৎসাহে সবাই তাদের ঘিরে রয়েছে চারপাশ থেকে।

অগোছালোভাবে গা এলিয়ে-দেওয়া মেয়েটিকে তারা যেন আস্বাদ করছে লুব্ধ চোখে, আর সেইসংগেই তারা যার যার টুপি ধরে রাখছে একহাতে—হাওয়ায় যাতে মাথা থেকে উড়ে না যায়, গায়ে জড়িয়ে রেখেছে কোটটাও।

বিরাটাকার সবুজ তরঙ্গ উঁকি মারছে জটাবিপুল জন্তুর মতো রেলিং পর্যন্ত উঁচু হয়ে, মেঘেরা হন্ হন্ করে ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক নানা-রঙ আকাশের মুক্ত প্রান্তরে। বেজে উঠছে বুভুক্ষু চিলের তীক্ষ্ন চীৎকার। শরতের সূর্য ফেনিল জলে নৃত্য-চঞ্চল; কখনো নীল ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে সব, কখনো জলের বুকে বিচিত্র মণিমুক্তার অজস্র ঝলক।

স্কুনারের যাত্রীরা চীৎকার করছে আনন্দে, গান গাইছে উচ্চকণ্ঠে, মাতাল হয়ে আছে হাসিখুশিতে। শুকনো ফলে ভর্তি কতকগুলি বস্তার গাদার উপরে মদের মস্তবড়ো একটা চামড়া-থলে, তারি চারপাশে বিরাটদেহ দাড়িওয়ালা কিষাণেরা চীৎকার ও হৈ-হল্লা করে ধ্বস্তাধ্বস্তি লাগিয়ে দিয়েছে।

সবকিছুর সঙ্গেই যেন জড়িয়ে আছে সুদূর ইতিহাসের প্রাচীন গন্ধ। স্তেঙ্কা রেজিনের সেই পারস্য-অভিযানের কথা মনে পড়ে। নীলপোশাক-পরা পারসিক নাবিকেরা উটের মতো হাড়গিলে দৃষ্টি মেলে চেয়েছে: রাশিয়ার এই লোকদের আমোদ-আহ্লাদ দেখছে, আর দাঁত বের করে একটু একটু হাসছে, পৃথিবীর পূর্বদেশের ঘুমভরা চোখে খেলছে বিচিত্র হাসি।

এক বুড়ো,—মুখে একটা চাপা হিংস্রতা, মুখখানা তার হাওয়ায় ঝাপটায় ঝাপটায় কোঁচকানো, জাদুকরের মতো একরাশ চুলের মধ্যে দিয়ে ঝুঁকে আছে বাঁকা নাকটা—সে ওই দুটি জুটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেয়েটির পায়ে হুঁচোট খেয়ে। থেমে প'ড়ে মাথাটায় এমন মেজাজে একটা ঝাঁকুনি দিল, যেন সে বুড়োই নয়; চেঁচিয়ে বলল—'আচ্ছা তো! পথটা আটকে রাখছ কোন্ আহ্লাদে? দেখো না, এই নিলাজটাকে দেখো; ভাগ্!'

মেয়েটি একটু নড়ল না পর্যন্ত, এমন কি কষ্ট করে চোখও খুলল না, তার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল শুধু! ছেলেটি সোজা হয়ে উঠে বসল এবং পাত্রটা ডেকের উপরে রেখে মস্তানের মতোই বলল—

'কি হ'ল, নেতভ্ দাদু! ঈর্ষা হয় বুঝি? যাও যাও, নিজের নিজের কাজে যাও গে! ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে, বুকখানা ফাটিয়ে কি লাভ,

বলো ? এই কড়া মধু তোমার কপালে নেই !'—এবার সে হাত দুটি একবার তুলে নিয়ে আবারো চাপ দিয়ে ধরল মেয়েটির দুটি ঘাড়কে, বিজয়ের ভঙ্গীতে বলল—'বুঝলে দাদু, সমস্ত রাশিয়ার 'জন্ম দেবো আমরা !'

শুনে মেয়েটি একটু আলগা হাসি হাসল। আর, ঠিক তক্ষুনি সবকিছু—এই স্কুনার তার আরোহীরা—সমস্তকিছু মিলে দুলে উঠল একটি বুকের মতো ! একটা মস্ত বড়ো ঢেউ জাহাজের গায়ে এসে ভেঙে পড়ল, নোনা জলকণায় ভিজিয়ে দিল সবাইকার দেহ, শায়িত মেয়েটির দেহটিও। এবার সে তার কালো দুটি চোখ আধা-খোলা করে বুড়োটার দিকে যুবকটির দিকে—তার চারপাশের সবকিছুর দিকেই একবার মিষ্টি ক'রে তাকাল, এবং নিজের গা ঢাকতে লাগল আলস-ভরে।

'না গো, না !'—ছেলেটি তার হাতখানা ধরে ফেলে—'ওরা দেখুক, রাগ ক'রো না ওদের উপর।'

একটা নাচের সুর ধরেছে মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে। উৎফুল্ল জোরালো একটি নবীন কণ্ঠ দ্রুত তালে গান গাইছে ঃ

'রুপো আর সোনা কিছুই চাইনে আমি,
মানিকের চেয়ে প্রিয়া মোর ঢের দামী !'

সঙ্গে সঙ্গে ডেকের উপর বুটের নৃত্য-সঙ্গত ! সঙ্গে সঙ্গেই কেউ চীৎকার করছে প্যাঁচার মতো, একটা বাজনা বাজছে ক্ষীণস্বরে, আর উঁচু থেকে আরো উঁচু পর্দায় ঠেলে উঠছে মেয়েলি গলার আহ্লাদী গান—

ব্যাঘ্রবীরেরা গর্জন করে বনে,
খিদের জ্বালায় প্রাণ যায় ক্ষণে ক্ষণে ;
শ্বশুর মশাই হোক না খাবার তবে,
ব্যাঘ্রের পেটে সুখে সে ঘুমিয়ে রবে !

সকলের তখন সে কী হোঃ-হোঃ হাঃ-হাঃ হাস্য-উল্লাস ! কে একজন কান ফাটিয়ে চীৎকার করে বলল,—'কি হে ঠাকুর্দারা, লাগল কেমন ?'

ঢেউয়ের গায়ে গায়ে হাওয়ারা দুলিয়ে দিয়েছে ছুটির হাসি।

দীর্ঘ-দেহ যুবকটি তার নিজের কোটটা দিয়ে মেয়েটির বুকটা আলস্য-ভরে ঢেকে দিল, এবং যেন একটু কী ভেবে তার ছেলেমানুষের মতো চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে রইল সামনে দিগন্তের দিকে, বলল—

'যখন আমরা বাড়ি পৌঁছব, মারিয়া গো, মারিয়া! তখন কী মজা, কী মজাটাই না হবে!'

পশ্চিম দিগন্তে জ্বলন্ত পাখায় উড়ে চলেছে সূর্য। মেঘেরা পিছু পিছু ছুটছে শিকারটা ধরতে, কিন্তু ধরতে না পেরে বিশ্রাম নিচ্ছে কালো পাহাড়ের তুষার-ঢাকা চূড়ায় চূড়ায়!

॥ সতীসুন্দরী ॥

(আফ্রিকার একটি উপাখ্যান অবলম্বনে)

মহান কোনো মঙ্গলের খাতিরেও ছোটখাট অন্যায় কাজ ঠিক নয়—এটা একটা মিথ্যা নীতিকথা। এটাই ছিল বিখ্যাত মহাপুরুষ সাধু আগস্টাইনের অভিমত। "ঈশ্বরের রাজ্য" নামক গ্রন্থের এক ভ্রমণ কাহিনীতে তিনি তা বিবৃত করেছেন স্পষ্টরূপেই।

তখনকার দিনে হিপ্পোতে ছিলেন এক সাধুবাবা। খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত এক প্রতিষ্ঠাতা তিনি এবং সেই অঞ্চলের সমস্ত মেয়েদেরই ধর্মপিতা। ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ বলে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল, ভাগ্যগণনায়ও হাত ছিল চমৎকার।

একদিন তাঁর কাছে এল একটি মেয়ে। নামটি তার 'কোজি স্যাংটা' বাংলায় বললে 'সতীসুন্দরী'। সমস্ত রাজ্যে এমন সুন্দরী আর ছিল না। মেয়েটির বাবা-মা ছিলেন গোঁড়া-ধার্মিক, মেয়েকেও লালন-পালন করেছেন গোঁড়া ধর্মমতে। অনেক প্রেমিকই মধু-সন্ধানে ঘুরে বেড়াত তার আশেপাশে, কিন্তু শিক্ষাগুণে একটিবারও নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেনি। দিন কয়েক হ'ল তার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে—কুপিনো নামে এক হাড়-বেরোনো বুড়োর সঙ্গে! তিনি অবশ্যি হিপ্পোর বিখ্যাত এক আইনজীবী। খিটখিটে রুক্ষ লোক—কথাবার্তা শুধু যে অপ্রীতিকর তাই নয়, তার উপরে চালবাজ ও চটকদার। বিষ ও হুল দুটোই সমভাবে বর্তমান ছিল তাঁর জিভে। ভয়ানক ঈর্ষাপরায়ণ, তাঁর স্ত্রীর কোনো বন্ধুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করাটা তার পক্ষে মরে গেলেও সম্ভব নয়। বেচারী মেয়েটি কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করল ঐ লোকটিকেই ভালোবাসতে—তিনিই তো স্বামী হবেন। মনে প্রাণে চেষ্টা করল বটে, তবে মনকে বাগ মানাতে পারল না কিছুতেই।

সে তার সাধুবাবার কাছে জানতে এল, এই বিয়ে মঙ্গলের হবে কিনা। বৃদ্ধ ভবিষ্যাণী করে বললেন—'তোমার গুণই ডেকে আনবে অনেক বিপদ। তোমার স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হবে তুমি তিন-তিন বার, এবং সেইসূত্রেই অর্জন করবে সতী-সাধ্বীর মহিমা।'

এমন কথা শুনে তো সরলা সতীসুন্দরী একেবারে ভেঙেই

পড়ল, কাঁদতে কাঁদতে সে সবকথা বুঝিয়ে দিতে বলল। কিন্তু এটুকুই শুধু জানতে পেল, তিনবার অর্থ একই সংগে নয়; তিনবার তিনটি বিভিন্ন ঘটনা।

সতীসুন্দরী এতে জানাল উদ্ধত আপত্তি, এমন কি সে সাধুবাবাকে অপমান করল পর্যন্ত! না, কখনো সে অমন সতী-সাধ্বী হতে চায় না।

…কয়েকদিনের মধ্যেই বিয়ে হ'ল তার। ঘটা হ'ল খুবি। ভীরু লাজে সে সয়ে গেল চারিদিকের যত ঠাট্টা-ইয়ার্কি। কয়েকটি সুন্দর যুবকের সংগে রাতে নাচল সে, এবং কি ভাবতে ভাবতে জেগে উঠল ভোরে। তার ভাবনার কারণ অবশ্যি মুখ্যত তার স্বামী নয়, অন্য একজন যুবক—রাইবলডজ। কখন যে এই তরুণটি তার মনের রাজ্য জুড়ে অধিষ্ঠান করেছে, তা সে নিজেই জানে না। রাইবলডজ যেন কামদেবেররই প্রতিমূর্তি। প্রণয়স্ফুট সারল্যে নিটোল তার রূপ,—লীলাচতুর প্রেমিক যুবক সে। কিছুটা খেয়ালী বটে, তবে তা তার দরদীদের মধ্যেই। সমস্ত হিপ্‌পোরই সে বুকের মানিক; তার জন্যেই শহরের সমস্ত মেয়েদের মধ্যে লেগে থাকে কাড়াকাড়ি ঝগড়াঝাটি মনোমালিন্য। রাইবলডজ হঠাৎ কারো প্রেমে পড়ে বসত—অনেকটা খেয়ালের বশেই। তবে সতীসুন্দরীকে ভালোবাসল সে প্রাণের মতো, এবং এই নারী দুর্লভ ব'লেই তার জন্যে পাগল হয়ে উঠল।

বুদ্ধিমানের মতো প্রথমে সে নানাদিক থেকেই চেষ্টা করল সতী-সুন্দরীর স্বামীর সংগে ভাব জমাতে, সে তাঁর চেহারা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির খুবি প্রশংসা করল, তাস খেলতে বসে ইচ্ছে করেই হারাল বারম্বার, এবং রোজই তাকে বিশ্বস্তসূত্রে বলে গেল নিজের সব গোপন কাহিনী। সতী-সুন্দরী রাইবলডজের মতো এমন সুন্দর পুরুষ দেখেনি কোনোদিন, নিজে সচেতনভাবে সবটা না বুঝলেও তার প্রণয়েই ডুবে রইল। নিজে সে বোঝেনি বটে, তবে তার হয়ে স্বামী বুঝলেন সবি। স্বামীটি বুড়ো হ'লেও সন্দেহবাই ছিল সাংঘাতিক: তা হ'লে তো শুধু তাঁর উদ্দেশ্যেই আসে না ঐ যুবকটি! কোনো অছিলা খুঁজে এবার তিনি যুবকটির সংগে বাঁধিয়ে নিলেন ঝগড়া, এবং তাকে নিষেধ করে দিলেন তাঁর বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে। সতীসুন্দরী দুঃখিত হ'ল খুবি, কিন্তু কিছুই মুখ ফুটে বলতে সাহস পেল না। রাইবলডজের সামনে খাড়া হ'ল বাধার পাহাড়, কিন্তু ক্রমেই তার কামনা হয়ে উঠল বেপরোয়া—সমস্ত বাধা

লঙ্ঘন করে তাকে দেখবার প্রতীক্ষায় সে যেন পাগল হয়ে উঠল। সাধু, ফকির ফিরিওয়ালা, বহুরূপী—কতভাবেই না লুকিয়ে লুকিয়ে সে তার প্রিয়ার কাছে যেত, তবুও তো তার মনে কোনো নির্দিষ্ট পরিবর্তন আনতে পারল না! সতীসুন্দরী যদি তার প্রণয়ীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলত, তবে তারা এমন ব্যবস্থাও করতে পারত যে স্বামীর সন্দেহ করার কোনো কথাই উঠতে পারত না। মেয়েটির মন তার প্রাণের বিরুদ্ধে কেবলি মাথা ঠুকে মরতে লাগল, কিন্তু বাইর থেকে তা বোঝার জো ছিল না,—শুধু তার মুখের উপরে দেখা যেত কেমন একটা মলিন ছায়া। আর, স্বামী মনে করতেন তাকে পাপিষ্ঠা!

বুড়ো স্বামী খুবি বদমেজাজী, তাঁর স্ত্রীর সতীত্বের উপরেই ঝুলে আছে আত্মসম্মান—পদ্মপত্রে নীরের মতো। তাই বুঝে স্ত্রীকে তিনি আচ্ছা করে অপমান করলেন এবং শাস্তিও দিলেন ইচ্ছেমতো। কারো চোখে সতীসুন্দরীকে সুন্দর লেগেছে—এই তার অপরাধ। মেয়েটির দশা তখন ভাবো একবার। একে মিথ্যা দুর্নাম, তার উপরে স্বামীর যথেচ্ছ অত্যাচার— অথচ এই স্বামীর কাছেই একান্ত বিশ্বস্ত সতীনারী সে। অন্যদিকে প্রণয়ের তুষানলে নিজের সঙ্গে সে যুদ্ধ করে মরছে দিনের পর দিন।

যদি তার প্রণয়ী কাছে না আসে তবে তার স্বামীও হয়ত এমন ব্যবহার করবেন না, প্রণয়ের ক্ষুধিত শিখাও নিভে আসবে ধীরে ধীরে—এই ভেবে সাহসভরে সে চিঠি লিখল একটা :

'আপনার শুভবুদ্ধির উদ্দেশেই লিখছি আমার দুঃখে আর ইন্ধন যোগাবেন না। আপনার ভালোবাসার জন্যেই আমার স্বামীর সন্দেহ জেগে উঠেছে, দিন দিন বাড়ছে দুর্ব্যবহার। কিন্তু আমি যে তাকে মেনে নিয়েছি চিরদিনের জন্যেই। আমার জীবনের এই অগ্নিপরীক্ষা! দয়া করে আপনি এখানে আসবেন না আর। যে ভালোবাসা আপনাকে অসুখী করে তুলেছে—এবং আমাকেও, সেই ভালোবাসাকে লক্ষ্য করেই প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনার কাছে।'

সরলপ্রাণ সতীসুন্দরী ভাবতেই পারেনি তার চিঠির ফলটা হবে কি-রকম। সতীত্ব প্রণোদিত হলেও চিঠিটা কেমন ব্যথাভরা, কেমন করুণ। কাজেই ফল হবে যে উল্টো, মেয়েটি তা বুঝতেই পারেনি। ছেলেটির বুকে দ্বিগুণ বেগে জ্বলে উঠল কামনার আগুন। তার প্রণয়ীকে একটিবার

প্রাণভরে দেখবার চেষ্টায় যদি তার মৃত্যু হয় সেও ভালো। ক্যাপিটো ছিলেন অতি ধূর্ত, সবদিকেই ছিল তার কড়া নজর। তাই তিনি রেখেছেন পাকা গোয়েন্দা। একদিন তিনি জানতে পেলেন—রাইবলডজ ফকির সেজে তাঁর স্ত্রীর কাছে আসছে অনুগ্রহলাভের আশায়। ক্যাপিটো ভাবল—এবার উপায়? সাধুর পাল্লা যে সৎস্বামীর পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক!

চাকরদের তিনি নিযুক্ত করলেন রাইবলডজকে মেরে তাড়িয়ে দেবার জন্যে। যুবকটি বাড়িতে ঢুকতেই তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে অভ্যর্থনা জানাল সবাই! বেচারা চিৎকার করছিল শুধু—'সাধু-ফকিরদের উপরে কেন এই অত্যাচার?' কিন্তু—কে শোনে কার কথা? সে এমন মারই খেল যে মাথার একটা আঘাতের চোটে মারা গেল দিন সাতেক পরেই। শহরের সমস্ত মেয়েরাই তার জন্যে চোখের জল ফেলল। সতীসুন্দরী কিছুতেই তার মন শান্ত রাখতে পারল না। এমনকি কুপিটোও দুঃখিত হল,—সে অবশ্যি অন্য কারণে! এই সূত্রেই সে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ল।

বিচারক এসিন্দিনাসের আত্মীয় হ'ল রাইবলডজ। তাই তিনি স্থির করলেন, এবারে এমন বিচার করবেন যে দেশশুদ্ধ লোক একেবারে থ হ'য়ে যাবে। সমস্ত দেশেই কুপিটোর মতো ধূর্ত উকীল আর নেই, তাঁর সংগে এই বিচারকের ঝগড়াও হয়েছে আগে। এবার তাকে হাতে পেয়েছেন, ধরে ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে পারলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

কাজেই, সতীসুন্দরী চোখের সামনেই নিহত হ'ল তার প্রণয়ী, স্বামীও এখন ঝুলতে যাচ্ছে ফাঁসিকাষ্ঠে। অপরাধ? অপরাধ তার সতীত্ব! যদি সে বুদ্ধি খাটিয়ে রাইবলডজের দিকে সহজভাবেই সুনজর রাখত, তবে বুদ্ধিমানের মতোই ফাঁকি দেওয়া চলত স্বামীকে।

এইভাবেই ফলে গেল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম দিকটা। সতীসুন্দরীর ভয়ানক ভাবনা হ'ল—শেষের দিকটাও তবে সত্য হতে যাচ্ছে! ভেবে ভেবে সে স্থির বুঝল—নিয়তির লিখন না যায় খণ্ডন! তাই নিজেকে সে ছেড়ে দিল বিধাতার হাতে, এবং বিচিত্র উপায়ে পেঁাছল এসে যশের রাজ্যে।

বিচারকটি ছিলেন লোভী ও কামুক—ভ্রষ্ট-চরিত্র! আইনের ধার ধারতেন না তিনি মোটেই, বদমেজাজী ভয়ঙ্কর লোক। সুতরাং হিপ্পোর

প্রায় নারীই তার সঙ্গে কিছু-না-কিছু সম্বন্ধ রাখত,—নিজেদের অমংগলের আশঙ্কায় !

বিচারকটি ডেকে পাঠালেন সতীসুন্দরীকে। সে এসে উপস্থিত হ'ল ছলোছলো চোখে। কাজেই, দেখতে হ'ল আরো সুন্দর !

'আপনার স্বামীর ফাঁসি হতে যাচ্ছে, কিন্তু—আপনি ইচ্ছে করলে তাঁকে বাঁচাতে পারেন।'

'সেজন্যে আমি প্রাণ দিতেও রাজি—'

'কিন্তু প্রাণ চাইনে আমি—'

'কি করতে হবে আমাকে ?'

'আপনার একটি রাত চাই আমি—'

'কিন্তু সে তো আমার নয়, আমার রাত আমার স্বামীর। আমি শির দিতে পারি, কিন্তু সম্মান দিতে পারি না।'

'ধরুন, আপনার স্বামীই যদি রাজি হন ?'

'তিনিই মালিক,—নিজের জিনিষ তিনি যেমন খুশি ব্যবহার করতে দিতে পারেন। কিন্তু আমার স্বামীকে জানি আমি, কখনো তিনি রাজি হবেন না—বরং ফাঁসি যাবেন, তবু আমার গায়ে কেউ হাত দেবে তা তিনি সহ্য করবেন না।'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে !'—রেগে উঠলেন বিচারক।

আসামীকে তক্ষুনি নিয়ে আসা হ'ল তাঁর সামনে। ফাঁসিকাণ্ঠে ঝুলতে চান তিনি ? না, ভ্রষ্টার স্বামী হতে চান ? দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আর কোনোই তেমন স্থান নেই।

বুড়ো অবশ্য গররাজি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ অবস্থায় সবারি যা হয়, তাই হ'ল। স্ত্রী নিজগুণে বাঁচাল তার স্বামীকে। এই প্রথমবার।

ঠিক সেইদিনই সতীসুন্দরীর ছেলের অসুখ হ'ল মারাত্মক। হিপ্পোর কোনো ডাক্তারেরই সাধ্য নেই তাকে সারায়। একটিমাত্র ডাক্তার আছেন—যিনি তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন, এবং তিনি থাকেন আকিলাতে—হিপ্পো থেকে কয়েকমাইল দূরে। সেই সময়কার প্রথা ছিল : কোনো ডাক্তার নিজের শহর-এলাকার বাইরে ব্যবসা করতে পারবেন না। অন্য উপায় না দেখে সতীসুন্দরী নিজেই চলল সেই শহরে, সঙ্গে আদরের ভাইটি।

পথে ধরল দস্যুতে। দস্যুসর্দারের চোখে সতীসুন্দরীকে ভারী সুন্দর

লাগল। দস্যুরা তার ভাইকে খুন করতে উদ্যত হ'ল। সতীসুন্দরীর কাছে এসে সর্দার বলল, সে যদি একটু অনুগ্রহ করে তো রক্ষা পেতে পারে তার ভাইয়ের প্রাণ। একটুখানি অনুগ্রহ মাত্র! রাজি হ'লে এইমাত্রই। যে স্বামীকে সে ভালোবাসতে পারেনি তাঁর জীবনই রক্ষা করে এসেছে। আর এখন, তার প্রাণের ভাইকে হারাবে! শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে? বিশেষ করে তার ছেলের অবস্থাও যে গুরুতর। একটি মুহূর্তও আর দেরী করা উচিত নয়। নিজেকে সে ভগবানের হাতে সমর্পণ করে দিল: তার কর্তব্য সে সমাপন করল। এই দ্বিতীয়বার।

সেদিনই সে পেঁছিল এসে আকিলার ডাক্তারের কাছে। এই ডাক্তারটি ছিলেন প্রেমিক এক ফুলবাবু। একটু সর্দি হলেও তাকে দিয়ে মেয়েদের বুক পরীক্ষা না করালে চলত না,—তার অর্থ যখন কোনো অসুখই থাকত না আর কি! শহরের অনেকেরি তিনি বিশ্বস্ত বন্ধু,— অনেকেরি প্রণয়ী, ভদ্র বিনয়ী এবং দরদী মানুষ! ডাক্তার-সংঘের সভাপতি তিনি; তবে—তাকে নিয়ে লোকে হাসিঠাট্টাও করত খুব। সতীসুন্দরী তার ছেলের অসুখের কথা ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলল ও তার হাতে দিল একখানা হাজার টাকার নোট।

'কিন্তু দেখুন,'—ডাক্তার সাহসভরে বলতে লাগলেন—'আমার পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থই কাম্য নয় আমার। আমি নিজেই আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি ঢেলে দিতে পারি আপনার পায়ে—আপনি নিজেই যদি একটা আরোগ্যের ব্যবস্থা করেন। আপনাকে দেখে আমার যে এই উম্মত্ততা তাই সারিয়ে দিন, আমিও আপনার ছেলের অসুখ সারিয়ে দিচ্ছি।'

এমন দাবী একটু বাড়াবাড়ি বৈ কি! কিন্তু নিয়তি তাকে ঠেলে পাঠিয়েছে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে। ডাক্তারটিও একজেদী লোক,—তাঁর প্রার্থিত ধন ছাড়া আর কিছুই নেবেন না তিনি।

সতীসুন্দরীর স্বামীও এখন কাছে নেই যে তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করে নেবে; কিন্তু কেমন করেই বা সে তার ছেলেকে—তার বুকের মানিককে ঠেলে পাঠাবে মরণের মুখে,—নিজে একটুখানি সাহায্যও এগিয়ে দেবে না! আদর্শ ভগ্নীর মতো, আদর্শ জননীও সে! নির্ধারিত দাবীর মূল্যে পেল সে তার ছেলের রোগমুক্তি। এই শেষবার।

ভাইকে নিয়ে এল সে হিপ্পোতে। সমস্ত পথেই ভাইটি তার দিদির

অপূর্ব সাহসের প্রশংসা করছিল। আর, এই দিদিই তো তার রক্ষকর্ত্রী ···

সতীসুন্দরী একদিন বেশী সাধ্বী হতে যাওয়ার ফলেই ডেকে এনেছিল তার প্রণয়ীর মৃত্যু, স্বামীকেও হারাতে যাচ্ছিল প্রায়। কিন্তু বিনীত হয়েই বাঁচিয়েছে তার ভাইর ও ছেলের প্রাণ ! এই নারী আফ্রিকার সমাজে পেল অসীম শ্রদ্ধা ও সম্মান। মৃত্যুর পরে তাকে মহিমান্বিতা করা হ'ল সতী-সাধ্বীরূপে ; কারণ, দেহনির্যাতনের মধ্য দিয়ে সে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেছে তার প্রিয় পরিবারের মধ্যে। সবাই মিলে তার স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তুলে সেখানে খোদাই করে রাখল এই কথাটি—

* মহান মঙ্গলের উদ্দেশে ছোট্ট-একটু অন্যায়' *

॥ উত্তরদেশের মেয়ে ॥

আল-তাই পর্বতশ্রেণীতে সমস্ত রাত ধরে চলেছে বজ্রঝঞ্ঝার সে কী গর্জন। এখনো ভোরের ভারী আকাশ দেখাচ্ছে ফ্যাকাশে ভয়ঙ্কর। পর্বতশ্রেণীর ঠিক মাথার উপর দিয়ে কালো কালো মেঘগুলি এগিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

সবুজ রঙের একটা গঙ্গাফড়িং বাজ-পড়ার শব্দে ভয় খেয়ে আশ্রয় নিয়েছে মশারির ফিতের উপর। এক-ডেলা রঙের মতোই জানালার কাঁচের উপর লেগে আছে বুনো পিয়োনি পোকা। শুনতে পাচ্ছিলাম কাছাকাছি একটা গিরিসঙ্কটের মধ্যে দ্রুত-ধাবন্ত জলরাশির একটানা আওয়াজ।

আমার সঙ্গী ক্যাপটেন রুদনেভ ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথাটা তুললেন, কনুয়ের উপর ভর করে উঠে বসলেন হাসপাতালের খাটিয়ার উপরে। কেমন বিষণ্ণভাবে তিনি তাকিয়ে রইলেন মশারির ফিতের উপরকার গঙ্গাফড়িংটার দিকে, তারপর বলতে লাগলেন,—'হ্যাঁ, এই মশারির ফিতেটা দেখে মনে পড়ছে উত্তরদেশের লোকেরা ঘরে ঘরে যে ফিতে বুনোয় সেইকথা। আর হয়ত-বা এই ফিতেটাই তৈরী হয়েছে নাস্তিয়ার মতো কোনো মেয়ের আঙুলে!'

—স্মৃতিভরে একটুখানি বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। আমি উৎসুক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'সে হয়েছিল আমাদেরই কামান-বিভাগে, লেলিনগ্রাদের কাছে।' —বললেন তিনি এবং তারপর আমাকে একটি গল্প শোনালেন। এবারে আমি তা বর্ণনা করতে চাই আপনাদের সবার কাছে,—যাঁরা রয়েছেন এই রুশিয়া থেকে শত-শত হয়ত বা হাজার-হাজার মাইল মাটি বা সমুদ্রের ব্যবধানে।

উনিশ শ' একচল্লিশের বসন্তের প্রথমে বলশভ নামে লেলিনগ্রাদের এক শিল্পী রওনা হ'ল উত্তরদেশের দিকে। সেখানে শিকারও চলবে, ছবি আঁকাও হবে।

পুরনো একটা স্টিমারে যেতে যেতে প্রথম যে জায়গাটার দৃশ্য চোখে ভালো লাগল—সেখানেই নেমে পড়ল সে, ভাড়া নিল সেই গাঁয়ের এক শিক্ষকের বাড়ীর একটা কোঠা। সেই গাঁয়েই ছিল নাস্তিয়া—সেখানকার

বনরক্ষীর মেয়ে। ফিতের কাজে তার হাত বড় নিখুঁত, আর রূপের জন্যেও এ অঞ্চলে যথেষ্ট সুনাম। মিশ্‌-কালো তার বড় বড় চোখ, কথা বলে খুবি কম,—ঠিক উত্তরদেশেরই মেয়ে!

একদিন বনে শিকার করবার সময় তার বাবার বন্দুকের গুলি হঠাৎ গিয়ে বিঁধে গেল বলশভের বুকে। শিক্ষকের বাড়ীর সেই কোঠাটিতে আনা হ'ল তাকে। বনরক্ষী একেবারে মুষড়ে পড়ল ভয়ে আর ভাবনায়। সে তার মেয়েকে বলে দিল বলশভকে সেবা করতে। নাস্তিয়াও তার যত্ন নিতে লাগল প্রাণ দিয়ে। এবং মেয়েদের যেমনটা প্রায়ই হয়ে থাকে,—রোগীর প্রতি করুণা দিনে দিনে ভরে উঠল ভালোবাসায়। তার জীবনে এই প্রথম ভালোবাসা, এবং সত্যিকার ভালোবাসা! কিন্তু মেয়েটি ছিল খুবি চাপা স্বভাবের, আর লাজুক। কাজেই বলশভ তার ভীরু বুকের প্রণয়ের কথাটা জানতেই পেল না।

লেনিনগ্রাদে বলশভের স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু তার কোনো প্রসঙ্গ কখনোই সে তোলেনি, এমন কি নাস্তিয়ার কাছেও নয়। গ্রামের সবাইও ভেবেছে, বলশভ এখনো বিয়েই করেনি।

বলশভের ক্ষত সেরেছে, আজি রওনা হবে লেনিনগ্রাদে। বিদায়-দিনের সন্ধ্যাবেলা সে নাস্তিয়ার প্রাণঢালা সেবার কথা মনে করে ধন্যবাদ জানাতে নিজেই এসে উপস্থিত হ'ল তার ঘরে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তার দুটি হাতে কিছু উপহারও এনে দিল। মেয়েটিও দুটি হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করল সেই উপহার।

এখন, উত্তরদেশে বলশভ এই নতুন এসেছে, স্থানীয় রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সে কিছুই জানে না। এখানকার একটা দেশাচার হচ্ছে : যদি কোনো পুরুষ অযাচিত ভাবে কোনো মেয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়, এবং কিছু উপহার দেয়,—তবে তার অর্থ হবে সে তাকে বিয়ে করতে চায়। আর, মেয়েটি যদি সেই উপহার গ্রহণ করে,—তবে সে তার বৌ হ'তে রাজি হয়েছে। উত্তর-অঞ্চলের প্রণয়ের ভাষা এমনিই।

মেয়েটির চোখ দুটি ছলছল করে উঠল আনন্দে। তবে তো স্বপ্ন তার সত্যিই! ভীরু লাজে সে বলশভকে জিজ্ঞাস করে, কবে সে লেনিনগ্রাদ থেকে ফিরবে।

বলশভও তামাসা করে জবাব দেয়,—খুব শিগগির ফিরে আসছে!

বলশভ চলে গেল। মেয়েটির এবারে শুরু হ'ল—দিনের পর দিন

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পালা। নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল মধুর বসন্ত, শুরু হ'ল সুদীর্ঘ শীতের বিষণ্ণ দিন রাত্রি। কিন্তু বলশভ আর ফিরে এল না। নাস্তিয়ার এমন হাসিখুশি, এমন আকুলতা, এমন একাগ্র প্রতীক্ষা দিনে দিনে ডুবে গেল নিরাশার অন্ধকারে। এবারে দুর্ভাবনা বিষণ্ণতা, আর কেমন একটা অপমানের অনুভূতি ছেয়ে ফেলল তার সারাটা প্রাণ। পাড়ায় পাড়ায় শুরু হল জোর কানাঘুষা : মেয়েটাকে প্রতারণা করে গেছে। নাস্তিয়ার মন কিন্তু একটুও টলেনি। তার স্থির বিশ্বাস,— বলশভের নিশ্চিতই কোনো বিপদ হয়ে থাকবে।

আবার ফিরে এল বসন্ত। নাস্তিয়ার বুকে নতুন করে জেগে উঠল বিরহ-যন্ত্রণা। বিলম্বিত সুদীর্ঘ বসন্ত! উদ্বেল হয়ে উঠেছে বসন্তের বরফ-গলা বন্যাস্রোত, বরাবরের চেয়ে এবারে আরো বেশী, নদীগুলি যেন তীরের মধ্যে ফিরে যেতে একেবারেই নারাজ। বৈশাখের শুরুতে সবেমাত্র গাঁয়ের পাশ দিয়ে আবার চলতে শুরু করল প্রথম ষ্টিমারটি।

নাস্তিয়াও এদিকে তার মন স্থির করে বসেছে। বাবাকে না জানিয়েই সে লেনিনগ্রাদ চলে যাবে, খুঁজে নেবে বলশভকে। তারপর, একরাতে ঘর ছেড়ে চলে গেল নাস্তিয়া! পনেরো দিন হেঁটে হেঁটে কাছাকাছি রেল ষ্টেশনটিতে পেঁছেই শুনতে পেল—সেদিন ভোরেই শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ!

মেয়েটি খুবি বিমর্ষ হয়ে পড়ল। জীবনে যে আর কখনো রেলগাড়ী দেখেনি সে-ই আজ এগিয়ে চলল রেলগাড়ীতে চ'ড়ে গ্রাম-গ্রামান্তরের মধ্য দিয়ে। পথের চারদিক তখন সিংহবিক্রমে রুখে দাঁড়িয়েছে আক্রমণকারী দস্যুর বিরুদ্ধে।

লেনিনগ্রাদ পেঁছে নাস্তিয়া খুঁজে পেল বলশভের ফ্ল্যাটবাড়ীটা। বলশভের স্ত্রীই এসে খুলে দিল দরজা। পাউডার-মাখা মুখ, লালরঙের খাটো চুল, পায়জামা পরা, ঠোঁট থেকে ঝুলছে একটা সিগ্রেট। অভদ্র সন্দেহের চোখে সে নজর করে দেখছিল এই নতুন মেয়েটাকে। না, বলশভ বাড়ী নেই। যুদ্ধের ডাক এসেছে, লেনিনগ্রাদের সামনেই কোথাও আছে ফ্রন্টলাইনে। তার কণ্ঠস্বরে ও দুচোখে যেন তীক্ষ্ম বিদ্রূপ ও কঠিন ঘৃণা। তা হলে, এই সুন্দরী কিষাণ-মেয়েটাই কিনা তার ও তার স্বামীর মাঝখানে খাড়া করে রেখেছে ব্যবধানের পাঁচিল।

আজ নাস্তিয়া প্রথম বুঝতে পারল, বলশভ বিবাহিত। তা হ'লে,

নাস্তিয়াকে সে প্রতারণা করেছে, উপহাস করেছে তার ভালোবাসাকে ! গালে রঙমাখা ফ্যাশানদস্তুর এই মহিলাটির নানা প্রশ্নের জবাবে সে একটা কথাও খুঁজে পেল না। শোকের আঘাতে দিশেহারার মতোই সে যেন ছুটে পালিয়ে গেল। আলোকোজ্জ্বল সেই বিরাট শহরের বিচিত্র পথে সে হেঁটেই চলেছে একা। চারদিকেই আসন্ন যুদ্ধের প্রবল উত্তেজনা, কিন্তু সেদিকে একটুও লক্ষ্য নেই তার।

শহরের স্কোয়ারে পার্কে উদ্যত হয়ে আছে যে বিমান-বিধ্বংসী কামান, দাঁড়িয়ে রয়েছে যে বালিবস্তা-রক্ষিত মনুমেন্ট, শহরের চারদিক জুড়ে শোভা পাচ্ছে যে বাগবাগিচা আর গর্বোন্নত অনিন্দ্য প্রাসাদশ্রেণী—তাদের কিছুই তার চোখে পড়ল না !

নেভার কোলে এসে দাঁড়াল সে। লালচে পাথরে-বাঁধানো প্রাচীরের মধ্য দিয়ে কালোজল দ্রুত প্রবাহে ছুটে চলেছে সাগরের দিকে। এখানে এই শীতল কালোজলই জুড়িয়ে দেবে তার পোড়া-প্রাণের সমস্ত জ্বালা ! সে গা থেকে শালটা খুলে নিল—তার মায়ের দেওয়া শাল। সযত্নে পাঁচিলের উপর ভাঁজ করে রাখল। ভারী দুগোছা চুল সামনে থেকে পিছনের দিকে সরিয়ে নিল : তারপর পাঁচিলের রেলিংয়ের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল একটি পা !

আচমকা কে যেন এসে তার হাত ধরে ফেলল। নাস্তিয়া অমনি মাথা ঘুরিয়ে দেখে। পেছনেই দাঁড়িয়ে একজন লোক, হলদে ডোরা-কাটা একটা পায়জামা পরা, হাতে মেঝে সাফ করার ব্রাস। ভর্ৎসনা ভরে সে মাথা নাড়ছিল,—'বোকা মেয়ে ! সময়টা বেছে নিতে একটু ভুল করেছ !'

সে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এল, রাখল স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে। তার স্ত্রী ছিল বেশ রাশভারী স্ত্রীলোক, মনের জোর ছিল অসাধারণ। নাস্তিয়ার কিন্তু দেহ মন দু-ই ভেঙ্গে পড়ে এবার, ভয়ানক অসুখে পড়ে। আমাদের এই ত্রাফিমভ স্বামী-স্ত্রী মিলে সেবা করতে লাগল নাস্তিয়াকে। আর, এখানে এই ত্রাফিমভের স্ত্রীর কাছ থেকেই সে প্রথম জানতে পেল—বলশভের কোনোই অপরাধ নেই ! উত্তর-অঞ্চলে নতুন এসেই একটা লোক যে সেখানকার রীতিনীতি সব জেনে ফেলবে,—মোটেই তা আশা করা যায় না। তা ছাড়া, দেখামাত্রই প্রেমে পড়তে পারে নাস্তিয়ার মতো গাঁয়ের এমন সরল মেয়েরাই !

গ্রাভিমভের স্ত্রী এমনি করেই মেয়েটিকে একটুও বাধা না দিয়ে কথা বলতে লাগল। নাস্তিয়ার বুক আবার ভরে উঠল আনন্দে, আনন্দে—যেহেতু তার বলশভ তাকে প্রতারণা করেনি, এবং হয়তো সে আবার তাকে কাছে পাবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রাফিমভেরো ডাক এল যুদ্ধের, তার স্ত্রীর সঙ্গে রইল শুধুই নাস্তিয়া।

নাস্তিয়ার শরীর বেশ ভালো হয়ে উঠেছে। গ্রাফিমভের স্ত্রী এবার তাকে আহতদের সেবা-শিক্ষালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিল। সেখানে পড়াশুনোয় তার তীক্ষ্নতা, অস্ত্রক্ষত বাঁধাবার কাজে দক্ষতা ও হাতের দ্রুত কাজকর্ম দেখে শিক্ষকেরা তো খুবি খুশি। 'কিন্তু—আমি তো আমি তো আঙুলের কাজই করে আসছি বরাবর, আমি যে ফিতেই বুনতাম!'—তার কাজের প্রশংসা করলেই বলে নাস্তিয়া।

সমানে চলেছে লেলিনগ্রাদের শীত—তার তুষার-মুষ্টির মধ্যে জমাট বেঁধে আছে অফুরন্ত অগণিত রাত্রি। তারি মধ্যে চলেছে অবিশ্রান্ত কামান-গর্জন, তারি মধ্যে শহররক্ষী বীর সন্তানদের ধৈর্য ও চূড়ান্ত বিজয়ের সে কী নিশ্চিন্ত বিশ্বাস! নাস্তিয়ার শিক্ষাকাল শেষ হ'ল, এখন সে আছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডাক আসার প্রতীক্ষায়। রাতে যে কতবার চোখের জলে তার বালিশ ভিজে গেছে বলশভকে ভেবে ভেবে, আর তার বাবাকে ভেবে! মরবার সময় পর্যন্ত বুড়ো কখনো জানতেই পাবে না—গভীর রাতে মেয়েটা চলে গেল কেন?

বসন্ত এলে নস্তিয়াকে পাঠানো হ'ল লেনিনগ্রাদের কাছে ফ্রন্টলাইনে। শহরের চারদিকের ধ্বংসীভূত বাগানে, পাহাড়ের গুহায় গুহায়, কামান-বাহিনীতে, বনে-প্রান্তরে, পরিখায়, ভস্মীভূত গ্রামে গ্রামে—যেখানেই সে গেছে তার মুখে শুধু একটি কথা: সৈনিকদের কেউ কি বলশভকে চেনে?

যুদ্ধ-বিরতির একফাঁকে ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একদিন গ্রাফিমভের সংগে দেখা। এদিকে সেই বাচাল বুড়ো করেছে কি, তার সঙ্গীদের কাছে বলে ফিরেছে—উত্তরদেশের এই মেয়েটির গল্প, প্রিয়তমের সন্ধানে তার প্রণয়-অভিযান—তার জীবনের এই নতুন 'ওডিসি' কাব্য।

যোদ্ধাদের মন স্বভাবতই কল্পনা-উন্মুখ, দুর্লভের জন্যে তাদের প্রাণে রয়েছে তীব্র আকর্ষণ, প্রেমের একাগ্রতাকে দেখে তারা গভীর শ্রদ্ধার

চোখে। তাই, এই মেয়েটির কাহিনীই নিবিড় ও গভীর ভাবে আলোড়িত করে তুলল তাদের মনপ্রাণ ; ফুলের সৌরভের মতোই তা ছড়িয়ে পড়ল —একদল থেকে আর একদলে, এমনকি সেনাবিভাগের পিছন-প্রান্তে পর্যন্ত। সংবাদ-বাহক, অশ্বারোহী, মালগাড়ীর গাড়োয়ান, সেবাসঙ্ঘের লোক, সঙ্কেতদার (সিগনালম্যান)—সকলেই বুকে করে ফিরছে নাস্তিয়ার কাহিনী! প্রত্যেকটি সৈনিকই ঈর্ষা করতে লাগল এই ভাগ্যবান প্রেমিকটিকে, আর ভাবতে লাগল আপন আপন প্রিয়জনের কথা। মেয়েটি ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠল একটি মধুর উপাখ্যানের মতো! এবং সকলেই নিজেদের মনের মতো করে গড়ে তুলল তার প্রতিকৃতি—কোথাও অদলবদল ক'রে, কোথাও বা নতুন-কিছু যোগ ক'রে। শেষ পর্যন্ত তাকে তারা রূপান্তরিত করে নিল একেবারে নিজেদের অঞ্চলের মেয়েতে।

য়ুক্রেনের লোক হলফ করে বলতে পারে—সে তার দেশের মাটির, সিবিরিয়ার লোক বলে সে উরালেরই মেয়ে, এমন কি বাদাম-চোখা কাজাখদের পর্যন্ত নিশ্চিত বিশ্বাস—এমন ভালোবাসা জন্মাতে পারে রৌদ্রোজ্জ্বল সেই সুন্দর কাজাখস্তানের প্রান্তরেই শুধু! কাহিনীটি তীরস্থ কামানবিভাগেও এসে পৌঁছতে দেরী হ'ল না। সেখানেই কাজ করে বলশভ। এই অচেনা মেয়েটির অটল ভালোবাসার কথা শুনে আর সবারি মতো তার বুকেও জেগে উঠেছে একটি মধুর অনুভূতি।

এই মেয়েটির কথা অনেক সময়েই ভাবত সে, আর ওর প্রণয়ীর সৌভাগ্যের কথা মনে করে সময় সময় যেন ঈর্ষাই হ'ত। কী করে জানবে—নিজেকেই ঈর্ষা করছে সে!

তার বিবাহিত জীবন একটা বিরাট শূন্যতা, তার বিয়ে একটা করুণ ব্যর্থতা। কতদিন কতবার সে ঠিক এমনি ভালোবাসা—এমনি সত্যিকার ভালোবাসার স্বপ্ন দেখেছে। এখন আর সে সময় নেই, ধূসর হয়ে উঠেছে চুল। তাছাড়া, কেই বা বলতে পারে যুদ্ধ থেকে সে আর ফিরবে কিনা!

শেষ পর্যন্ত নাস্তিয়া খুঁজে পেল বলশভের সেনাবিভাগ—কিন্তু এসে গেছে দুটো দিন দেরীতেই! যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে বলশভ, ঘুমিয়ে আছে সাগরতীরের কাছেই এক পাইনবনে কবরের তলায়!

—রুদনেভ এখানে এসে থামলেন, চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

'তারপর কি হ'ল?' জানতে চাইলাম।

'তার পর?'—রুদনেভ আবার বলতে লাগলেন,—'বলশভের দলের

সবাই যুদ্ধ করতে লাগল সিংহ-বিক্রমে। আমাদের কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হয়ে গেল জার্মান-ব্যূহ। ক্রোধে আর ঘৃণায় আমাদের অবস্থা তখন উন্মাদের মতো। জার্মানদের সমস্ত পাশবিকতার প্রতিদানে—দেশের ভাইবোনদের অকারণ যত দুঃখ-দুর্দশার জবাবে—প্রত্যেকটি ক্ষয়ক্ষতির দাম তারা পাল্টা আদায় করতে লাগল নির্মম হাতে……'

'আর মেয়েটি?'

'নাস্তিয়া তার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে আহতদের সেবা করছে। আমাদের ফ্রণ্টে তার মতো সেবিকা আর নাই!'

রুদনেভ নীরব হয়ে রইলেন। সরে সরে যাচ্ছে ঝড়ের কালো মেঘেরা, আর এক-একবার ফুটে বেরুচ্ছে নীলের টুকরো! গঙ্গাফড়িংটা আবার যেন নতুন জীবন পেয়ে সুড়সুড় চলতে শুরু করল মশারির উপর দিয়ে, এবং বুনো পিয়ানিটার কাছে এক-এক লাফে এগিয়ে এসেই হঠাৎ উধাও হয়ে গেল।

'ছোট্ট পোকাটি বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিল।'—বললাম।

রুদনেভ বললেন—'আমিও এরমধ্যে তোমাকে একটা করুণ কাহিনী বলে ফেললাম।'

রুদনেভ আবার তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। সামনেই পাহাড়ের পর পাহাড়ের মালা, চূড়ায় চূড়ায় উজ্জ্বল তুষার-মুকুট। ঊর্ধ্বে বিরাট থালার মতো সূর্য, দ্রুত-ধাবন্ত মেঘের কিনারে কিনারে দীপ্ত কিরণ ঝলসে উঠছে বারম্বার,—আকাশের নীল-নীল টুকরোগুলি ঝলমল করছে চমৎকার নীলকান্তমণির মতো!

জানলার বাইরে প্রকৃতির উজ্জ্বল রূপ, যেন জেগে উঠেছে নব-জীবনে। আমাদের কানে বেজে উঠছে গঙ্গাফড়িংয়ের তীক্ষ্ণ-মধুর পাখীদের কাকলি আরকলরোল, ঝর্ণাঝোরার কলধ্বনি!

'ঐ পর্বতশ্রেণীর ওপারেই ভারতবর্ষ, না?'—রুদনেভ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন।

আমি সায় দিলাম।

তিনি নীরবে শুধু তাকিয়ে রইলেন, তারপর জানলার বাইরের দিকটা দেখিয়ে বললেন,—'বিজয়ের পরে জীবন হবে ঠিক আজকের দিনটির মতোই সুন্দর!'

প্রেমোন্মাদনা

'ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি,
    কেবল দেখিবি মোরে—
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি
    চাহিয়া দেখিছে তোরে।
নিশীথে বসিয়া থেকে থেকে তুই
    শুনিবি আঁধার ঘোরে,
কোথা হ'তে এক ঘোর উন্মাদ
    ডাকে তোর নাম ধ'রে।'

॥ একগোছা চুল ॥

গারদখানা। চারদিকে চুনকাম করা শূন্য বধির প্রাচীর। উঁচুতে একটিমাত্র জানলা, লোহার জাল-আঁটা। সেই পথে আলো এসে পড়ছে ঘরটার মধ্যে। পাগলটি চেয়ারে বসে আছে, আমাদের দিকে তীক্ষ্ণ এক শূন্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। খুব রোগা, বসে গেছে গাল দুটো, প্রায় সব চুলই সাদা! দেখে মনে হয়, এমনটা হয়ে পড়েছে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই। শুকনো বুক, হাত পা সরু সরু। দেহটির উপরে পোশাকটা দেখাচ্ছে বড্ড বেমানান। লোকটা যেন ধ্বসে পড়েছে, নিরন্তর ক্ষয়ে যাচ্ছে বিষম দুশ্চিন্তার ভারে—দুঃসহ চাপে। এক একটা ফলকে যেমন পোকায় দিনে দিনে একেবারেই ঝরঝরে করে ফেলে! লোকটার উন্মত্ততা, অদ্ভুত দুশ্চিন্তা—তা তো ঐ মাথাটির মধ্যেই! কী ব্যতিব্যস্ত কী বিভ্রান্ত কী জবরদস্ত সেই সর্বগ্রাসী চিন্তা যা তাকে ধীরে ধীরে তা ক্ষয়ে ক্ষয়ে আনছে। ইন্দ্রিয়াতীত এক অদৃশ্য অস্বচ্ছ অবাস্তব চিন্তা শুষে খাচ্ছে তার দেহের মাংস, চুষে নিচ্ছে রক্ত, গ্রাস করছে জীবনী-শক্তি!

দুশ্চিন্তার ভারে ক্ষয়িষ্ণু এই লোকটি যেন এক অদ্ভুত রহস্য। এই অমানুষিক দৃশ্যের দিকে তাকালে ব্যথা জেগে ওঠে, লাগে ভয়! দুঃস্থ এক দুঃস্বপ্ন—ভয়ঙ্কর মারাত্মক একটা ভাবনা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, কপালের উপর ফেলেছে অস্থির ছায়ারেখা।

ডাক্তারবাবু বললেন—'লোকটা মাঝে মাঝে একেবারেই ক্ষেপে ওঠে! এমন বিশিষ্ট ধরণের উন্মাদ আমার হাতে পড়েনি আর······বিচিত্র এক প্রেম-পাগল!

'লোকটির লেখা একটা ডায়েরী আছে, সেখানে স্পষ্ট ভাষায় এবং নিখুঁত ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে তার উন্মত্ত মনের বিশৃঙ্খলা। এই পাগলামি হ'ল স্বচ্ছ এক পাগলামি। আগ্রহ হ'লে পড়ে দেখতে পারেন।'

ডাক্তারের সঙ্গে অফিস ঘরে এলাম, বেচারার ডায়েরীটি আমার হাতে দিয়ে তিনি বললেন—'পড়ুন আগে, তারপর বলবেন আপনার মতামত।'

পড়তে লাগলাম:

বত্রিশ বছর পর্যন্ত বেশ শান্তিতেই কাটছিল আমার জীবন, ভালোবাসার কোনো ঝামেলা বা কোনো যন্ত্রণা ছিল না সেই জীবনে। আমার

কাছে জীবনটা ছিল সহজ সরল—খুবি সহজ সরল। ধনদৌলত যথেষ্টই, কিন্তু আমার ঝোঁক ছিল এত বিভিন্নমুখী যে কোনোকিছুর জন্যেই একেবারে পাগল হয়ে উঠতাম না। এমন করে বেঁচে থাকাটা সত্যিই এত সুন্দর! রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে খুশিমতো কাটিয়ে দিতাম সারাটা দিন। রাতের বেলায় শুতে যেতাম একটি প্রশান্ত তৃপ্তি নিয়ে; সামনের দিনটি জেগে থাকত মধুর আশার মতো,—যেন সে চিন্তা-ভাবনাহীন মধুর একটি ভবিষ্যৎ। প্রেমের ঘটনা কিছু কিছু এসেছিল আমার জীবনে, কিন্তু কোনোদিনই জানিনি কাকে বলে 'প্রণয়ে পাগল হওয়া' অথবা 'পিরীতে প্রাণ যায়-যায় দশা'। একান্ত আপন করে পাওয়ার উন্মাদনাটা যে কী—বুঝিইনি কখনো। এভাবে বাঁচা সত্যিই বেশ চমৎকার। ভালোবাসা অবশ্যি আরো সুন্দর, কিন্তু আরো সাংঘাতিক। কাজেই, সচরাচর যারা ভালোবাসে তারা সম্ভবত আমার মতো এমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে না। কারণ, আমার জীবনে ভালোবাসা এসেছে অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য অবস্থার মধ্য দিয়ে!

আগেই বলেছি ধনী ছিলাম,—সংগ্রাহকের কাজ পেলাম সহজেই। প্রাচীন কালের দুর্লভ আসবাব বা তেমন কোনো জিনিষপত্র সংগ্রহ করে রাখাই ছিল আমার কাজ। প্রায়ই বসে বসে ভাবতাম—কত যে অজানা হাতের স্পর্শ লেগে আছে এদের গায়ে গায়ে, এখানে পড়েছে কত বিস্মিত ও বিমুগ্ধ চোখের দৃষ্টি; এদের ভালোবেসেছে কত কোমল সুন্দর প্রাণ! কেন না, আসবাবপত্র কে না ভালোবাসে! অনেক সময়ই অবাক বিস্ময়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম—বিগত শতাব্দীর ছোট্ট একটি ঘড়ি। ঝকঝকে এনামেল আর ঝিকমিকে সোনায় গড়া। এত সুন্দর—ঠিক যেন ছোট্ট একটি চুমো! কবে কোনদিন এক নারী এই অপূর্ব ঘড়িটিকে কিনেছিল অধীর আগ্রহে,—আর আজো সেই ঘড়ি চলেছে ঠিক তেমনি। আজো থেমে যায়নি এর হৃৎস্পন্দন—এক শতাব্দী পরেও! তার যন্ত্র-জীবন সমানে চলেছে টিক্ টিক্ টিক্! ······কে, কে সেই নারী এই ঘড়িটি নিয়ে চলেছিল তার দুটি স্তনের মাঝখানে, রেশমী ব্লাউজের গরমের নিচে। বুকের স্পন্দনের তালে তালে তাল মিলিয়েছিল ঘড়িটির মৃদু স্পন্দন—টিক্ টিক্ টিক্! সে কোন্ সুন্দর হাতখানি আঙুলে আঙুলে ঘুরিয়ে দেখেছে এর রূপ, ফুল-আঁকা এর অপরূপ আবরণটি। এই অনিন্দ্য ঘড়িটি যে সাধ করে কিনেছিল

তাকে—তাকে দেখবার আগ্রহে আমি পাগল। মরে গেছে সে! সেই অতীত দিনের নারীদের জন্যেই যে আমার প্রাণে জেগে উঠেছে আকুল বাসনা। এতদূরে থেকে আজো আমি তাদের ভালোবাসি,—একদিন যারা বুক ভরে ভালোবেসেছিল! অতীত দিনের সেই সুখ-সোহাগের কথা আমার সারা প্রাণ ভরে তুলেছে উদাস গভীর ব্যথায়! হায়! সেই মধুর সৌন্দর্য, সেই মদির হাসি, সেদিনের কত সেই কামনা-বাসনা, দুরু দুরু বুকে প্রথম সেই নিভৃত আলিঙ্গন—সমস্তই কি চিরদিন বেঁচে রইবে না? কেমন করে কত যে রাত কাটিয়েছি আমি অতীতের সেই নারীদের কথা ভেবে। এত সুন্দর এত কোমল এত মধুর! একটি উন্মুখ চুম্বনের জন্যে সাগ্রহে কেমন সুন্দর বাড়িয়ে দিত তারা বিহ্বল বাহুলতা! আর, আজ তারা বেঁচে নাই? কিন্তু অমর হয়ে আছে সেই চুম্বন, সেই মধু-চুম্বন; নব নব অধরে বেঁচে আছে, সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে যুগ থেকে যুগান্তরে! পুরুষ নিয়েছে সেই চুম্বন, ফিরে দিয়েছে সেই চুম্বন,—তারপর তারা চলে গেছে কোথায়!

সেই অতীত আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছে তার দুই বাহু দিয়ে। বর্তমানকে ভয় করি আমি; কারণ ভবিষ্যতই যে মৃত্যু! অতীতের সমস্তকিছুর জন্যেই তো মর্মান্তিক যাতনা জাগে, একদিন-যারা-ছিল তাদের জন্যে বিলাপ করি; সেই নিষ্ঠুর কালস্রোতকে যদি বাঁধ দিয়ে থামিয়ে রাখতে পারতাম! কিন্তু সে যে চলে যায় ছুটে যায়,—প্রতিটি মুহূর্ত আমার জীবন থেকে কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায় বিন্দু বিন্দু প্রাণ-সঞ্চয়। ভবিষ্যৎ এগিয়ে আসে মহাশূন্যের মতো। সেই শূন্যতার রাজ্যে জাগে শুধু সমুখের ব্যর্থতা। ঠিক তেমন করে আমি কি আর বাঁচতে পাব না? বিদায়, পুরানো দিনের নারীরা, বিদায়! আমি যে তোমাদের ভালোবাসি! তা, আমার প্রেম শুধু ব্যর্থতার কাহিনীই হয়নি। আমি পেয়েছিলাম তাকেই, তাকেই পেয়েছি—যার জন্যে এত সুদীর্ঘ দিন-রজনী আমার এমন বিরহ-ব্যাকুল প্রতীক্ষা। তার স্পর্শে পেয়েছি আমি জীবনের গভীরতম সুখ, অন্তরতম আনন্দ!······

রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। প্যারিস শহরের পথে পথে ঘুরছিলাম। প্রাণে খুশি; পায়ে পায়ে উড়ন্ত ডানার বেগ। উৎসুক পথিকের মতো দেখে দেখে চলেছি দোকান পসার। সহসা প্রাচীনকালের আসবাব-পত্রের এক দোকানে চোখে পড়ল সপ্তদশ শতাব্দীর একটা ইতালীয় ক্যাবিনেট অর্থাৎ

ডেস্ক-টেবিল। অনবদ্য অপূর্ব সামগ্রী, একেবারেই দুর্লভ। নিশ্চিতই ইতালীয় শিল্পী ভিতেল্লির নিখুঁত হাতে গড়া। তখনকার দিনে অমন হাত ছিল না আর কারোই। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলছিলাম দূরে।

কিন্তু আমার অলক্ষ্যে পা দুটি ধীরে ধীরে এগোতে লাগল—পিছন দিকে! কেন, কেন এই ডেস্কটি অমন করে আমাকে ইশারা দিয়ে ডাকছে? আবার থমকে দাঁড়ালাম সেই দোকানের সামনে,—জিনিষটি আমাকে যেন লুব্ধ ও মুগ্ধ করে রেখেছে। সত্যিই আশ্চর্য এই আকর্ষণ। একটা জিনিষ তুমি একবার দেখলে এবং ধীরে ধীরে তা তোমাকে পেয়ে বসল, তোমার মনে মোচড় দিতে থাকল, আচ্ছন্ন করে ফেলল তোমার সত্তাকে। কোনো মোহিনী নারীর মুখ দেখে যেমনটা হয়ে থাকে। তার রূপ-লাবণ্য তোমাকে যেন আঁকড়ে ধরে নিবিড় আলিঙ্গনের মতো, তার শক্তি বন্দী করে রাখে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে। তার দেহ-গঠন তার রঙ তার রূপ তার সমস্ত কিছুই তুমি উপভোগ করতে থাকো—এবং ইতিমধ্যে কখন যে তুমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছ, তাকে পেতে চেয়েছ একান্ত আপন ক'রে! তাকে না পেলে কিছুতেই যেন আর চলবে না তোমার। এই পাবার কামনা প্রথমে থাকে কেমন ভীরু-ভীরু, কিন্তু ক্রমেই বেড়ে উঠে হয়ে দাঁড়ায় কেমন মারাত্মক, হয়ে ওঠে একেবারে দুর্দম দুর্বার। এদিকে দোকানদার তোমার চাউনি দেখেই বুঝে নিয়েছে তোমার ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহের রহস্য।

ডেস্কটা কিনে তক্ষুনি নিয়ে এলাম শোবার ঘরে। এই নতুন সাথীর সঙ্গে আমার প্রথম শুভরাত্রির কথা যারা জানে না—তাদের জন্যে করুণা হয় আমার। সমস্ত রাত চোখের নরম চাহনি দিয়ে আলিঙ্গন করলাম এই ডেস্কটিকে,—যেন সে কোমল মেদ-মাংসে গড়া। মিনিটে মিনিটে ছুটে আসি তার পাশে। মনের মধ্যে সব সময়েই এর ভাবনা,—সর্বত্রই এর ভাবনা। পথে পথে গুঞ্জন করে এর মধুর স্মৃতি—যেখানে যাই সেখানেই। বাড়ী ফিরে জামা-জুতো না খুলেই তার পাশে ছুটে এসে তাকে দেখে দেখে চোখ জুড়াই,—ঠিক এক পাগলা প্রেমিকের মতো। সত্যিই, ডেস্কটাকে আমি দেখতে লাগলাম প্রণয়ীর মতো দরদী চোখে। আদুরে হাতে খুলি তার দোর, কখনো ড্রয়ার। তৃষিত প্রণয়ীর মতো কখনো তার অঙ্গে অঙ্গে বুলিয়ে দিই আমার দেহের স্পর্শ,—আমার রক্তে রক্তে আস্বাদ করি একান্ত গোপন করে পাওয়ার আনন্দ!

তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা ডেস্কটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মনে হ'ল, তার পেছনে আছে বোধ হয় কোনো গোপন ড্রয়ার। ঢিপ ঢিপ করে কাঁপতে লাগল বুক; সারাটি রাত বৃথাই বারবার ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। ভোর হতে না হতেই একটা ছুরি হাতে নিয়ে ছুরির ডগাটা ঢুকিয়ে দিলাম কাঠের জোড়-মুখে। খুলে গেল, বেরিয়ে পড়ল গোপন কুঠুরীটা। কালো একটি মখমলের বাক্সে সুন্দর একগোছা চুল.—হ্যাঁ, কোনো মেয়ের চুল! কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো বেশ লম্বা—একগোছা সোনালি চুল—সোঁনালিতে লাল আভা মেশানো। সোনালি ফিতে দিয়ে বাঁধা। অবাক বিস্ময়ে হাবার মতো একা আমি দাঁড়িয়ে, পা কাঁপছে। সুদূর স্মৃতির মতো অস্ফুট-ক্ষীণ একটু মিষ্টি গন্ধ : ছড়িয়ে পড়ছে যেন অতীন্দ্রিয় আত্মার আবেশ!

গোপন ড্রয়ার থেকে চুলের গোছাটি তুলে নিলাম, অনেকটা যেন ভক্তিভরেই। চুলগোছা অমনি বাঁধন খুলে সোনালি ঢেউয়ে দুলে দুলে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে—হালকা উজ্জ্বল নরম নমনীয় সেই চুল। আমাকে তখন পেয়ে বসল অদ্ভুত ভাবাবেগে। কী আশ্চর্য! কবে কেন এই চুলগোছা রাখা হয়েছিল এই গোপন নিরালায়? কত যে অভিমান কত যে লীলা লুকিয়ে রয়েছে এই স্মৃতিটুকুর আড়ালে। কে রেখেছে এটি,—কোনো প্রেমিক রেখেছে কি তার বিদায়ের দিনে? অথবা, গৃহজীবনে উদাসীন হয়ে চলে যাবার আগে রেখে গেছে এই প্রেম-সম্পদ—পরিত্যক্ত সম্পত্তির মতো। অথবা, তরুণী প্রিয়ার মরণের মুখে বক্ষরত্নের মতোই রেখে দিয়েছে তার একগোছা চুল,—বিগতা প্রিয়ার শেষ-স্মৃতিটুকু অম্লান থাকবে যাতে চিরদিন, যাতে চিরদিন তাকে সে ভালোবাসতে পারে, নিবিড় ব্যথায় বুকে জড়িয়ে রাখবে, চুমো খাবে পাগলের মতো! তাই কি? কী আশ্চর্য, সেই চুল আজ পড়ে আছে তেমনিই,—কিন্তু সেই তরুণীর প্রাণ-প্রতিম দেহখানির কোনো চিহ্নও আজ আর কোথাও নেই তো!

আমার আঙুলের উপর দিয়ে উড়তে লাগল চুলগোছা,—আমার দেহ স্পর্শ করল নিবিড় আলিঙ্গনের শিহরণের মতো। বিগতার মধুর আলিংগন পরশ! প্রাণটা ব্যথায় কোমল হয়ে এল, বুক ভেংগে কান্না এল। আমার হাতের মধ্যে তাকে অনুভব করতে লাগলাম অনেকক্ষণ ধ'রে। তখন মনে হ'ল, এরই মধ্যে গোপন রয়েছে আজো তার

প্রাণস্পন্দন। ধীরে ধীরে মখমলের বাক্সে রেখে দিলাম, ড্রয়ারটা বন্ধ করে রাখলাম। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে চলতে লাগলাম স্বপ্নে-পাওয়া লোকের মতো……

সোজা চলেছি শুধু—বুকের তলায় উদ্বিগ্ন বেদনা…কোনো কুমারীকে প্রথম প্রণয়-চুম্বনের পরে সারা বুকে জেগে থাকে যেমন একটা ভীরু উদ্বেগ! মনে হ'ল, অতীতেই যেন আমি বেঁচে ছিলাম, তাই চিনি আমি এই নারীকে। তখন কিল্লানের মধুর কবিতা মুখর হয়ে উঠল আমার প্রাণের ভিতর,—ঠিক যেমন করে কান্না জেগে ওঠে :

রোম-সুন্দরী, ফ্লোরা লাবণ্যলতা,
কোথা আছ তুমি সে কোন্ কালের বাঁকে ?
কোথায় হারাল থায়াস, হিপারশিয়া ;
ধরা কি দেবে না আজিকার অনুরাগে !

কোথা সেই ইকো মানুষ দেখেনি যারে,—
নদী-প্রান্তরে শোনা যায় শুধু রব ;
মানুষের মন নাগাল পেল না যার
কোথায় সে সব অতীতের সৌরভ ?

বাড়ী ফিরেই ছুটে এলাম আমার বুকের মানিকের কাছে,—সে কী অদ্যম আকর্ষণ! হাতে তুলে নিলাম তাকে : তার স্পর্শে আমার অংগে অঙ্গে আমার সর্বাংগে বয়ে গেল যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ! আমার দিনরাত্রি কাটতে লাগল বিমূঢ়ের মতো,…অথচ ঐ চুলের স্মৃতি ভুলতে তো পারি না এক পলকের জন্যেও! বাড়ী ফিরতেই ছুটে যাই তার কাছে, হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকি। ডেস্কে চাবি লাগাতেই সর্বাংগে খেলে যায় ভাষাহারা এক শিহরণ,—নিঝুম রাতে প্রণয়িণীর ঘরের দোর খুলবার সময় হয় যেমনটা। এই সুন্দর চুলের সোনালি শীতল পরশটুকু পাবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে আমার আঙুলগুলি, প্রাণে প্রাণে জেগে থাকে উগ্র কামনার ব্যাকুল ক্ষুধা!

বারবার আলিংগন করে সারা গায়ে তার কোমল স্পর্শ বুলিয়ে বুলিয়ে তাকে রেখে দেই বাক্সের মধ্যে। ওখানেই যেন ওর থাকবার জায়গা,—আমার বন্দী প্রণয়িণীর, আমার জীবন্ত প্রতিমার! সে তো রয়েছে আমার কাছেই, আমার একান্ত কাছে। নিরালায় আমরা দুজন।

তখন কামনার জ্বালায় পাগল হয়ে উঠত আমার সত্তা। মধুর উত্তেজনায় ডেস্কটা খুলে কাছে নিয়ে আসতাম তাকে। শীতল কোমল স্পর্শ-সুখে তার মুগ্ধ-মদির সুরভিত আলিংগনের মধ্যে যেন আত্মহারা হয়ে যেতাম।

এমনিভাবেই কাটল একমাস কি দুইমাস···তারপর,—তারপর আর-কিছুই নাই তো! এখন দিনরাত শুধু তারি ভাবনা। দিনগুলি কাটতে লাগল পূর্বরাগের প্রণয়-সুখে! প্রণয়িণীকে আলিঙ্গন করে ধরার মুখে বুকের মধ্যে যেমন একটা মধুর যন্ত্রণা হয় সেইরকম সুখে।

আমি তাকে একটা ঘরে নিয়ে এসে বন্ধ করে দিলাম চারপাশের জানালা। নিভৃত নিরালায় আমার অঙ্গে অঙ্গে বুকে বুকে তার স্পর্শ অনুভব করে চুমো খাই······কামড়ে ধরি কামনার অসহ আবেগে। চেপে ধরি আমার গালের উপর গলার উপর। তার রূপের সোনালি ঢেউয়ের মাঝখানে ডুবিয়ে রাখি চোখ দুটি—চেপে রাখি সমস্ত চোখে, দু'চোখ ভরে নেই তার সোনালি সৌন্দর্যে।

আমি ভালোবাসি, পাগলের মতো ভালোবাসি আমি। একে ছেড়ে আমি একটুও বাঁচব না, একে না দেখলে বাঁচব না। আমি দিনরাত শুধু প্রতীক্ষায় থাকি—ব্যাকুল প্রতীক্ষায়! কার···জানি না······বুঝি তার!

একরাতে হঠাৎ জেগে উঠলাম আমি। ঘরে আমি যেন একা নই, —একাই ছিলাম যদিও। দু'চোখ বুজতে পারলাম না, একটা উগ্র নেশায় জেগে রইলাম যেন। তাকে কাছে টেনে নেব বলে উঠে পড়লাম। আজ সে যেন আগের চেয়ে আরো কোমল আরো মধুর আরো জীবন্ত। ফিরে এল কি তার সেই সুন্দর প্রাণ? পাগল চুমোয় চুমোয় এক অপূর্ব সুখের আবেগে যেন মূর্ছিতই হয়ে পড়ছিলাম। সারাদেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তার কোমল তনুলতা ······মৃতেই কি ফিরে এল প্রাণ?

সে এসেছে! হ্যাঁ, তাকে আমি দেখেছি, তাকে জড়িয়ে ধরেছি, পেয়েছি তাকে! বিগত দিনের আমার সেই প্রিয়া,···ঠিক সেদিনকার মতোই! কোমল-পেলব শুভ্র, তন্বী তনুলতা। সুখশীতল পীন স্তন-যুগল, বিপুল নিতম্ব, ধনুকের মতো কোমরের কোমল ভাঁজ। সবি ঠিক সেই আগের মতো। তাঁকে জড়িয়ে ধরার সঙ্গেসঙ্গেই সর্বাঙ্গে সে কী অধৈর্য সুখ-শিহরণ,—স্নায়ুতে স্নায়ুতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত!

এবার পেয়েছি তাকে—দিন-রজনীর সে আমার! সে ফিরে এসেছে

—আমার সেই বিগতা, সুন্দরী বিগতা, আমার আরাধ্যা প্রতিমা, আমার এতদিনের অজানা রহস্যময়ী!······তার আলিঙ্গনেই পেয়েছি তো অধরাকে দুইবাহুর মধ্যে পাওয়ার সুখ। সারাটা দুনিয়ার কোনো প্রেমিকই কি ভালোবেসেছে অমন ক'রে, এমন ভয়ানক ভাবে?

কিন্তু আমার এই সুখ আমি লুকিয়ে রাখতে পারলাম না। তাকে ফেলে কোথাও যে নড়তে পারি না। সবখানে সবসময়েই আমার সঙ্গে সঙ্গে রাখি তাকে। স্ত্রীর মতো তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই শহরের পথে পথে, থিয়েটারে গিয়ে তাকে স্ত্রী বলে পরিচয় করিয়ে দিই সবার সঙ্গে। কিন্তু লোকে দেখে ফেলেছে তাকে······সন্দেহ জেগেছে। আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমাকে আসামীর মতো পুরে দিয়েছে জেলে। তাকে কেড়ে নিয়েছে আমার বুক থেকে.—ওঃ ভগবান, ওঃ!

—ডায়েরীটি এখানে এসেই শেষ হয়েছে।

শঙ্কিত চোখ তুলে তাকালাম ডাক্তারের দিকে। ঠিক তখনি সমস্ত পাগলা গারদ ধ্বনিত হয়ে উঠল এক বিকট চীৎকারে। ভয়ে বিস্ময়ে আর কেমন করুণায় আমার কথাই বেধে যাচ্ছিল—'কিন্তু······এই চুল ······সত্যিই কি এই চুল—'

ডেস্কটা খুলে ডাক্তারবাবু আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন সোনালি রঙের একগোছা চুল। চুলগোছা আমার দিকে এগিয়ে এল উড়ন্ত পাখীর মতো। আমার হাতের মধ্যে তার উজ্জ্বল-কোমল স্পর্শে আমি যেন কেঁপে উঠলাম। ডাক্তার ভুরু দুটি কুঁচকে তুলে মন্তব্য করলেন—

'মানুষের মন বিচিত্র, তার পক্ষে সবি সম্ভব।'

॥ প্রেমের চতুষ্পাদ ॥

রাজা ছিলেন চমৎকার লোক, প্রজাদের কাউকেই ভুলেও কখনো খারাপ চোখে দেখতেন না। তবে দুঃখের কথা হ'ল, কেউই তাকে পছন্দ করত না। কারণ? কারণ, রাজদণ্ড বিধানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বড্ড বেশী দিল-দরাজ,—তাঁর চোখে অপরাধীরা ছিল দুষ্টু ছেলেদের মতোই! তার ফলে প্রজারাও ভাবতে শুরু করল, ভগবান তাদের জন্যে যদি একজন রাজার মতো রাজা পাঠিয়ে দিতেন!

তবে, তাদের এই ধারণার মূলে অবশ্যি একটা বিশেষ ব্যাপার ছিল। রাজকার্যের চেয়ে রাজার মনোযোগ ছিল বরং অন্যদিকে—অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ের দিকে! তার নামটি হ'ল আদেলেদে; সে নিজেই নিশ্চিন্তে রাজত্ব করে যাচ্ছিল রাজার হৃদয়-সিংহাসনে। দিনে দিনে রাজার উপরে তার প্রভাব এত প্রবল হয়ে উঠল যে বৃদ্ধ মন্ত্রীরা পর্যন্ত দস্তুরমতোই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, সবাই মিলে রাজাকে তার প্রণয়-স্বর্গের মোহ থেকে উদ্ধারের জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন নানাভাবে। কারণ, ইতিমধ্যেই অবস্থা এমন গুরুতর হয়ে উঠল যে কারো প্রাণদণ্ডের আদেশ-লিপির নিচে নিজের নামটুকু সই করবার বেলায়ও তাঁকে খুঁজে পাওয়া দায়!

অনেক দেশের রাজমন্ত্রীই হয়ত রাজার রাজকার্যে এমন ঔদাসীন্যকে ব্যক্তিগত কাজে লাগতেন সুখ-সুবিধের সুবর্ণ-সুযোগ হিসেবে, কিন্তু মন্ত্রীরা ছিলেন অন্যজাতীয় দেশরক্ষক,···বরং কাজে ইস্তফা দেবেন, তবু প্রজাদের ভালোমন্দ না দেখে চোখ বুজে থাকতে পারবেন না। মন্ত্রীরাই বরং তরুণ প্রেমিক রাজাকে মুক্ত করতে চান তাঁর মোহজাল থেকে—তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাঁর রাজকীয় মর্যাদায়। রাজা রাজশক্তিতে বিরাজ করুন, প্রজাবৃন্দ বুঝুক যে তাদেরও রাজা আছে। কাজেই মন্ত্রীরা মিলে মন্ত্রণা শুরু করলেম; মন্ত্রণার শেষে স্থির হল,—তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ মন্ত্রীই সম্মোহিত তরুণ নৃপতির কাছে উপস্থিত করবেন তাঁদের উপদেশ ও অভিযোগ। কিন্তু এই মন্ত্রীটি মোটেই মিষ্টভাষী ছিলেন না,—তিনি ছিলেন রুক্ষভাষী এবং ভয়ানক একরোখা। রাজার কি কৈফিয়ৎ দেবার আছে সোজাই শুনতে চাইলেন তিনি। আবেগভরা

কণ্ঠে নৃপতিদের গুণগরিমা ও প্রজাদের প্রতি রাজার কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেই একটা কড়া মন্তব্য পেশ করলেন : প্রজারা রাজার বর্তমান শাসনে অথবা ঠিক ঠিক বলতে গেলে কুশাসনে খুবি অসন্তুষ্ট, খুবি বিরক্ত। তাদের মতে এটা খুবি বিসদৃশ এবং খুবি অশোভন যে রাজা তাঁর সমস্ত প্রজাদের তুচ্ছ করে একটিমাত্র মেয়েকে নিয়েই মশগুল হয়ে রয়েছেন ; রাজ্যশুদ্ধ জাহান্নামে গেলেও রাজার কোনো মাথাব্যথা নাই ! তাই, রাজা শুধু প্রজাদেরি তাচ্ছিল্য করেননি,—সিংহাসনের মান-সম্মানও ক্ষুণ্ণ করেছেন।

এইসব ভয়ানক অভিযোগ শুনে রাজা তো হতভম্ব ; এতসব কথার বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না। বিবেকবুদ্ধি তাঁকে দংশন করতে শুরু করল। বৃদ্ধ মন্ত্রীও এদিকে পরিশ্রম পরিমিতি আত্মসংযম ইত্যাদি রাজোচিত গুণাবলী সম্পর্কে শুরু করলেন লম্বা লম্বা নীতিগর্ভ বক্তৃতা !

সবকথা শুনে সরল-স্বভাব নৃপতি বললেন—'সবি সত্যিকথা মন্ত্রী। তবে একটা কথা মনে হয়, আপনি বোধহয় প্রেমে পড়েননি কখনো !'

বৃদ্ধ মন্ত্রী স্বীকার করলেন—প্রেমে পড়ার মতো যথেষ্ট সময় তিনি পাননি। নীতিগর্ভ বক্তৃতামালার শেষে তিনি গভীর হতাশায় মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন,—নীতিবীজ বপনের সব চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হ'ল !

মন্ত্রীমশাই অবশ্যি ভুল বুঝলেন। কারণ, রাজা যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন ! এখন থেকে রাজকীয় কর্তব্যের প্রতি তিনি একান্তই সচেতন হয়ে উঠলেন, তিনদিনের মধ্যে তার প্রিয়তমার কাছে গেলেন না। এদিকে আদেলেদে তার নিরালা ঘরে বসে কত যে চোখের জল ফেলল তার আর লেখাজোখা নাই। তাকে দেখতে হ'ল বিষাদ-প্রতিমার মতো ! তিনদিনের মধ্যে একটিবারও রাজার দেখা না পেয়ে আদেলেদের সমস্ত আশা-ভরসা একেবারে নির্মূল হতে চলল। প্রাণ-বিসর্জনের আগে একটিবার সে রাজার সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করল।

রাজা তো তাকে পায়ের কাছে দেখে অবাক ! রাজা মুখ ফুটে কথা বলবার আগেই মেয়েটি কেঁদে কেঁদে জানতে চাইল, সে এমন কী অপরাধ করেছে।

এইকথা শুনে রাজার প্রাণে খুব লাগল ; প্রিয়ার অশ্রুভিজা মুখখানি

নিজের বুকে চেপে ধরলেন।

'আদেলেদে, আমার আদেলেদে, কেঁদো না তুমি।···না, তুমি তো আমার কাছে কোনোই অপরাধ করোনি ; আগের মতোই তোমাকে আমি ভালোবাসি এবং চিরদিনই ভালোবাসব। তবে, তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না,—দেখা করতে আমি আর সাহস পাই না।'

রাজার কথা আদেলেদের কাছে আনন্দের ও বেদনার। প্রথম দিকটা প্রলেপ, শেষের দিকটা আঘাত। নীরবে আদেলেদের দু' চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল—অঝোর অশ্রু। তার ব্যথা এত গভীর যে তা প্রকাশের কোনো ভাষা নাই! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগল—

'আর দেখা হবে না। অথচ, তুমি আমাকে চিরদিনই ভালোবাসবে। ফুলের পাপড়িতে করে তুমি কি আমাকে বিষ এনে দিচ্ছ? এই ফুলের পাপড়ি দিয়ে হবে কি আমার? তার চেয়ে বরং মুখ ফুটে বলো—তুমি আমাকে ঘৃণা করো, তুমি আমার উপর বিরূপ, তাই এই বিচ্ছেদ। এখন বুঝলাম আমার যা হবার হবেই,—রাজার মর্জিকে ঠেকায় কার সাধ্য!'

সদাশিব রাজা এবার ভারী মুশকিলে পড়লেন : তিনি যে এক নীতিবাগীশ মন্ত্রীর খপ্পরে পড়েছেন সেকথা প্রকাশ করতে ভয়ানক লজ্জা হচ্ছিল। তাই, সত্যি কথাটা গোপন করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন ; কিন্তু প্রিয়ার অশ্রুজল ও দীর্ঘশ্বাস তাকে এত অভিভূত করে ফেলল যে তাঁর এই আপাত-নিরাসক্তির পিছনের ইতিহাসটি আগাগোড়া খুলে না বলে পারলেন না।

সব শুনে আদেলেদের বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। তা হ'লে যা ভেবেছিল তেমন হতাশার কিছুই নয়। মেয়েটি আবার হাসিখুশি হয়ে উঠল, আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখখানি। তা, অশ্রুমুখের চেয়ে হাসিমুখের মন্ত্রশক্তি মোটেই তো কম নয়!

'দাঁড়াও, মন্ত্রীমশাই, দেখাচ্ছি তোমার নীতির কত দৌড়!'—কাঁদতে কাঁদতেই হেসে উঠল আদেলেদে—'আমাকে যে তিনদিন ধরে এত নির্যাতন করেছ সেজন্যে পুরস্কৃত না করে ছাড়ব? রাজার যদি অনুমোদন হয় তো আমি এই বুড়ো গাধাটিকে এমন করে নাকে দাঁড় দিয়ে ঘাস খাইয়ে ছাড়ব যে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন সে তোমার সামনে ঐসব যাচ্ছেতাই নীতিবাক্য ঘ্যানর ঘ্যানর করতে সাহস পাবে না। বক্তৃতার আর জায়গা পায়নি! আমি ইতিমধ্যেই ফন্দী এঁটে ফেলেছি, বেশ মজার একটা ফন্দী।

কাল খুব ভোরে তুমি যদি একটিবার এসে মন্ত্রী-ভবনের পাশের বাগানে লুকিয়ে থাকো তো তোমাকে এমন একটা দৃশ্য দেখাব যে তুমি খুশি না হয়ে পারবে না। আমার ফন্দী যদি কাজে লাগে তো বেশ আরাম করেই দেখতে পাবে—নীতিবিশারদ বৃদ্ধ মন্ত্রীটি প্রকাশ্য দিবালোকে কী সব ছেলেমানুষি কাণ্ড করতে পারে! তখন তোমার উপরে সে যে নীতিবাণ প্রয়োগ করেছে তা সুদে-আসলেই তাকে ফেরৎ দিতে পারবে।'

রাজা সানন্দেই অনুমোদন করলেন, তবে পরিহাসের পরিধি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। আদেলেদে কথা দিয়ে বাড়ী ফিরে এল হাসিমুখে।

পরের দিন ভোরবেলা। রাজপুরীর সকলে ঘুমে বিভোর। সুচতুরা আদেলেদে প্রতিশোধ নেবার মানসে মন্ত্রীভবনের পাশের বাগানে ছুটে এল চকিতা হরিণীর মতো। তার গায়ের জামাটি হয়েছে আজ তুষারের চেয়েও শুভ্র। তার সোনালি অলক হাওয়ায় হাওয়ায় খেলা করেছে, উড়ে উড়ে পড়ছে মৃণালকণ্ঠের উপরে। বুকের স্বচ্ছ আবরণটুকু তরুণ সূর্যদেবের তীক্ষ্ম দৃষ্টি থেকে তার উদ্দাম যৌবনকে কিছুতেই যেন আর বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না।

সর্বনাশা মোহিনীরূপে সেজেগুজে এই রূপসীটি ঠিক একটি বনদেবীর মতোই বাগানে ঘুরতে লাগল। মন্ত্রীমশাই আগেই রাজকার্যে বসেছেন, মাঝে মাঝে তিনি আগ্রহভরে সুন্দর বাগানটির দিকে তাকাচ্ছিলেন,—বাগানটি তাকে যেন নিচে নেমে আসতে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। আদেলেদে তাকে জানলায় টেনে আনার জন্যে দোয়েলের মতো মিষ্টি স্বরে গান শুরু করে দিল—

'রূপসী তরুণী আমি,
রঙীন ডানায় ভেসে চলি দিবাযামী,
মাছ-দুধ চেয়ে ভালোবাসি ভালোবাসা·
আর কিছু নয়, ভালোবাসা—ভালোবাসা!
মোর মতো হায়, আর কেউ ভালোবেসে
বাহুর বাঁধনে এ বুক বাঁধিত এসে।'

কলকণ্ঠের প্রথম সুরলহরী শুনেই বৃদ্ধমন্ত্রীর কান খাড়া হয়ে উঠল, কলম রেখে মাথার পরচুলাটা একটুখানি ঠিকঠাক করে তিনি একমনে শুনতে লাগলেন। 'কার এমন মধুর গান!'—চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, আলগোছে জানালায় এসে পর্দার আড়াল থেকে নিচে বাগানের

দিকে উঁকি মেরে দেখে তো অবাক। যে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে তিনি এতদিন বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেছেন—এযে সে-ই!

প্রথমে ফিরে এসে তিনি নিজকাজে আবার ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন, কিন্তু প্রবল ঔৎসুক্য দমন করতে না পেরে উঠে গিয়ে উঁকি মেরে আবার দেখতে লাগলেন : চোখ আর ফেরাতে পারলেন না, মুগ্ধ হয়ে গেলেন, কামনার স্রোতে ভেসে গেলেন, ডুবে গেলেন। একটি প্রেম-চুম্বক তাঁকে যেন সজোরে নিচে টেনে নামাতে লাগল; কষ্টেসৃষ্টে তিনি একচোখ রাখলেন কাজের দিকে, একচোখ বাগানে।

'বুড়ো হয়েও বোকামি যাচ্ছে না।'—মৃদু হেসে মন্ত্রীমশাই আপনমনে বলতে লাগলেন—'নাতনীর বয়সী একটা মেয়ে কিনা শেষে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিল! আঃ, কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে মেয়েটিকে! আর যে সহ্য করে থাকা যায় না, স্বয়ং মুনিঋষিরাও থাকতে পারতেন কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ; আজ আমি প্রেমিক রাজাকে ঈর্ষা করি। আঃ, কী সৌভাগ্যবান সে! এই রকম একটি রূপসীর পাশে বসে সে যে রাজকার্যের কথা ভুলে যাবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে,—সারাটা রাজ্যে যে তার হৃদয়রাজ্যেশ্বরী ছাড়া আরো লোক আছে তা না ভুলে উপায় কি?'

ঠিক তখনি সুচতুরা আদেলেদে জানলা-পথে তার কামবিহ্বল কটাক্ষ হানল মন্ত্রীর উপর এবং এমন ভাবভঙ্গী দেখাতে লাগল যেন সে এক তৃষিতা প্রণয়িনী! গোলাপ ও যুঁই তুলে মালা গাঁথতে গাঁথতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। মন্ত্রীভবনের কাছে ঘনিয়ে আসতে আসতে মেয়েটি আবার গান ধরল—

'এই বনভুমে প্রেমের শিকলে
বাঁধা পড়িয়াছি আমি,
পাগল হইয়া ঘুরে মরি তাই
দিশাহারা দিবাযামী।
প্রেমের মহিমা যদি গো জানিতে
বুঝিতে আমার ব্যথা,—
তোমার বুকের মাঝারে লুকায়ে
রাখিতাম মোর মাথা।'

বৃদ্ধমন্ত্রী মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। গান শুনে তার মাথা এমনভাবে

ঘুরে গেল যে ভালোমন্দ বুঝে দেখবার ক্ষমতাই আর রইল না,—ভাবাবেগে একেবারে খাবি খেতে লাগলেন। বৃদ্ধ ঠিক একটি বছুরের মতোই ঘরময় চঞ্চলভাবে ঘুরতে লাগলেন,—বৃদ্ধের উষর প্রাণ মোমের মতোই নরম হয়ে গলে গলে ঝরে পড়ল! মেয়েটির দিকে তিনি ঝুঁকে পড়লেন,—টোপ দেখলে মাছের দশা হয় যেমনটা। তাই বর্শিটিও গেঁথে গেল সোজা তার বুকের ভিতর।

ঘরোয়া পোশাকটা ছেড়ে মন্ত্রীমশাই ঝকমকে একটা পোশাক নামিয়ে পরতে গেলেন,—কিন্তু ইতিমধ্যে মেয়েটি চলে যেতে পারে ভেবে পোশাকটা না বদলেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরচুলাটা ঠিকঠাক করতে লাগলেন। একি, একি চেহারা হয়েছে তাঁর? তাঁর মুখ তো কোনদিনই এত চ্যাপ্টা এত হোঁৎকা ছিল না। বার্দ্ধকের ছাপ কি তবে এমন করেই তাঁর চোখে মুখে ধরা পড়েছে। দশা দেখে তাঁর বিবেকবুদ্ধি যেন বলে উঠল—

'বুড়ো পাগলা, একি বোকামি হচ্ছে তোমার। ডাঁটাসার জীবনের শেষমাথায় এসে প্রেম নিবেদন করতে যাচ্ছ কিনা পুষ্পিত বসন্তের পায়ে! না, না,—তার চেয়ে তোমার ঐ টেবিলের কাছেই ফিরে গিয়ে বসো। যেখানে বসে শাসনযন্ত্র চালাতে চালাতে বুড়ো হয়েছ,—যাও সেখানেই ফিরে যাও, আলেয়ার পিছনে ছুটে এতদিনের যশের তরী ভরাডুবি করো না!'

—তাঁর বিবেকবুদ্ধি বুকের মধ্যে বসে এইকথাই বলছিল; আরো বলত,—কিন্তু এদিকে যে বাগান থেকে বয়ে আসছে সুরের জোয়ার, আগের চেয়ে আরো মধুর আরো মোহন মধুর!

'কপোতীর চেয়ে কোমল করুণ
তরুণী সে অপরূপ,
কুঞ্জছায়ায় নিরালায় একা
বসে আছে নিশ্চুপ।
চেয়ে আছে সে যে—চেয়ে আছে শুধু
প্রিয়তম মুখপানে,
সব ব্যথা শেষে জুড়িয়ে যাবে কি
করুণ মরণ-বাণে!'

কোন রাজর্ষির পক্ষেও যে আর বসে থাকা অসম্ভব। মাথাটা

একেবারে ঘুরে গেল। অর্থাৎ উল্টো দিকে ঘুরে গেল। বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন মন্ত্রীমশাই ; এতদিনের পাকা হাতের হাল এক নিমিষে হাত থেকে খসে পড়ে গেল! লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো ছুটতে ছুটতে বাগানে নেমে এসে তিনি আদেলেদের পায়ের উপরে আছাড় খেয়ে পড়লেন। মেয়েটি ইচ্ছে করেই মুখ ঘুরিয়ে চলেই যাচ্ছিল যেন।

'সর্বনাশ!'—হঠাৎ সে মন্ত্রীমশাইকে হাতে ধরে তুলতে তুলতে বলল—'একি, ব্যাপার কি বলুন তো!'

'না, না সুন্দরী! এখানেই থাকতে দাও আমাকে!'—মন্ত্রীর গলার স্বর যেন গলে পড়ছে, চোখের চাউনি কোমল করুণ,—'আমাকে উঠিয়ে দিও না! তোমার ক্ষমা তোমার হাসি তোমার ভালোবাসা না পেলে এই ধুলোয়ই আমি পড়ে থাকব।'

'সে কি কথা! আপনি যে আমাকে ব্যথা দিয়ে কথা বলছেন।'—চতুরা আদেলেদে উচ্চহাসি সামলাবার জন্যে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রাখে—'না, না, উঠুন আপনি—আপনাকে অনুরোধ করছি, উঠুন ; আপনি কি সত্যিসত্যি বলেছেন, না ঠাট্টা করছেন?'

'সত্যিই বলছি, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। আমার প্রেমের সততা ও নিষ্ঠাকে অবিশ্বাস ক'রো না। তোমার এই স্বর্গীয় এই অপরূপ —ঐ দেবীর মতো রূপ দেখে সকলেই যে বিভোর। এমন কি, আমি—নিজে আমি সর্বত্রই স্বাধীন বলে গর্ব করতাম—সেই আমিই এখন তোমার দাসানুদাস, তোমার কাছে চিরবন্দী!'

'সত্যি, আপনার মতো লোককে জয় করতে পেরে আমি গর্বিত ; তবু আপনার স্বাধীনতা আপনার গর্ব খর্ব করতে সাহস করি না যে!'

মন্ত্রমুগ্ধ বৃদ্ধ প্রেমিক বললেন—'তোমাকে যে সাহস করতেই হবে, তুমি না করে যে পারবে না। অন্যথা মৃত্যু ছাড়া আমার আর মুক্তি নাই। তুমি যদি করুণা করে আমার হতে রাজি না হও তো সেই মৃত্যুরও আর বেশী বাকী নাই।'

'আপনার নিজমুখ থেকে এমন মধুর কথা শুনে মনে হয়, এ বুঝি সত্যি নয়, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি,—মধুর স্বপ্ন! এই স্বপ্নের মোহ থেকে আমাকে জেগে উঠতে দিন। কারণ, এ তো সত্যিকথা যে আমার প্রতি আপনি উদাসীন। তা হ'লে আজ আমার মনের কথা বলব, এমন একটি মিলন-মুহূর্তের জন্যই কত যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। আর, কিছু-

দিন থেকে আমার ভারী সাধ হয়েছে, ভারী অদ্ভুত একটা সাধ,—অবশ্যি একমাত্র আপনিই আমার সেই প্রাণের সাধটি মেটাতে পারেন।'

'বলো কী সে, তোমার হাতদুটি ধরে মিনতি করছি বলো, বলো তুমি।'

'সত্যি বলতে কি, বলতে দ্বিধা লাগছে—সত্যিই দ্বিধা লাগছে,—আপনি হয়ত কিরকম মনে করবেন। তবু একথা সত্যি, আপনি রাজি না হলে আমি আর সুখী হব না। তাই মনে হচ্ছে, আপনাকে বলাই ভালো।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কিচ্ছু ভেবো না তুমি, একটুও দ্বিধা করো না, শুধু বলে ফেলে মনের সাধ মিটিয়ে নাও! ফাঁসিকাঠে ঝুলতে বলো, আগুনে ঝাঁপ দিতে বলো, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়তে বলো—সব করব আমি। দাবানলের মধ্য দিয়ে—বন্যার মধ্য দিয়েও তোমার কাছে ছুটে আসব, মৃত্যুকেও আর ভয় নেই আমার।'

'সত্যি? তাহ'লে খুলেই বলছি, এবং আপনার প্রেমের প্রমাণটা এর চেয়ে বড় আর কিছুই হতে পারে না। সব খুলেই বলছি তবে, বহুদিন থেকে বড় সাধ—কয়েক মিনিটের জন্যে হ'লেও এই বাগানে একটুখানি ঘুরে বেড়াব।'

'কী খেয়ালী মেয়ে, শেষে কিনা মাথায় ঢুকল এসে এই সাধটুকু! বেশ, বেশ, এক্ষুনি ছোট্ট একটি ঠেলাগাড়ীতে চড়িয়ে তোমাকে বাগানের পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি।'

'না, না, তা নয়। আপনার কাঁধে চড়ে একটুখানি বেড়াতে সাধ হয়েছে,—বহুদিনের সাধ! আমার ভালোবাসার বিনিময়ে শুধু এইটুকুই চাই,—চার হাতপায়ে শুধু একটুখানি ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন।'

'নিষ্ঠুর রূপসী তুমি, বড়ই নিষ্ঠুর! নিশ্চয়ই তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছ, আমাকে বোকা বানাতে চাইছ। দুনিয়ার আর যা-খুশি চাও তুমি, শুধু আমার মনে আঘাত দিও না। সবাইর কাছে হাস্যাস্পদ হব—নিশ্চয়ই তুমি তা চাও না; ভেবে দেখো আমার পদ-মর্যাদার কথা আমার আত্ম-সম্মানের কথা,—আমি যে একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী।'

'ও, তাহ'লে আপনার ঐ সব অর্থহীন রীতিনীতিই কি সত্যিকার প্রেমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে,—যাকে ভালোবাসেন তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? এখানে আর কেউ তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে না,

তাহ'লে হাস্যাস্পদই বা হবেন কেন ? তা ছাড়া, কোনোদিনই এবিষয়ে টুঁ শব্দটিও করব না প্রতিজ্ঞা করছি, আমায় নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারেন। তা, এই বাগানের পাখী ও কাঠবিড়ালীরা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দেবে না !'

মন্ত্রী বেচারা কিছুক্ষণ দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইলেন, শেষপর্যন্ত ভাবাবেগে মানসম্মানের বাধা ভেসে গেল কোথায় ! চার হাত-পায়ে ভর করে ভারী মনোরম ভঙ্গিমায় দাঁড়ালেন তিনি, ঠিক একটা চতুষ্পদের মতোই ! অথচ ভদ্রলোকের বয়স হবে তখন ষাটের উপর ! মেয়েটি তার রেশমী ওড়নাটা দিয়ে এই অভিনব চতুষ্পদ প্রাণীটির মুখে ভালো করে লাগাম কষে দিল, তারপর সেই লাগামটা ধরে আলগোছে লাফিয়ে উঠে বসল তার পিঠের উপর। হাসিতে টুকরো টুকরো হয়ে সে পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে আর কি !

চতুষ্পদ মন্ত্রীটি ধীরে ধীরে কয়েক হাত এগিয়েছেন—এমন সময় রাজামশাই হঠাৎ একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীকে তার অপরূপ ক্রিয়াকলাপের জন্যে আচ্ছা করে অপমান করতে বাকী রাখলেন না।

'বাঃ বাঃ, এমন দৃশ্য তো রাজভাণ্ডার উজাড় করেও দেখা উচিত। এমন নারীবিদ্বেষী বিজ্ঞ দার্শনিকটিই আজ হলেন কিনা একটি চতুষ্পদ জন্তু ! বাঃ বাঃ, চমৎকার ! সত্যিই অপূর্ব অদৃষ্টপূর্ব অভূতপূর্ব !'—হাসতে হাসতে রাজামশাইর পেটে খিল ধরে যায় আর কি !

এদিকে বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজাকে দেখেই তো হতভম্ব, মুখে হাসি ফুটিয়ে থতমত খেয়ে বললেন—

'আমি জানি, কত হাস্যাস্পদ হয়েছি আজ। কিন্তু ভালোবাসার এমন সম্মোহিনী শক্তির কথা আগে তো জানিনি কোনোদিন ! আজ বুঝতে পারছি, যৌবনে প্রেমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার অর্থই বুড়ো বয়সে আরো হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠা। কাজেই রাজামশাই হাস্য করুন, পরিহাস করুন,—মনের সাধ মিটিয়ে বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করুন। নীতিবাগীশ মন্ত্রীর অভাব হবে না আপনার, কিন্তু এইখানেই আমার ইতি। নির্বিচারেই আজ আমি সর্বজয়ী প্রেমের পায়ে দাসখৎ লিখে দিলাম !'

কামনা-বহ্নি

'যে আনন্দ আন্দোলিত সুগন্ধনন্দিত স্নিগ্ধ চুম্বন-তৃষ্ণায়
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জংঘায়,
লীলায়িত কটিতটে, ললাটে ও কটু ভ্রূকুটিতে,
চম্পা-অঙ্গুলিতে—
পুরুষপীড়ন তলে যে আনন্দ কম্প্র মুহ্যমান
গাব সেই আনন্দের গান।'

ম্যারাকো

বন্ধু,

আফ্রিকা সম্বন্ধে আমার ধারণা, আমার সেখানকার অভিযান-কাহিনী —বিশেষ করে এই সম্মোহিনী দেশে আমার সব অভিসার-কাহিনীর বিষয় জানতে চেয়েছ। কৃষ্ণাঙ্গী প্রিয়াদের সঙ্গে আমার প্রেম-পর্ব নিয়ে ইতিপূর্বেই তুমি খুব হাসাহাসি করেছ এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছ যে একদিন আমি এক বিপুলা কৃষ্ণাঙ্গীকে সংগে না নিয়ে আর স্বদেশে ফিরছি না! সেই কৃষ্ণাঙ্গীর মাথায় নাকি জড়ানো থাকবে হলদে বান্দানা, বিচিত্র রঙে ঝলমল করবে তার জমকালো পোশাক! তবে, এই কৃষ্ণাঙ্গীরাই যে আমাকে একদিন পাকড়াও করবে আমিও তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি।

তোমার চিঠিতে লিখেছ, একটা দেশের মেয়ে-পুরুষে কেমন করে প্রেম করে জানতে পেলে সে দেশকে চিনতে পারো বেশ ভালো ক'রেই,— সে দেশ চোখে না দেখলেও।

তা দেখে, এটুকু তোমাকে বলে রাখতে পারি, আফ্রিকায় প্রেম করে তারা ক্ষ্যাপার মতো। এ দেশে এসে পোঁছানোর দিন থেকেই মনে হবে সর্বাঙ্গ জুড়ে কেমন যেন একটা অস্থির প্রতীক্ষা, একটা অবাধ উল্লাস, একরোখা কামনার একটা অদ্ভুত উত্তেজনা,—সর্বাঙ্গে কেমন একটা অবসন্ন আবেশ! সব মিলে তোমাকে নিয়ে যাবে জ্বরালো নেশাভরা এক কামনার রাজ্যে, উদ্যত করে রাখবে দৈহিক ভোগ-চেতনা : ঈষৎ স্পর্শ-সুখ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পেঁছিবে গিয়ে—সেই নামহীন অধৈর্য-উদগ্র সীমান্তে!

আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি। প্রাণের গভীরতা থেকে যে ভালোবাসার জন্ম, প্রাণের জন্যে প্রাণের যে ভালোবাসা, সংক্ষেপে যাকে বলে 'প্ল্যাটনিক লভ্'—আফ্রিকার জংগলে তা থাকা সম্ভব কিনা জানি না; বরং সন্দেহই আছে আমার। কিন্তু অন্যজাতীয় ভালোবাসা, ইন্দ্রিয়-মধুর প্রণয়-লীলা, যা স্বয়ং-সম্পূর্ণ—আফ্রিকার আবহাওয়ায় তাই একটা ভয়ানক ব্যাপার। উত্তপ্ত আবহাওয়া যেন জ্বালিয়ে তোলে দিনরাত। সব সময়েই লাগে জ্বরের মতো। দক্ষিণ দিককার এক-একটা ঝাপটায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

অদূরের বিশাল মরুভূমি থেকে ছুটে আসে আগুনের হল্‌কা, সেই নোনা হাওয়া আগুনের ঝাপটার চেয়েও ভয়াবহ। সমস্ত দেশেই নিরন্তর চলে যেন বিরাট বহ্ন্যুৎসব। সর্বগ্রাসী প্রকাণ্ড সূর্য পুড়িয়ে ফেলে পাথর পর্যন্ত! আর এদিকে, তপ্ত কামনায় অস্থির হয়ে ওঠে সমস্ত শোণিত, সর্বাঙ্গে জাগে অবাধ উলঙ্গ বিক্রম।

কাহিনীটায় ফিরে আসছি এবার···প্রথম কয়েকদিন নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে এলাম পোর্টোর অববাহিকাকায়, কর্সিকার পশ্চিম তীরে। দূর থেকে তীরদেশের গ্রানাইট-প্রাচীরটা দেখায় একটি মালার মতো। সেই তীরেই দাঁড়িয়ে আছে টকটকে লাল পাথরে গড়া এক দৈত্য-মূর্তি। প্রশস্ত অববাহিকায় ঘুমিয়ে আছে শান্ত নিথর জল। এখানে এসে পৌঁছবার আগেই চোখে পড়ে দুরান্তের বৌগি শহর—বিরাট বনপ্রাচীরে বেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু এক পাহাড়ের খাঁড়া গায়ে। ঢালু সবুজের মধ্যে শহরটি যেন একটি আলোর ঝলক, সবুজ সাগরের বুকে যেন ঝর্ণার ফেনা।

ছোট্ট এই সুন্দর শহরটিতে পা বাড়িয়েই বুঝলাম, এখানে নীড় বাঁধতে হবে অনেকদিনের মতো। যেদিকেই তাকাও না কেন, চূড়ার পর চূড়া, উত্তাল চূড়ার মালা,—বক্র ভগ্ন শৃঙ্গাকার কিম্ভূতকিমাকার! মাথার উপরে অবনত আকাশ আশ্চর্য সুন্দর—গাঢ় ঘন-নীল। কোনো নিপুণ শিল্পী যেন দু'বার করে বুলিয়ে দিয়েছে নীলরঙের তুলি। সমস্ত আকাশে প্রতিফলিত হয়ে আছে সমুদ্রের ছবি,—আর সমুদ্রের বুকে নীল আকাশ!

ধ্বংস-সৌন্দর্যে অপরূপ এই বৌগি! এখানে জাহাজ থেকে নামা-মাত্রই সামনে দেখা যাবে বিচিত্র ধ্বংসাবশেষ,—ছায়াছবির দৃশ্য বলেই ভুল হবে তোমার।

শহরের উঁচু দিকে ভাড়া নিয়েছি ছোট্ট একটি বাড়ী। এসব জায়গায় বাড়ীঘরের বাইরে পাঁচিল থাকে না, থাকে না কোনো জানালা-কবাট। ভিতরের খোলা উঠান দিয়েই ঘরগুলিতে আলো ঢোকে। বাড়ী ঢুকতে প্রথমে পড়বে রান্নাঘর এবং সেটাই হচ্ছে হলঘর। বেশ ফাঁকা, এটা দিনে থাকবার। তারপর সমতল ছাতের আর একটা ঘর, রাতের জন্যে। সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রথা-মতোই ব্যবস্থা করলাম দুপুর কাটাবার। আফ্রিকায় এটাই হ'ল দুঃসহ জ্বালার লগ্ন,—এখন নিঃশ্বাস টানাও দায়। লম্বমান

হয়ে পড়ে আছে প্রজ্বলন্ত পথ, মাঠঘাট সমস্তই নীরব। সকলেই নিদ্রিত অথবা নিদ্রার আয়োজনে ব্যস্ত। সবাই গায়ে টেনে নিয়েছে পাতলা চাদর। দুপুর বেলা এত অস্থির লাগে যে ঘুমানোই দায়।

বন্ধু, দুনিয়ায় অভাবের জ্বালা আছে দু'রকমের। জলের এবং নারীর! তোমার ভাগ্যে তার কোনোটাই যেন না জোটে।

এর কোনটা যে বেশী অসহ্য বলা শক্ত। মরুদেশে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলের জন্যে খুন করে বসতে পারে যে-কেউ। আবার, সাগর-পারের কোনো কোনো শহরের মানুষ একটি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী পেলে দিয়ে দিতে পারে তার যথাসর্বস্ব।

একদিন যেন পেরিয়ে গেলাম ধৈর্যের সীমা। ঘুম আসছে না কিছুতেই। সমস্ত গায়ে যেন ছুঁচ ফুটছে নিরন্তর। পাগলের মতো এপাশ ওপাশ করছি শুধু। উঠে এলাম বাইরে। জুলাইয়ের জ্বলন্ত বিকেল। বাঁধানো পাথরগুলি তেতে উঠেছে। দেখতে দেখতে ভিজে জামা গায়ে গায়ে লেগে গেল। নিচে নেমে এলাম সমুদ্রের কাছে। সুন্দর অববাহিকার তীরদেশ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম বন্দরটা। বেলাভূমিতে স্নানঘর রয়েছে অনেক। চারপাশে উচ্ছৃংখল পাহাড়, চূড়ায় চূড়ায় উঁচু খড়বন আর বিচিত্র-গন্ধী ঝোপঝাড়। সমুদ্র এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ধূসর পাহাড়ের কোলে কোলে। কোথাও জনপ্রাণী নেই। নিঃশব্দ নিস্পন্দ চারদিক। কোনো জন্তুর ডাক নেই, নেই পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দটুকু। হঠাৎ সেই কাচস্বচ্ছ সাগর-জলে আধো-ডোবানো একটা পাহাড়ের পেছন দিয়ে কি যেন নড়ে উঠল। ফিরে চাইলাম। তাপ-তপ্ত প্রহরে একটি দীর্ঘাংগী নগ্নদেহ-রমণী জলে বুক ডুবিয়ে স্নান-লীলায় মত্ত! একেবারে নিশ্চিন্ত যে এখানে সে একান্ত একেলা! তার মুখোমুখী সুদূর-বিস্তৃত সমুদ্র! সে এক অপূর্ব অপরূপ দৃশ্য! সাগর-জলে আধো-ডোবানো তার সুন্দর তনু,—তার উপর এসে লুটিয়ে পড়ছে অজস্র উজ্জ্বল আলো। সত্যিই সুন্দরী সে, চমকে দেবার মতোই সুন্দরী! দীর্ঘ সুঠাম নিটোল পেলব তনু, ঠিক মর্মর-প্রতিমার মতো! সে ঘুরতে গিয়েই চীৎকার করে উঠল এবং আধো-সাঁতার আর আধো-হাঁটার ভঙ্গীতে সরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল একটা শিলার আড়ালে। ভাবলাম, এখনি হ'ক বা কিছু পরেই হ'ক বেরিয়ে তো আসতেই হবে, চাঁদ! বেলাভূমিতে বসে তাই প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। সাবধানে খুব সতর্কতার সংগে শিলাটির

একপাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখা দিল কালো একটি মাথা, মুখের উপর ছড়িয়ে পড়া একরাশ এলোমেলো কালো চুল। আয়ত মুখ, বাঁকা দুটি বিপুল ওষ্ঠ, দীর্ঘ দুটি শাণিত চোখ! তার দেহ আফ্রিকার রোদে-জলে ঈষৎ কালো, পুরানো হাতীর দাঁতের মতো অটুট ও মসৃণ! স্পষ্টতই সে কোনো বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ-সম্ভবা।

'চলে যান!'—আমাকে বলল সে।

শক্তি-দৃপ্ত সঙ্গীতের মতোই সে কণ্ঠ, তার দেহশ্রীর মতোই শৌর্যময়।

আমি নড়বার নামও করছিনে।

'ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে থাকা আপনার উচিত নয়!'—বলল সে। উচ্চারণের মধ্যে 'র্‌ র্‌' শব্দ হচ্ছিল শকট-ঘর্ঘরের মতো। তবু উঠছি না আমি। মাথাটিও দেখা গেল না আর। তারপর চুপি চুপি ধীরে ধীরে বেরোতে লাগল তার চুল, কপাল ও চোখ দুটি। ছোট্ট একটি মেয়ের মতোই সে যেন লুকোচুরি খেলছিল, উঁকি মেরে দেখছিল আমাকে। স্পষ্টতই এবারে সে রেগে উঠেছে—'ঠাণ্ডার মধ্যে রেখে আমাকে মেরে ফেলতে চান নাকি?'

এবার উঠে গেলাম দূরে, বারবার অবশ্য পিছু ফিরে ফিরে! আমি বেশ খানিকটা দূরেই এসেছি দেখে নুয়ে নুয়ে সে উপরে উঠতে লাগল, আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। গুহার মতো একটা জায়গার আড়ালে গিয়ে জামা বিছিয়ে সে ঢেকে রাখল গুহার মুখটা।

পরের দিনও এসে বসেছি ঠিক সেই জায়গাটিতে। আজো সে জলে নেমেছে, কিন্তু পুরোপুরি সাঁতারু পোশাক প'রে। খিলখিল করে হেসে উঠল সে, আমার দিকে ঝলমলিয়ে দিল তার উজ্জ্বল দাঁত-গুলি। হপ্তাখানেকের মধ্যেই খুব বন্ধুত্ব জমে উঠল এবং পক্ষকালের মধ্যে আরো বেশী কিছু! নাম তার ম্যারুরোকা, নিশ্চিতই ডাক নাম। নামটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করল, সেখানে রয়েছে যেন ডজন খানেক 'র্‌'! এক স্পেনীয় ঔপনিবেশিকের মেয়ে সে। বিয়ে হয়েছে পম্মাবেজ নামে এক ফরাসীয়ের সাথে; সরকারী বিভাগে রয়েছেন তিনি। ঠিক কী যে করেন জানি না; তবে এটুকু ঠিকই জানি, কাজ থেকে তিনি ফুরসুৎ পান কমই। আমার জানবার কথাও অবশ্যি ওইটুকুই। কিছুদিন পর থেকে স্নানের সময় বদলে ফেলল সে। দুপুরবেলা আমার বাড়ী আসে মধ্যাহ্ন-বিশ্রামে। সত্যিই বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি সে! তার

চোখে জ্বলে কামনার আগুন ; তার ঈষৎ ফাঁক-হওয়া ঠোঁট দুটিতে, উজ্জ্বল ধারালো দাঁতে, তার অদ্ভুত হাসিতে পর্যন্ত বন্য কামনার ইশারা ; সমস্ত দেহ জুড়ে কেমন একটা হিংস্র লাবণ্য ! তার দীর্ঘাকার মোচার মতো স্তন দুটি সমস্ত দেহে ফুটিয়ে তুলেছে কেমন জান্তব রূপ,—করে তুলেছে তাকে মনুষ্যেতর হ'লেও বিশিষ্ট এক বিচিত্র জীবের মতো ! যেন উগ্র অবাধ কামনার তরঙ্গ-দোলায় দুলবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে তার। তাকে দেখে মনে পড়ে প্রাচীন পুরাণ-বর্ণিত কামপ্রবণ দেবদেবীর কথা,—বনে প্রান্তরে চলত যাদের অবাধ প্রণয়-লীলা !

রমণী কখনো এর চেয়ে বেশী কামোন্মত্তা হয়ে উঠতে পারে না। তার লীলাভঙ্গীতে জেগে উঠে নব নব মৃত্যুর ইশারা। মাঝে মাঝে হঠাৎ সে আমার দুই বাহুর মধ্যে অধৈর্য আবেগে ঝাঁকুনি মেরে উঠত—নতুন নতুন আলিঙ্গনের তীব্রতর উল্লাসে। অধরে জ্বলে উঠত নিবিড়তর চুম্বনের তপ্ত ক্ষুধা। অথচ তখনি কিন্তু তাকে মনে হ'ত একান্ত সহজ-সরল, তার সংগীতময় হাসিতে ফুটে উঠত স্বচ্ছন্দ ছেলেমানুষি। নিজের রূপের স্বভাব-সজাগ গর্বে ঘৃণার চোখে দেখত সে তার অঙ্গের ক্ষীণ আবরণটুকু পর্যন্ত ! সমস্ত ঘরময় সে ঘুরে বেড়াত নৃত্য-চঞ্চল শিশুর মতো—নির্বিকার এক নিশ্চিন্ত নির্লজ্জতায়। চীৎকার করতে করতে আর ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে দেহভার এলিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ত আমার পাশে, নিঝুম হয়ে পড়ে থাকত কোমল-গভীর ঘুমে। অসহ্য গরমে তার তামাটে দেহের উপর জমে উঠত অজস্র ঘর্মবিন্দু, সমস্ত দেহ থেকে বেরোতে থাকত কামনা-মদির গন্ধ !

মাঝে মাঝে তার স্বামীর কাজ পড়ত বাইরে, সে তখন ফিরে আসত আমার কাছে। একসংগে শুয়ে থাকতাম আমরা, দুজনের গায়ে লেগে থাকত শুধু একটা পাতলা চাদর। গ্রীষ্মাঞ্চলের মস্ত বড় চাঁদ উঠত আকাশে, উজ্জ্বল হয়ে উঠত সমস্ত শহর আর পাহাড়-ঘেরা অববাহিকা। শহরের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াত নিঃশব্দ ছায়ারা। নিভে যেত রুক্ষ আকাশের তীব্রতা। ম্যার্‌রোকা তখন জিদ ধরে বসত চাঁদের আলোয় নগ্ন তনু মেলে দেবার জন্যে। আফ্রিকা দেশের দিনের মতো সেই জ্যোৎস্নালোকেও তার দ্বিধা জাগত না কোনো। আশেপাশের লোকজন দেখবে কিনা তা নিয়েও মাথা ঘামাতে না কখনো। সভয়ে বারবার আমি নিষেধ করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সহজ উল্লাসে এক একবার সে

অদ্ভুতভাবে চীৎকার করে উঠত। তার সেই সুদীর্ঘ তীক্ষ্ন চীৎকার কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যেত স্তব্ধ রাতের বুকে, হঠাৎ ডেকে উঠত দূরের কুকুর !

একদিন সন্ধ্যারাতে নক্ষত্র-খচিত অসীম আকাশের তলে ঝিমুচ্ছিলাম ব'সে। সে এসে আমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসল এবং তার পরিপূর্ণ ওষ্ঠ দুটি আমার কানের কাছে এনে গুঞ্জরণের সুরে বলল—'আমাদের ওখানে আজ রাতে আমার সংগে শোবে তুমি।'

আমি তো অবাক,—'তোমাদের বাড়ীতে শোব ?'

'হ্যাঁ, কাল আমার স্বামী চলে যাবে, তুমি নেবে তার জায়গা।'

এবারে আমি না হেসে আর থাকতে পারলাম না,—'তুমিই তো আসছ, আমার যাবার আর কি দরকার ?'

এবার আমার মুখের এত কাছে মুখ রেখে সে কথা বলছিল যে তার জ্বালাময়ী উষ্ণ নিশ্বাস ঢুকছিল এসে আমার গলার মধ্যেও। সে বলল—'একটুকরো স্মৃতি থাকবে !' তখনো আমি কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, আসলে তার কথাটা কি। সে দুইবাহু দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল—'তুমি চলে গেলেও এই স্মৃতিটি থাকবে, আমার স্বামীকে যখন চুমো খাব, মনে করব সে তুমিই।'

কিছুটা নরম হয়ে এলাম এবং বেশ একটুখানি মজা পেয়ে আমিও ধীরে ধীরে বললাম—'আসলে, আজ তোমার মাথাই ঠিক নেই ; আমাদের এখানেই তো সুবিধে বেশী !'

সত্যি বলতে কি, কারো যুগল-শয়নে হাত বাড়াতে কোনোদিনই রুচি নেই আমার। সে জায়গা মনে করি ঘুঘুর ফাঁদ। বোকারাই ধরা পড়তে ছোটে সেখানে। কিন্তু ও কিছুতেই ছাড়ছে না, বারবার করে বলছে, মিনতি করছে,—এমন কি কাঁদতেই শুরু করল !

'তোমাকে কী যে শ্রদ্ধার চোখে দেখি, দেখাব তোমাকে।'

শ্রদ্ধা !—শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল যুদ্ধের ভেরীধ্বনির মতোই। আমার কাছে তার এই নতুন সাধটি এত বিচিত্র মনে হ'ল যে তার কোনো অর্থই খুঁজে পেলাম না। ভেবেচিন্তে বুঝলাম, হয়ত-বা স্বামীর উপরে তার প্রাণের আড়ালে রয়েছে তীব্র ঘৃণা, গোপনে গা ঢাকা দিয়ে আছে একটা নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা। এক প্রকারের মেয়েরা যেমন স্বামীকে প্রবঞ্চনা করে স্বামীর বাড়ীতে থেকেই, মজা করে অন্য পুরুষকে ঘরে এনে।

জিজ্ঞেস করলাম—'আচ্ছা, তোমার স্বামী কি তোমাকে ভালোবাসে না ?'

আমার দিকে সে চোখ মেলে চেয়ে রইল কঠিন ভৎ'সনার মতো ! 'তা নয়, ভালোবাসে।'

'তা হ'লে, তোমারি তার দিকে নজর নেই বলো ?'

আমার দিকে সবিস্ময়ে সে তার বড় বড় চোখ দুটি মেলে চেয়ে রইল—'না, তাও নয়, আমার নজর আছে খুবি। তাকে আমি ভালোবাসি, সত্যিই খুব ভালোবাসি, শুধু তোমার মতো এমন করে নয়,—তুমি আমার বুকের মালা !'

আমি বুঝলাম না তাকে তখনো আমার ধোঁকা লাগছিল। তবে, তার কাজ সে আদায় করে নেবেই।

তখনো কিন্তু অনড় আমি। একটি কথাও না বলে পোশাক পরে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

এক সপ্তাহের মধ্যেও ফিরল না আর। পুরো আটদিন বাদে এল সে, এবং বারান্দার দোরে পা রেখেই গম্ভীরমুখে বলল—'আমার ওখানে আমাদের বাড়ীতে আজ রাতে যাবে ? যদি না বলো তো এক্ষুনি ফিরে যাচ্ছি।'

একটা সপ্তাহ, বন্ধু, সোজা কথাটি নয়,—দীর্ঘ সাতটা দিন ! আফ্রিকায় বসে মনে হবে যেন লম্বা একটা মাস !

'নিশ্চয়ই যাব !'—দুবাহু বাড়িয়ে দিলাম এবং সেও বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রাত্রিতে একটা রাস্তার পাশে সে আমার প্রতীক্ষা করতে লাগল। তারপর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল তার বাড়ীতে।

তারা স্বামী-স্ত্রীতে থাকত ছোট্ট একটা নিচু বাড়ীতে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা ধবধবে দেয়াল। দেয়ালে ঝুলানো কয়েকটা ফোটো, কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো তাদের নিচের দিকটা। ম্যারুরোকা তো খুশিতে পাগল। আমাকে ঘিরে সে নাচ শুরু করে দিল ! 'আমার বাড়ীতে এসেছ তুমি, তুমি আমার বাড়ীতে !' আমিও এমনভাবে ধারণ করলাম যে সত্যিই আমি খুশি হয়েছি ; কিন্তু বুকে জেগে রইল কেমন একটা অস্বস্তি ও আশঙ্কা। এই অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে কিছুতেই জামা কাপড় ছাড়তে ভরসা হচ্ছিল না, কেউ যদি দেখে ফেলে তো সামলাবার পথ পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেও নাছোড়বান্দা ! কেড়ে নিল আমার

পোশাক, রেখে এল পাশের ঘরে। ঘুমোবার কথা মনে হয়নি। ঘণ্টা দুই পরে আমরা চমকে উঠলাম। বাইরের দোরে হঠাৎ ভয়ানক একটা শব্দ, কার যেন মোটা গলার আওয়াজ !

'ম্যাররোকা, আমি !'

একলাফে উঠে দাঁড়াল ম্যাররোকা।

'আমার স্বামী ! জলদি, খুব জলদি—খাটিয়ার নিচে ঢুকে পড়ো।'

দিশেহারার মতো ট্রাউজারটা পরছিলাম আমি, কিন্তু ম্যাররোকা সেই অবস্থাতেই আমায় ভেতরে ঠেলে দিল।

'শিগগির, শিগগির !'

দ্বিরুক্তি না করে হাতড়ে চলে এলাম খাটিয়ার নিচে। ম্যাররোকা প্রথমে গেল রান্নাঘরে, একটা আলমারি খুলে কি যে বা'র করল—সঠিক বুঝতে পারলাম না ! তাড়াতাড়ি সেটা লুকিয়ে রাখল এক কোণের একটা চেয়ারের উপর। তার স্বামী ওদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে, উচ্চকণ্ঠে বারবার ডাকছে।

'দেশলাইটা খুঁজে পাচ্ছি না……হ্যাঁ, পেয়েছি এবারে……এই যে খুলছি।'

দোরটা খুলে গেল, ভেতরে এল সে। আমি শুধু দেখতে পেলাম তার মস্তবড় পা জোড়া। দেহের অন্য অংশও যদি সেই অনুপাতে গঠিত হয়ে থাকে তো ঠিক একটা দৈত্যের মতোই হবে। কয়েকটা চুমোর আওয়াজ হ'ল, খালি গায়ের উপর আদর করার আওয়াজ হ'ল। হাত চাপড়ানো আর হাসির আওয়াজও এল। সবি শুনছি।

এবারে তার স্বামী বলল—'মানিব্যাগটা ফেলে গিয়েছিলাম, কাজেই আবার ফিরতে হ'ল। বাব্বাঃ, কি ঘুমটাই না ঘুমোচ্ছিলে !' ড্রয়ারের মধ্য থেকে ব্যাগটা খুঁজে পেতে কিছুটা দেরী হ'ল। ম্যাররোকা ইতিমধ্যে বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে দেহ, যেন খুবই ক্লান্ত সে। ভদ্রলোক ম্যাররোকার কাছে এসে তাকে আলিঙ্গন করতে ঝুঁকে পড়লেন। কিন্তু কপালে জুটল শুধু এক চোট 'র্-র্' ধ্বনির সঙ্গে খিটখিটে প্রত্যাখ্যান ! আমার লুকিয়ে থাকা জায়গা থেকে পা দুটো ছিল এত কাছে ! মনের মধ্যে অর্থহীন অদ্ভুত একটা ক্ষ্যাপামি ঠেলে ঠেলে উঠছিল বারবার,—পা দুটো আলগোছ ছুঁয়ে দিই একটু ! কিন্তু সামলে নিলাম।

ভদ্রলোক করতে গেলেন আদর, আর পেলেন কিনা এমনি-ধারা

প্রত্যাখ্যান ! আহতই হলেন ; তবু ভালোমানুষটির মতোই বললেন—'আজ যে বেজায় তেতে আছ ! আচ্ছা, আসি তাহ'লে—'

আবার একটি সশব্দ চুম্বন আর সংগেসংগেই পা জোড়ার অন্তর্ধান। ভদ্রলোকের শ্রীচরণযুগল দেখতে পাচ্ছিলাম তখনো, বড় বড় আঙ্গুলগুলো যেন ঠেলে উঠেছে জুতোর চামড়া। আবার বন্ধ হয়ে গেল বাইরের দোর। আমিও যেন ফিরে পেলাম প্রাণ।

হামাগুঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমার আশ্রয় থেকে। ভয়ে আধমরা দশা ! আর, ম্যারুরোকা আগের মতোই উলঙ্গ থেকে শুরু করে দিল নাচ—আমার চারপাশে ঘুরে ঘুরে। হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে সে যেন লুটোপুটি খেতে লাগল। আমি কোণের চেয়ারটায় বসতে গিয়েই আঁৎকে উঠলাম। ঠাণ্ডা কি-একটা জিনিষে ঘা লেগেছে ; কারণ আমিও ছিলাম আমার সঙ্গিনীর মতোই দিগম্বর। জিনিষটা কি দেখবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম। ছোট্ট একটা কাঠ-কাটা কুড়ুলি, একটা দিক ছুরির মতো ধারালো। কিন্তু এখানে এল কি ক'রে ? আগে ছিল না তো ! তড়াক্ করে আমায় লাফিয়ে উঠতে দেখে ম্যারুরোকা-কে পেয়ে গেল খুশির ক্ষ্যাপামিতে। হাসতে হাসতে কাশতে কাশতে দুহাতে পেট চেপে ধরে চীৎকার করতে করতে গড়িয়ে পড়ে আর কি ! অসময়ে এমন স্ফূর্তি আমার কাছে কেমন অশোভনই মনে হ'ল। জীবন-মরণ নিয়ে বোকার মতো এ কী মারাত্মক খেলা ! এখনো আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে নামছে হিম-শিহরণ। আমি বিরক্তই হলাম তার এই ক্ষ্যাপাহাসিতে।

'তোমার স্বামী যদি দেখে ফেলত আমাকে ?'

'কি আর হ'ত ?—'

'কি আর হ'ত ? খুব ভালোই হ'ত, না ? একটু নুয়ে পড়লেই তো সে আমাকে দেখে ফেলত।'

হঠাৎ থেমে গেল তার হাসি। বড় বড় চোখ দুটি মেলে একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। ইতিমধ্যেই তার দুই চোখে জ্বলে উঠেছে নতুন কামনার ক্ষুধা, কিন্তু মুখখানিতে লেগে আছে তখনো মৃদু একটি হাসি।

'কক্ষনোই তাকে নুয়ে পড়ে দেখতে হ'ত না।'—জবাব দিল।

বাধা দিলাম আমি—'তার টুপিটাই হয়ত পড়ে যেতে পারত, তখন তুলতে গেলেই দেখে ফেলত। কি দশাটাই না হ'ত আমার !'

সে তার সবল-নিটোল বাহু দুটি আমার কাঁধের উপর রেখে ফিসফিস করে বলল—'তাহ'লে তাকে আর উঠতে হ'ত না!'

'তার অর্থ' ?

এবার সে একচোখ বুজে আমাকে ইশারা করল; ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল আমি যে কেদারাটায় বসেছিলাম সেইদিকে। তার প্রসারিত বাহু, তার হাসি, তার আধোখোলা ওষ্ঠাধর, তার ঝকঝকে হিংস্র তীক্ষ্ন দাঁত,—সমস্ত কিছুরি ইঙ্গিত যেন কাঠ-কাটা সেই তীক্ষ্নধার কুড়ুলিটার দিকে। কুড়ুলিটাও ঝকঝক করছিল মোমবাতির আলোতে। সেই কুড়ুলিটাকে সে হাত বাড়িয়ে নিয়ে আসার মতো ভাব করল। বাঁ হাত দিয়ে আমাকে সে জড়িয়ে ধরল নিবিড়ভাবে, আর ডান হাত দিয়ে এমন একটা ভঙ্গী করল যেন সে নুয়ে-পড়া কোনো লোকেব মাথা কেটে ফেলছে!

বুঝলে হে বন্ধু, এমনিভাবেই এখানকার লোকেরা একই সংগে রক্ষা করে থাকে পরিণয়, প্রেম ও আতিথেয়তার মর্যাদা!

নারী ছলনাময়ী

'মেয়েদের তো ?'

'হ্যাঁ, মেয়েদের প্রসঙ্গে আপনি কি বলেন ?'

'তা, এমন সম্মোহিনী এমন চতুর জীব দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। কণামাত্র সুযোগ পেলেই তারা কারণে ও অকারণে পুরুষদের হাত করে বসে। কী উদ্দেশ্যে ? একটুখানি নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোবে, তাই ! এমন অসম্ভব সরলতা, এমন বিস্ময়কর সাহস ও এমন অপূর্ব উদ্ভাবনী প্রতিভার দৌলতে তারা এমন সব চাতুরী খেলে যা মুখে বলবার নয় ! সবাই ? হ্যাঁ, তারা সবাই ! ধর্মশীলা নিষ্ঠাবতী বা মার্জিত মহিলারাও তা, থেকে বাদ পড়েন না ! তা বলতে পারো, অনেক সময় বাধ্য হয়েই তাদের এমনটা করতে হয়। কারণ, গোঁয়ার পুরুষ অত্যাচারী পুরুষ বা মূর্খ পুরুষেরও তো অভাব নেই সংসারে। স্বামী দেবতা হয়ত পালঙ্কে বসে বসে স্ত্রীর উপরে সমানে আদেশ জারি করতে থাকবেন, স্ত্রীর উপরে খাটাতে যাবেন নানা কুমতলব। তখন বেচারী আর করে কি, স্বামীর আদেশ পালন করার সুযোগে (বা অছিলায়ও বলতে পারো) ঠকিয়ে ফেরে সেই স্বামীকেই ! কোনো জিনিস কিনলেই যদি স্বামীদেবতা আঁৎকে ওঠেন তো দামটা কমিয়েই বলতে হয় ! কিন্তু শেষ-ঘাটে ঠেকে পড়লে এমন কায়দা করে লক্ষ্মী মেয়েটির মতো সব ব্যাপার থেকেই এমন আলগা হয়ে দাঁড়ায় যে তাকে ধরে ফেলে কার সাধ্য ! সত্যিসত্যিই যদি ধরে ফেলা যায়-তো আমরাই থ খেয়ে যাই, ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে যাই, বলাবলি করি—

'তাই তো, তলে তলে এত !'

—কথাগুলি বলছিলেন এক অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রীমশাই, খুব নামজাদা এক শিক্ষিত লোক। তাঁর কথা শুনছিল বসে একদল যুবক।

তিনি বলে যাচ্ছিলেন :

একবার একটি অশিক্ষিত মেয়ে আমাকে অতি হাস্যকর উপায়ে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। তোমাদের শিক্ষার জন্যে ঘটনাটি বিবৃত করেছি :

তখন ছিলাম আমি বৈদেশিক মন্ত্রী। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে

শাঁজেলিজের বীথিপথ ধরে অনেকটা দূরে ঘুরে আসাই ছিল আমার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস। তখন বসন্তকাল। বেড়াতে বেড়াতে কচিপাতার মিঠে গন্ধ আগ্রহভরে টেনে নিচ্ছিলাম প্রতি নিশ্বাসে।

কিছুদিন থেকে একটি সুন্দরী মেয়ের সংগে দেখা হচ্ছিল। প্যারিস-মার্কা অনন্যসুন্দরী নয় অবশ্যি! কোমার খুব সরু, বুক অবশ্যি এত উঁচু যে চোখে লাগে। আমি আবার ভিনাসের প্রাণহীন মর্মর-প্রতিমার চেয়ে ঢের বেশী পছন্দ করি এই জাতীয় জীবন্ত প্রতিমাদের।

এই ধরণের মেয়েদের চরে বেড়ানোর হাবভাবও বেশ উপভোগ্য। এমন কি তাদের বেশবাসের একটুখানি খসখসানি পর্যন্ত যে কারুর পাকা হাড়ে ঝড় বইয়ে দেবে কামনার। পথ চলতে চলতে আমার দিকে সে একবার কটাক্ষ হানল। এই ধরণের জীবেরা কতরকম ভঙ্গীতেই যে চোখ ইশারা করে—তা তোমরা এখনো বুঝবে না।

একদিন ভোরবেলা দেখি কি, দুহাতে একখানা খোলা বই ধরে সে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে। আমি এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসলাম এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বন্ধুত্ব জমে উঠল। তারপর থেকে প্রত্যেক দিনই হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা বিনিময় হ'ত—'নমস্কার, মাদাম!' 'নমস্কার!' এবং তার পরেই গল্পসল্প। আত্মপরিচয় জানাল, সে হচ্ছে এক সরকারী কেরাণীর স্ত্রী, তার জীবনটা বড়ই দুঃখের, জীবনে কোনো আনন্দ নেই বললেই হয়—কেবল ভাবনা-চিন্তা, কেবল ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট।

আমিও তাকে দিলাম নিজের পরিচয়—কতকটা হাল্কা ভংগীতে, কতকটা গর্ববোধেও। সে কিন্তু খুবি বিস্মিত হবার ভাব দেখাল।

তার পরের দিন সে মন্ত্রীভবনে দেখা করতে এল এবং এত ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করে দিল যে দারোয়ানেরাও তাকে নিয়ে কাণাঘুষা করতে লাগল। মেয়েটির নাম রাখল তারা মাদাম লিয়ঁ, এবং লিয়ঁ হল আমারই নাম।

তিন মাসের প্রত্যেকটি দিন ভোরবেলাই তাকে দেখতে পেয়েছি, কিন্তু এক পলকের জন্যেও খারাপ লাগেনি। তার দেহসৌন্দর্যের সংগে সংগে সে মেলে ধরত নব নব বৈচিত্র্য, এত সুন্দর ছিল তার ভাবভঙ্গী! কিন্তু একদিন দেখতে পেলাম তার চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল, চাপা কান্নায় তখনো যেন তা ছলছল করছে, কথা বলতে পারছে না। কী যেন একটা গোপন পীড়নে সে উদ্‌ভ্রান্ত।

এমন সন্ত্রস্ত হবার কারণটা কী জানবার জন্য আমি তাকে অনুনয় করতে লাগলাম।

সে ভাঙা ভাঙা কথায় কাঁপতে কাঁপতে শেষপর্যন্ত বলল,—'আমি যে মা হ'তে যাচ্ছি!'

আঃ, সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। ও, তখন আমার মুখের চেহারাটা হ'ল কী যে ভয়ানক! আমার মুখ যে একেবারেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই জাতীয় একটুকরো খবর শুনলেই পুরুষদের যেমনটা হয়ে থাকে আর কি! এহেন অপ্রত্যাশিত পিতৃত্বের খবর পেলে বুকের ভিতরে কেমন যে একটা তীক্ষ্ণ কাঁটার খোঁচা লাগতে থাকে,—তা তোমরা ভাবতেও পারবে না। তা আজ না হ'ক, একদিন তো বুঝবেই। আজ যে আমার পালা! আমি হাঁপাতে লাগলাম—

'কিন্তু তুমি—তুমি তো বিবাহিতা! কি, তাই না?'

'তা তো, তবে গত দুমাস থেকে আমার স্বামী যে ইতালীতে, এবং শিগ্‌গির ফিরছেন না।'

'যে ভাবেই হ'ক, এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে হবে।'—আমি স্থির-কণ্ঠেই বললাম,—'শিগ্‌গির তুমি তার কাছে চলে যাও!'

তার গাল দুটি অমনি লাল হয়ে উঠল, চোখ দুটি নত করে সে অস্ফুট স্বরে বলল—'তবে—'

কথাটা যেন সে বলতে সাহস পাচ্ছে না, অথবা বলতে চাইছে না। আমিও ব্যাপারটা বুঝে সাবধানীর মতোই পথ-খরচাটা একটা খামে পুরে তার হাতে তুলে দিলাম।

আট দিন পরেই তার একটা চিঠি পেলাম—জেনোয়া থেকে। পরের সপ্তাহে ফ্লোরেন্স থেকে। তারপরে একে একে লেগহর্ণ, রোম ও নেপল্‌স্ থেকে।

লিখেছে ঃ

'প্রিয়তম, শরীর ভালোই আছে, তবে দেখতে কী যে ভয়ানক দেখাচ্ছে! এদিকটা থেকে খালাস হবার আগে তোমার সামনে আসব না কিছুতেই,—তুমি যে আমাকে তাহ'লে ভালোবাসবে না। আমার স্বামী কিছুই সন্দেহ করেননি। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে আরো কিছুদিন এদিকে থেকে যেতে হবে। প্রসবের আগে আর ফ্রান্সে ফিরছি

না।'

এবং প্রায় আট মাস পরে ভেনিস থেকে একটুকরো খবর : ছেলে হয়েছে।'

কিছুদিন পরে একদিন ভোরে হঠাৎ আমার ঘরে এসে ঢুকল—আগের চেয়ে আরো সুন্দর, আরো টকটকে। আমার দুইবাহুর মধ্যে সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাদের আগের যোগাযোগ শুরু হ'ল আবার।

মন্ত্রীবিভাগ থেকে পদত্যাগ করলাম এবং সেও আমার বাগানবাড়ীতে আসত। প্রায়ই সে তার ছেলের কথা বলত। কিন্তু তার কথায় কান দিতাম না। আমার কি তাতে! মাঝে মাঝে আমি তার হাত ভরে টাকা দিয়ে বলতাম—'ওর জন্যে তুলে রেখো।'

আরো বছর দুই কাটল। দিনে দিনে সে তার ছেলের—তার ছোট্ট লিয়-র কথা বলতে অধীর হয়ে ওঠে।

কখনো বা কাঁদতে কাঁদতে বলে—'ছেলেটার দিকে একটুও দৃষ্টি নেই তোমার, একটুও যত্ন নেই। তুমি যদি বুঝতে আমি এতে কত ব্যথা পাই।'

তার কাকুতি মিনতিতে শেষপর্যন্ত এত বিব্রত হয়ে উঠলাম যে কথা দিতে হ'ল, সামনের দিন ভোরবেলা সে যখন ছেলেকে নিয়ে সাঁজেলিজে হাওয়া খেতে যাবে তখন আমিও যাব।

কিন্তু বাড়ী থেকে রওনা হতেই হঠাৎ শঙ্কাভরে থমকে দাঁড়ালাম। মানুষ দুর্বল, মানুষ বোকা। ছোট্ট ছেলেটিকে দেখে সত্যিই যদি মায়া হয়,—আমি তো তারি বাবা, সে তো আমারি ছেলে!

মাথায় টুপি পরে নিয়েছিলাম, হাতে দস্তানা। টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম চেয়ারের উপর, দস্তানাটা টেবিলে—'না, কক্ষনো যাব না আমি, না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

তখনি হঠাৎ খুলে গেল আমার ঘরের দরজাটা। আমার ভাই ঘরে ঢুকে আমার হাতে একটা বেনামা চিঠি দিল, সেদিন ভোরেই পেয়েছে। চিঠিতে লেখা—

'আপনার ভাই লিয়কে সজাগ করে দিন, মেয়েটি কিন্তু তাকে নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। অভদ্রভাবে উপহাস করছে। মেয়েটির প্রসঙ্গে তিনি যেন আরো কিছুটা খোঁজখবর নিয়ে নেন।'

আমার এই প্রণয়-ব্যাপার কাউকেই বলিনি, আবার ভাইকে আগাগোড়া খুলে বললাম।

'দেখো আমি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে আর বেশী দূর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না ; কিন্তু ভালোমানুষটির মতো তুমিই একবার গিয়ে দেখো না ব্যাপারখানা কী ?'

আমার ভাই চলে গেলে আমি একা বসে ভাবছিলাম—'কিভাবেই বা সে আমাকে ঠকাতে পারে ? আরো প্রণয়ী আছে তার ? আমার তাতে কী বা আসে যায় ! সে সুন্দরী, তরুণী, রসালো যুবতী। এবং এর চেয়ে বেশী কিছুই তো আমি তার কাছ থেকে আশা করিনি। সে আমাকে ভালোবেসেছে বলেই মনে হয়। আর মোটকথা, তার জন্যে আমার তেমন একটা কিছু খরচও হয় না। সত্যিই, এসব ব্যাপার বুঝিনে আমি।'

আমার ভাই ফিরে এল তাড়াতাড়িই। মেয়েটির স্বামীর সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য সবি জেনে এসেছে। স্বরাষ্ট্র-বিভাগের কেরাণী, সচ্চরিত্র, ছিমছাম, ভাবুক প্রকৃতির লোক—কিন্তু স্ত্রীটি হ'ল খুবি সুন্দরী ! অবস্থার কথা বিচার করলে, স্ত্রীর দৌড় সামলানো তার মতো লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ব্যস, এই পর্যন্ত।

তারপর আমার ভাই খুঁজে খুঁজে তাদের বাড়ী এল, কিন্তু মেয়েটি বাড়ী নেই জেনে দারোয়ানের হাতে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিয়ে অনেক কথা আদায় করে নিল : 'নাদাম দ্য···খুবি সম্ভ্রান্ত মহিলা। দেমাক নেই, টাকাকড়িও অবশ্যি নেই,—তবে দিলটা খুবি বড়।'

আমার ভাই খোঁজখবর নেবার সুরেই বলল,—'ছেলেটি এখন বোধ হয় বেশ বড়সড় হয়েছে।'

'কি বলছেন, তাঁর তো ছেলেই নেই !'

'কেন, লিয়ঁ ?'

'না বাবু, আপনি ভুল করছেন।'

আমার ভাই তো অবাক ! নতুন করে সে প্রশ্ন করতে থাকে। অনুসন্ধান শেষ হ'ল। না, কোনো সন্তান হয়নি, কোথাও বেড়ানোও হয়নি !

আমি কিন্তু ঘাবড়ে গেলাম ভয়ানক। কিন্তু এই মিলন-পর্বের শেষ-অঙ্কের মাথামুণ্ডু কিছুই মাথায় ঢুকল না।

'না, আমার মনটা এসব থেকে একেবারেই খোলাসা রাখতে চাই।'—ভাইকে বললাম,—'কালকেই তাকে এখানে আসতে বলবে এবং আমার বদলে তুমিই তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। যদি আমাকে সে ঠকাতে পেরে থাকে তবে এই তিন হাজার টাকা তাকে দিয়ে দেবে এবং বলবে তার সংগে দেখাশোনাও এইখানেই শেষ! সত্যিই, এবারে মনে হচ্ছে তাকে নিয়ে যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।'

তোমরা বিশ্বাস করবে কি, এই মেয়েলোকটির সংগে ঘনিষ্ঠতার ফলে সন্তান হ'ল ব'লে কালরাতে দুঃখিত হয়েছিলাম, কিন্তু আজ তার সংগের সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেল বলে যেন বিরক্ত লজ্জিত, এমন কি আহতই বোধ করলাম। হ্যাঁ, এবারে মুক্ত আমি, সমস্ত দায়িত্ব—সব রকমের দুর্ভাবনা থেকেই মুক্ত! তবু সে আমাকে যে অবস্থায় এনে দাঁড় করেয়েছিল সে জন্যে মনে মনে ঠেলে উঠছিল প্রবল বিক্ষোভ।

পরদিন ভোরবেলা আমার ভাই আমার পড়বার ঘরে তার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল। মেয়েটি ঘরে ঢুকেই দুবাহু বাড়িয়ে দিল, কিন্তু কে বসে আছে দেখে থমকে সরে দাঁড়াল।

'আমার ভাইয়ের বদলে আমি রয়েছি বলে মাফ করবেন। তিনিই আমাকে আপনার কাছ থেকে কয়েকটি কৈফিয়ৎ তলব করার অধিকার দিয়েছেন। কারণ, তাঁর নিজের পক্ষে আপনার কাছ থেকে সেকথা জানা খুবি মর্মান্তিক হবে।'

তারপর তার মুখের উপর গোয়েন্দা-দৃষ্টি রেখে আমার ভাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল—

'আমরা জানি, আমার ভাইয়ের দ্বারা আপনার কোনো সন্তান হয়নি।'

কয়েক পলকের মধ্যেই বিস্মিত ও বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠে সে আবার সহজ হয়ে এল এবং একটা চেয়ারে বসে নিয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে রইল আমার ভাইয়ের দিকে,—যে তারই বিচার করতে বসেছে!

মেয়েটি কিন্তু সহজভাবেই জবাব দিল—

'না, কোনো সন্তান হয়নি তো।'

'আমরা আরো জানি, আপনি কোনোদিন ইতালী যাননি।'

এবারে সে সত্যি সত্যি খিলখিল করে হেসে উঠল—

'না, ইতালীও যাইনি কখনো।'

আমার ভাই বিহ্বলের মতো বলতে লাগল—

'কোঁৎ দ্য লিয়' আপনাকে এই টাকাটা দিয়ে দিতে অনুরোধ করছেন এবং বলেছেন এইসংগেই সমস্ত সম্পর্ক শেষ।'

আবার সে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল এবং ধীরে ধীরে টাকাটা রাখল পকেটে। তারপরে সম্ভ্রান্ত সুরে জানতে চাইল—'তাহ'লে, কোঁতের সংগে আমার আর দেখা হবে না?'

'না, মাদাম।'

এবারে তাকে যেন বিব্রত দেখাতে লাগল, আবেগহীন কণ্ঠে বলল— 'কী আর করা যাবে বলুন। তবে আমি তাকে খুবি ভালোবাসতাম।'

এত তাড়াতাড়ি একটা স্থির সিদ্ধান্তে পোঁছতে দেখে আমার ভাই মৃদু হেসে তাকে জিজ্ঞেস করল—

'আচ্ছা বলুন তো, ব্যাপারটাকে এত জটিল করে তুললেন কেন? এমন কি ইতালী যাওয়া, ছেলে হওয়া—সমস্ত কিছু টেনে এনে সমস্যা আরো জটিল করার কারণটা কি?'

বিস্মিতভাবে সে আমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল,—আমার ভাই যেন বোকার মতো প্রশ্ন করে বসেছে! জবাব দিল—

'কী আশ্চর্য! এ কি বলছেন? আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন আমার মতো সাধারণ একটা মেয়েলোকের পক্ষে—যে একটা কিছুই নয় তার পক্ষে কোঁৎ দ্য লিয়'র মতো একজন নামজাদা মার্জিত রুচিসম্পন্ন সুদর্শন ধনী ভদ্রলোককে প্রায় তিনটা বছর ধরে হাতে রাখা কি এতই সহজ? সেজন্যে একটুখানি কষ্ট স্বীকার করাও কি দরকার নেই? অ, এখন অবশ্যি সবি ফেঁসে গেল। কী আর করা যাবে। চিরদিন তো টিঁকত না ঠিকই। তবু, তিনটা বছর তো হাতে ঘুরিয়েছি। আপনি আমার দিক থেকে সবকথা বলবেন তাঁকে।'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। আমার ভাই তখনো তাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে—

'কিন্তু, কিন্তু ছেলেটা? একটা ছেলে দেখাতেন তো?'

'নিশ্চয়ই, আমারা বোনের ছেলে। আমার বোনই তাকে আমার কাছে দিয়েছিল। আর, হলফ করে বলছি আমি—আপনাদের সব খবরাখবর দিয়েছে সে-ই।'

'আচ্ছা বেশ, ইতালীর চিঠিগুলি?'

আবার সে চেয়ারে বসে পড়ল, দিল খুলে একটুখানি হেসে নেবে।

'ও, সেই চিঠিগুলি? তা,—ওকে তো কয়েকটা বিদেশী-সৌন্দর্যের কবিতার টুকরো বললেই হয়। কোঁৎ-কে তো আর শুধু শুধু বৈদেশিক মন্ত্রী করা হয়নি!'

'কিন্তু আর একটা বিষয়?'

'ও, সেটা আমার গোপন বিষয়! তা নিয়ে কারো সঙ্গেই আমি বোঝাপড়া করতে চাইনে।'

বিদ্রূপ হাসির সঙ্গে আমার ভাইকে অভিবাদন জানিয়ে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল, বেশ সহজভাবেই! ঠিক একটি অভিনেত্রী যেন শেষাঙ্ক অবধি তার অভিনয় শেষ করল নিখুঁতভাবেই।

এরপর কোঁৎ দ্য লিয়' উপদেশের সুরে যোগ করে দিল—'কাজেই বুঝলে তোমরা, একটু বুঝেসুঝে এই ধরণের ঘুঘুদের নিজে .কাজ কারবার ক'রো।'

ইশারা

শয়ন-কক্ষের সুরভিত অন্ধকারে অভিজাত মহিলা শ্রীমতী রেনেদাঁ তখনো ঘুমে বিভোর।

কোমল শয্যায় মোলায়েম চাদরের আদরে আলিঙ্গনের মাঝে একেলা ঘুমিয়ে আছে সে অপরূপ ভঙ্গিমায়। বিবাহ-বিচ্ছিন্ন নারীর গভীর ঘুম।

নীলাভ ড্রয়িংরুমে কার উচ্চকণ্ঠের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে জেগে উঠল রেনেদাঁ,—ধনী বান্ধবী জুলির গলা নয়? পরিচারিকাটি কিছুতেই তাকে এই শোবার ঘরে ঢুকতে দেবে না, তাই তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। কাজেই রেনেদাঁ উঠে দোরটা খুলে পর্দাটা সরিয়ে বার করে দেয় নিজের মুখখানি—একরাশ সোনালী চুলে ঢাকা কী সুন্দর একখানি মুখ।

'ব্যাপার কি, এত সকালে যে? নটাও তো বাজে নি।'

শুকিয়ে মলিন হয়ে আছে শ্রীমতী জুলির মুখখানি, যেন জ্বর-বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছে এমনভাবেই বিড়বিড় করে বলল সে—

'তোমার কাছে সবি বলব, আমার জীবনে কাল ভয়ানক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।'

'আগে ভেতরে এস!'

ভিতরে ঢুকতেই এ ওকে আলিংগন করে ধরল, তারপর বসল এসে বিছানায়। পরিচারিকাটি এসে জানালাগুলি ভালো করে খুলে দিয়ে গেল,—ভেতরে আলো-হাওয়া খেলবে। রেনেদাঁ এবারে জিজ্ঞাসা করল, —'তারপর, ব্যাপার কি বলো তো?'

শ্রীমতী জুলি হঠাৎ কাঁদতে লাগল, ঝরতে লাগল মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু। সুন্দরী মেয়েদের তাতে বরং আরো বেশী সুন্দর দেখায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সে,—কিন্তু চোখ দুটি লাল হবার ভয়ে রগড়াল না।

'দেখো ভাই, কি বিশ্রী ব্যাপারই না ঘটে গেল! সারাটি রাত ঘুমুতে পারিনি, একটি পলকের জন্যেও নয়,—বুঝতে পারছ, একটি পলকও নয়! এই এখানে, বুকে হাত দিয়ে দেখো কি রকম টিপ্ টিপ্ করছে এখনো!'

বান্ধবীর হাতখানা নিয়ে সে নিজের বুকের উপরে চেপে ধরল, নারীপ্রাণের পীনোন্নত আবরণটির উপরে,—পুরুষেরা যা হাতে পেলে স্বর্গ পায় এবং তার তলদেশে কী যে পদার্থ আছে খুঁজে দেখারো চেষ্টা করে না! তবে সত্যিসত্যি কিন্তু শ্রীমতী জুলির বুক টিপ্ টিপ্ করে কাঁপছিল।

বলতে লাগল শ্রীমতী জুলি ঃ

কাল বিকেল বেলায়, চারটে কি সাড়ে চারটে হবে—সঠিক সময় বলতে পারব না। আমার সবি তো জান তুমি—সেই যে ছোট্ট ড্রয়িংরুমটি যেখানে বসে বসে আমি স্টেশনের দিকে তাকিয়ে থাকি,—তার জানালার কাছে বসে দেখছিলাম রাস্তার লোকজনের চলাফেরা।

এটা আমার একটা বাতিক বলতে পারো! স্টেশন-পাড়াটায় এত কোলাহল,—চারিদিকে বইছে যেন প্রাণের ঝড়। ঠিক যেমনটা পছন্দ করি আমি। কালকেও বসে ছিলাম। জানালাটা ছিল খোলা ; বিশেষ কিছুই ভাবছিলাম না। মিঠে হাওয়া ভারী ভালো লাগছিল। কাল দিনটা কেমন চমৎকার গেছে না? হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার ওপারেই জানলায় বসে আছে একটা মেয়ে। লাল পোশাক পরা। আমার পরনে ছিল ফিকে রঙের। তুমি জানো ঐ রঙটা আমার বড় প্রিয়। ঐ মেয়েলোকটিকে চিনতাম না আমি, মাসখানেক হবে নতুন এসেছে। এক-মাস ধরে অবিরত বর্ষা হয়েছে বলে আগে আর চোখে পড়েনি ; কিন্তু সেদিন দেখেই চিনলাম সে ভালো মেয়েমানুষ নয়। প্রথমটা খুবি আহত হলাম, বিরক্ত হলাম। ঠিক আমার বাড়ীর সামনেই থাকে কিনা অমন একটা মেয়েমানুষ। তারপর অবশ্য দিন দিন দেখতে দেখতে কৌতূহল কেমন বেড়ে উঠল। জানলার উঁচু জায়গাতে কনুই রেখে সে রাস্তার সব পুরুষদের দিকে তাকাচ্ছিল। পুরুষদের চোখও ছিল তার দিকে,—সকলের না হ'লেও প্রায় সকলেরই বলা চলে। এ বাড়ীটার সামনে এগোতেই তারা কেমন করে যেন মেয়েটিকে চিনতে পারে—যেন গন্ধ পায়! কুকুর যেমন শিকারের গন্ধ পায়। কারণ, হঠাৎ তারা সেই মেয়েটির সঙ্গে চকিত-দৃষ্টি বিনিময় করে। মেয়েটির চোখ বলে—'আসবেন কি?' পথের জবাব—'সময় নেই!' 'আজ নয়, আর এক দিন!' 'পকেট গড়ের মাঠ!' অথবা 'মরগে মুখপুড়ী!'

এমনি ধরণের কারবার করা যে কেমন মজার ভাবতেও পারবে না।

অথচ এই কারবারই করে সে ফি-রোজ।

হঠাৎ কখনো সে জানালা বন্ধ করে দেয়, অমনি এক ভদ্রলোক গিয়ে ঢুকে পড়ে ভিতরে। ঠিক যেন এক জেলে বঁড়শি দিয়ে গেঁথে ফেলল মস্ত একটা মাছ! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছি দশ বারো মিনিটের বেশী দেরী করে না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি কিন্তু আমাকে একেবারেই সম্মোহিত করে ফেলল। সেই শয়তানীটা ঠিক যেন পেতেছে একটা মাকড়সার জাল। সত্যিই, যাকে বলে নোংরা জীব!

ভাবছিলাম, আচ্ছা এত তাড়াতাড়ি অথচ এত নিখুঁত ভাবে কি করে সে নিজের উদ্দেশ্যটি বুঝিয়ে দেয়? মাথা নেড়ে ডাকে, না চোখের সঙ্গে সঙ্গে আঙুলের ইশারা করে? একটা দূরবীণ নিলাম—তার কার্য-কলাপ ভালো করে দেখবার জন্যে। ও, খুবি তো সহজ ব্যাপার। প্রথমে একটু চাউনি, তারপরেই একটুকরো হাসি, সঙ্গেসঙ্গেই মাথা নেড়ে একটু ইঙ্গিত—'তা, উপরে আসবেন কি?' কিন্তু এই ইংগিতটুকুই এত অলক্ষ্য এত অস্ফুট এবং এত সূক্ষ্ম যে তার মতো অমন নিখুঁত ভাবে তা করতে গেলে বেশ কিছুটা কায়দা জানা দরকার। আমিও কি অমন একটু ইশারা করতে পারি না?—অবাক হয়ে ভাবছিলাম। ঠিক ঐ রকম নিচে থেকে উপরের দিকে অমন সাহসের সংগে—ঠিক ঐ মেয়েটির মতো! সত্যিসত্যিই সেই ভংগীটি এত মনোরম!

ভিতরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রিহার্সেল দিয়ে দেখলাম। বুঝলে বন্ধু, তার চেয়েও সুন্দর হ'ল আমার ভংগীটি,—ঢের বেশী সুন্দর! আমি নিজেই তা দেখে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

না, সে এখন আর কাউকেই গাঁথতে পারবে না। হায় বেচারী, আর একটিকেও নয়! ভাগ্যচক্রই যে ঘুরে গেল তার! ঐভাবে জীবিকা উপার্জন করা সত্যিই খুব নিদারুণ,—অথচ বেশ মজার কিন্তু! কারণ, রাস্তার লোকেদের মধ্যে অনেকেই থাকেন সত্যি বেশ চমৎকার! এবার থেকে সবাই আমার দিকের ফুটপাত দিয়ে যাতায়াত শুরু করে দিল। ঐ দিক দিয়ে একটিও নয়। সূর্য ঘুরে গেল উল্টো দিকে! একে একে আসে তারা—যুবক বৃদ্ধ, কালো ফর্সা, তমাটে শ্যাম—কতরকম। কয়েকজনকে পেলাম ভারী সুন্দর! সত্যি বন্ধু, আমার বা তোমার স্বামীর চেয়েও, তোমার পরিত্যক্ত স্বামীর চেয়েও,—তা তুমি তো এখন বিবাহ-বিচ্ছেদ করে বসে আছ। বাঃ বেশ কিন্তু,—এবারে যাকে খুশি

বেছে নিতে পারো।

মনে মনে ভাবছিলাম, আমি তো সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রী,—আমি যদি ও-রকম ইশারা করি তো বুঝতে পারবে? একবার আমিও পরীক্ষা করে দেখি না। এই পাগলামিতেই পেয়ে বসল। সে একটা অবাধ্য কামনা, দুরন্ত কামনা,—যে কামনার রাশ টেনে ধরবার শক্তি নেই কারো। আমি মাঝে মাঝে ঠিক ঐরকমটাই অনুভব করে থাকি। সত্যি, এসব খুব ছেলেমানুষি, না? আমরা মেয়েমানুষেরা নাকি (সত্যিসত্যি এক ডাক্তার বলছে আমাকে) হুবহু বানরের মতো। সত্যিই আমরা কিন্তু এটা সেটা অনুকরণ করি শুধু! স্বামীকে ভালোবাসলে বিয়ের পরে কয়েক মাস চলে শুধু তারি অনুকরণ; তারপর চলে প্রেমিকদের, বান্ধবীদের এবং সাধুবাবাদের—অবশ্য লোক যদি ভালো হন। আমরা অনুসরণ করি তাদের চিন্তাধারা তাদের কথাবার্তার কায়দা তাদের হাবভাব,—তাদের সবকিছু! আচ্ছা বোকা কিন্তু।

আমার কথা হ'ল, কোনো কিছু করবার লোভ হ'লে আমি না করে পারি না। কাজেই আপন মনেই বলছিলাম, একবার পরীক্ষা করে দেখিই না, কেবলমাত্র একটি লোকের উপর। একটিবার দেখব শুধু, কী আর হবে আমার? কিছুই না! শুধু একটুখানি হাসির বিনিময়, ব্যস সেখানেই সব শেষ। তারপর এমন ভাব দেখাব যেন কিচ্ছুটি জানি না, আগের সব কিছুই বাতিল করে দেব।

কাজেই বাছতে শুরু করলাম। খুব সুন্দর কাউকেই চাই আমি, খুব সুন্দর। হঠাৎ দেখতে পেলাম, দীর্ঘাঙ্গ গৌরবর্ণ এক সুশ্রী ভদ্রলোক এগিয়ে আসছে একা। সুপুরুষদের উপর আমার বরাবরের লোভ, তুমি জানো তা। তার দিকে তাকালাম, সে আমার দিকে: আমি হাসলাম, সেও হাসল। তারপর করলাম সেই ভংগীটি,—হ্যাঁ, খুব আস্তে। সেও ঘাড় নেড়ে জানাল—'আসছি'। তখন বুঝলে বন্ধু, সে স্বয়ং এসে হাজির। ভিতরে ঢুকছে আমাদের মস্ত বাড়ীটার দোর দিয়ে।

তখন আমার ভেতরে কেমন হচ্ছে তা ভাবতেও পারবে না। মনে হল এক্ষুনি আমি পাগল হয়ে যাব। ওঃ, কী যে ভয় হচ্ছিল আমার—একবার ভেবে দেখো: চাকরটার কাছে এসে গেছে সে—জোসেফের কাছে, এবং সে হচ্ছে আমার স্বামীর একান্ত অনুগত। জোসেফ নিশ্চয়ই ভাবছে, বহুদিন থেকেই ঐ ভদ্রলোকের সংগে আমার মেলামেশা।

বলো তুমি, তখন আমি কী করতে পারি বলো ; অথচ তক্ষুনি সে কলিংবেল বাজাবে। আমি কী করি বলো। ভাবলাম, নিচে গিয়ে দেখা করি ; বলি—আসলে তিনি ভুল করেছেন, তাঁকে মিনতি করি চলে যাবার জন্যে। অসহায় নারীর উপর নিশ্চয়ই করুণা হবে তাঁর। কাজেই ছুটে গিয়ে দোরটা খুলে দিলাম, ঠিক তখনি সে কলিং-বেল বাজাতে যাচ্ছিল। আমি হুঁচোট খেয়ে এগোতে এগোতে কেমন বিমূঢ়ের মতোই বলছিলাম —'চলে যান, স্যর ! দয়া করে চলে যান, আপনি ভুল করেছেন, ভয়ানক ভুল করেছেন। আপনাকে আমার এক বন্ধু বলে মনে করেছিলাম—ঠিক আপনার মতোই দেখতে সে। আমার উপর করুণা করুণ স্যর, চলে যান।'

কিন্তু সে শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, বলল—'বহুৎ আচ্ছা, পিয়ারী আমার ! তোমার এই স্বভাবের কথা জানি আমি, নিশ্চিন্ত থাকো। বিবাহিতা তুমি, কাজেই কিছু বেশী—এই তো ! আচ্ছা বেশ, তুমি তা পাবে, এবার নিয়ে চলো তো।'

সে তখন আমাকে ভিতরে ঠেলে এনে দোরটা বন্ধ করে দিল। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তার সামনে। সে আমাকে চুমু খেল, আমার কোমরটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আমায় নিয়ে এলো ড্রইংরুমে, দোরটা খোলাই পড়ে রইল। তারপর সে সব জিনিষের উপর চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল—নীলামের খরিদ্দারের মতো। 'বাঃ ভারী সুন্দর তো তোমার ঘরটা, খুব সুন্দর ! এই শহরে তোমার বুঝি একটু খারাপ যাচ্ছে, না ? তাই জানালার কারবার শুরু করেছ !'

আমি তখন আবার তাকে মিনতি করতে লাগলাম,—'স্যর, চলে যান, অনুগ্রহ করে চলে যান, আমার স্বামী এখনি এসে পড়বে, আসার সময় হয়েছে। আমি দিব্যি দিয়ে বলছি, সত্যিই আপনি ভুল করেছেন।' সে কিন্তু খুব শান্তভাবেই বলল—'এস পিয়ারী আমার, অনেক তো বলেছ, আর কেন ? তোমার স্বামী যদি আসেই তো পাঁচটা টাকা হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দেব ঐ সামনের কাফেটাতে, আরামে খেয়ে দেয়ে আসবে' তখন দেয়ালের একটা ফোটো দেখে জিজ্ঞেস করল—'ঐ কি তোমার—মানে—তোমার স্বামী ?'

'হ্যাঁ'

'বেশ একটু কেমন ধরণের লোক ! আর, ওটি কে ? তোমার কোনো বান্ধবী বুঝি ?'

সেটা হ'ল তোমার ফটো, সেই বল-নাচের পোশাকে।' মাথামুণ্ডু কি যে বললাম কিছুই বুঝতে পারলাম না, থতমত খেয়ে বললাম—'হ্যাঁ' আমার এক বান্ধবী।'

'খুব সুন্দরী তো। তুমি এর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিও।'

তখন ঠিক পাঁচটা। রাওল বাড়ী আসে সাড়ে পাঁচটায়। ভাবলাম এ চলে যাবার আগেই যদি সে এসে পড়ে তখন কি হবে! তখন—তখন —আমার মাথাই ঘুরে গেল,—আমি—আমি ভাবলাম—এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হবে এই লোকটির কাছ থেকে যত শিগ্‌গির মুক্তি পাই—যত শিগ্‌গির হয়—যত তাড়াতাড়ি হয়—বুঝতে পারছ ?

* * * *

অভিজাত মহিলা শ্রীমতী রেনেদা হাসতে শুরু করল, বালিশে মাথা গুঁজে পাগলের মতো হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগল, মহামূল্য পালঙ্ক কাঁপতে লাগল তার হাসির চোটে। একটু শান্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল—

'আচ্ছা—দেখতে ভালো সে ?'

'হ্যাঁ।'

'তবুও তোমার আপত্তি ? তোমার মন ওঠেনি !'

'কিন্তু—কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, বন্ধু। সে বলেছে,— আবার আসবে—কালই—ঠিক ঐ সময়েই। আমি তো ভয়ানক ভয় খেয়ে গেছি—তোমার ধারণাই নেই কি রকম একজেদী—কি রকম জবরদস্ত সে। বলো আমি কী করব,—বলো কী করতে পারি ?'

শ্রীমতী রেনেদা ভেবে দেখবার জন্যে সোজা হয়ে বিছানায় উঠে বসল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল—

'গ্রেফ্‌তার করাও !'

মিসেস্ জুলি যেন ঘাবড়ে গেল, থতমত খেয়ে বলল,—'বলছ কি তুমি! কী যে ভাবো! গ্রেফ্‌তার করব ? কোন অজুহাত ?'

'তা সহজ ব্যাপার। থানায় গিয়ে বলবে—এক ভদ্রলোক মাস তিনেক থেকে তোমাকে কেবল অনুসরণ করছে এবং সে এমন বেয়াদব যে কালকে তোমার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে এবং কাল আবার আসবে বলে ভয় দেখিয়ে গেছে। তাই তুমি আদালতের সাহায্য চাইছ। তখন তারাই কয়েকজন পুলিশ পাঠিয়ে দেবে তোমার সঙ্গে এবং তাকে গ্রেফ্‌তার

করে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু বন্ধু, মনে করো, সে যদি বলে দেয় যে—'

'ও, সেকথা বিশ্বাস করবে না কেউ। কী যে বোকামি করছ! তুমি যদি কায়দা করে পুলিশ কমিশনারের কছে তোমার কথা বলতে পারো তো তোমাকেই বিশ্বাস করবে তারা। দৃশ্যতই তোমার চরিত্র নির্মল, আর তা ছাড়া সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রী তুমি।'

'কক্ষনো আমার এমন সাহস হবে না।'

'কিন্তু সে সাহস তোমাকে করতেই হবে—নইলেই গেছ!'

'কিন্তু ভেবে দেখো, গ্রেফতার হ'লে সে—সে আমাকে অপমান করতে ছাড়বে?'

'তা, তোমারো সাক্ষী থাকবে এবং সে অভিযুক্ত হবেই।'

'অভিযুক্ত হবে?'

'হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যে। এসব ব্যাপারে নির্দয় হওয়া দরকার।'

'ক্ষতিপূরণের কথা ভাবছি না তো, একটা বিষয় আমাকে ভয়ানক পীড়া দিচ্ছে,—কাঁটার মতো খোঁচা মারছে। বিশটা টাকা রেখে গেছে টেবিলের উপর।'

'বিশটা টাকা?'

'হ্যাঁ।'

'বেশী নয়?'

'না।'

'এত কম! এতে কিন্তু আমারো অপমান লাগত! আচ্ছা তো?'

'তা, এখন ঐ টাকাটা দিয়ে কী করি?'

শ্রীমতী রেনেদা দ্বিধাভরে কয়েক পলক কি যেন চিন্তা করল, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল—

'হ্যাঁ, ও দিয়ে একটা—একটা উপহার দাও তোমার স্বামীকে; তাই হবে সবচেয়ে ভালো।'

মুক্তোর দুল

আমার এক হতভাগ্য বন্ধু তার জীবনের যে কাহিনীটি বলেছিল তা এই

সারাদিনের খাটুনির পরেও রাত জেগে জেগে কাজ করে রোজগার বাড়িয়েছিলাম, দু-চারটে করে টাকা জমিয়েছিলাম। কেন? প্রেয়সীর এটা-সেটা ইচ্ছে ছোট-খাট সাধ পূরণ করবার জন্যেই! যে সব সাধের জিনিসের কথা ভেবে ভেবে স্ত্রী হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, যে সাধ পূরণ হবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না—তাই সফল করে তুলবার জন্যেই আমি উঠে পড়ে লেগেছিলাম। আমার চেষ্টা-চরিত্রের এবং ভালোবাসার জোরে তার সাধের জিনিষ তারি হাতের মধ্যে এনে দেবার আনন্দ আমাকে পেয়ে বসেছিল নেশার মতো। দিনরাত আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত শুধু সেই ছবি—কিরকম অবাক হয়ে যাবে সে, কেমন খুশি হয়ে উঠবে, সোহাগে গলে পড়ে আমার গলায় কেমন করে জড়িয়ে দেবে তার কোমল বাহু দুটি!

তারপর একদিন পকেট-ভর্তি নোটের তাড়া নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চলতে চলতে হঠাৎ ভয় হ'ল, ইতিমধ্যে আর কারো কাছে যদি জিনিসটা বিক্রি হয়ে থাকে? দোকানটির শো-কেসে সেই লাল মুক্তো-জোড়া দেখে স্ত্রী কি রকম আকুল হয়ে উঠেছিল! সেটাই হাতে এনে দিলে কি রকম খুশি হবে আমি যে তাই দেখতে চাইছিলাম। ওরকম নিখুঁত অমন টুকটুকে অমন মানান-সই মুক্তো পাওয়া—সে এক ভাগ্যের কথা। ইতিমধ্যেই এমন একটি দুর্লভ রত্নকে যে কোনো ধনী মহিলা এসে কিনে নিয়ে যায়নি—এ যেন হতেই পারে না। যদি নিয়েই থাকে আমি যে একেবারেই ভেঙে পড়ব। সেকথা ভাবতেই বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। না, না,—শাদা মখমলের বাক্সে ওই যে সেই অপরূপ মুক্তোজোড়া! মুক্তোজোড়ার একপাশে দেখা যাচ্ছে হীরার কণ্ঠহার, আর একপাশে ব্রেসলেট!

আমার আগ্রহের দৌড় সামলাতে দাম যে যথেষ্টই দিতে হবে—আগেই জানি আমি। কিন্তু দোকানদারের মুখ থেকে দামটা শুনে একেবারেই থ খেয়ে গেলাম। এ পর্যন্ত যা-কিছু জমিয়েছি তাই শুধু নয়, সঙ্গে

আরো কিছু চাই ঐ ছোট্ট দুটি জিনিসের জন্যে—দেখতে যা দুটো মটর ডালের চেয়ে বড় নয়! দ্বিধা করতে লাগলাম। আমার মতো লোকের পক্ষে হীরামুক্তো কেনাটা তো নিত্যবার ব্যাপার নয়। ভাবছিলাম—আমার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যা-খুশি দাম চড়িয়ে দেয়নি তো? ভেবে রেখেছে বোধ হয়—ওসব জিনিষের মূল্য বুঝবার লোকই নই আমি। ভাবতে ভাবতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ল লরেন্সোকে। স্কুলে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি, সেদিনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ব্যস, রাস্তায় নেমে এসে তাকে ডাক দিলেই হবে। লরেন্সোর চেয়ে হীরামুক্তোর ব্যাপার ভালো বুঝবে কে আর? ফ্যাসান-দস্তুর লোক ও. বড়লোকদের কায়দা-কানুন সব ওর নখাগ্রে! অভিজাত সমাজে ওর খুবি সমাদর, খুবই কদর। এই ধরণের লোকের প্রায়ই যে আমাদের বাড়ীতে শুভাগমন হয়ে থাকে—সেজন্যে ওর কাছে আমি খুবি কৃতজ্ঞ। আমাদের মতো নগণ্য লোকের উপর ওর যে সুদৃষ্টি পড়েছে এ তো ওরই মহত্ত্ব।

লরেন্সোকে ডাক দিলে সে অবাক হ'ল—খুশিও হ'ল। আমার সঙ্গে দোকানে এলে তাকে আমার ইচ্ছেটা জানালাম। ঐ দুল মুক্তোজোড়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সেও বলল যে তার জানাশোনা বহু ধনী মহিলাই এমন অপূর্ব দুল দেখতে পেলে আর ছাড়বে না,—তা যত দামই লাগুক না! আর, সৌন্দর্যের দিক থেকে বিচার করলে দামটা মোটেই বেশী নয়!

এইকথা শুনে একদিক থেকে অবিশ্যি নিশ্চিন্ত হলাম,—কিন্তু অত টাকা হাতে নেই একথা বন্ধুর কাছে স্বীকার করতেও লজ্জা লাগছিল। তাই এমন সুযোগটি হাতে নিতে পারছিলাম না। শেষপর্যন্ত লরেন্সোকে বললাম যে স্ত্রীকে ঐ মুক্তোর দুল-জোড়া উপহার দিতে খুবি সাধ হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে সব টাকাটা কুলিয়ে উঠতে পারছি না। এ অবস্থায় প্রকৃত বন্ধুর কাজই করল সে। নিজের পকেট থেকে কয়েকটা নোট তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, এই সামান্য সাহায্যটুকু নিতে রাজি না হ'লে সে আমাকে মেরেই ফেলত!

কিন্তু আমার অবস্থাটা তখন বড় ভয়ানক। অতগুলো টাকা ধার নিতে সাহস হচ্ছে না,—শোধ দেবার সামর্থ্য হয়তো নাও হ'তে পারে। কিন্তু পুরো দাম চুকিয়ে না দিলেও তো দোকানদার অত দামী জিনিষ বাড়ী আনতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর মনোরঞ্জন করার ইচ্ছাটাই

জয়ী হ'ল। এত খুশি হলাম যে দরদী বন্ধুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হ'ল।

লরেন্তোকে আমন্ত্রণ করলাম, পরের দিন আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে এবং স্ত্রীকে উপহার দেওয়াটাও দেখবে। বাড়ী ফিরে চললাম। পকেটে সেই বাক্সটি। চলতে চলতে মনে হ'ল, আমার ডানা গজিয়েছে।

লুসিলা, অর্থাৎ কিনা আমার স্ত্রী ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, বৈঠকখানা ফিটফাট করে সাজিয়ে রাখছিল। আমার দিকে সে মুখ তুলে তাকাল। 'বলো তো পকেটে কি আছে?'—জিজ্ঞেস করতেই সে হাততালি দিয়ে নেচে উঠল! 'উপহার এনেছ, উপহার!' আমার সব পকেট উলটে পালটে আমাকে সুড়সুড়ি লাগিয়ে পাগল করে তুলল। বাক্সটা সে খুঁজে পেল। মুক্তোজোড়া দেখে খুশির চোটে সে যে ভাবে চিৎকার করে উঠেছিল—তা কোনোদিন আর ভুলবার নয়। তারপর, আমার মুখখানা কাছে টেনে নিয়ে অফুরন্ত চুম্বনে আমাকে ঢেকে ফেলে বলল—'তোমার মতো ভালো স্বামী—তোমার মতো দরদী স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা!'

সেই সময়টুকুতেই সে যে আমায় সত্যিই ভালোবেসেছিল—তা আমি বিশ্বাস না করে পারি না। আমি আগেই তাকে ভাবিয়ে রেখেছিলাম যে মুক্তোজোড়া কেনা আমার মতো লোকের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। তাই, আজ আমার এই উপহারটি হ'ল একেবারেই অপ্রত্যাশিত! তার আহ্লাদ দেখে আমার আর তর সইল না। আমি আমার কোনোকিছুই বুকে চেপে রাখতে পারি না,—তাই তার কানের সোনার ইয়ারিং খুলে তারি বহুসাধের মুক্তোর দুল-জোড়া পরিয়ে দিলাম। দু'কানে ফুটে উঠল সোহাগের লালিমা। এই সব প্রেমের কথা আজ মনে হ'লে বুক ভেঙে যায়, অথচ কোনোদিনই তো তা ভুলে থাকতে পারব না!

পরের দিন ছিল রবিবার। লরেন্তো কথা রাখল ঠিকই, খেতে এল। আমোদে আর কল-কোলাহলে কাটছিল বেশ। লুসিলা পরেছে সবসেরা পোশাকটি। লাল রঙের সিল্কেই তাকে মানায় সবচেয়ে ভালো। লাল গাউনের উপরে পরেছে লালগোলাপ, কানে লালমুক্তো! লরেন্তো থিয়েটারের টিকেট নিয়ে এসেছিল। সন্ধ্যাবেলাটা কাটল ভারী চমৎকার। পরদিন আমাকে বেরুতে হ'ল কাজে,—ছুটি হওয়ার পরেও খাটুনি গেল খুব। বন্ধুর ধারটা তো শোধ করতে হবে। রাতে ফিরে এসে খেতে

বসে প্রথমেই তাকালাম লুসিলার সুন্দর কান দু'টির দিকে! আঁৎকে উঠলাম, আর্তনাদ করে উঠলাম—এক কানে মুক্তো নেই যে!

'সেকি!'—লুসিলা দু-হাত দিয়ে কানের দুল ধরে দেখে।

সত্যিই নেই দেখে সে এত ভয় খেয়ে গেল যে তাকে দেখে আমিও ভয় খেয়ে গেলাম। লুসিলার মুক্তোর জন্যে নয়,—লুসিলার জন্যেই!

'এতটা ভেঙে প'ড়ো না। নিশ্চয়ই কোথাও প'ড়ে আছে! এসো খুঁজি দেখি, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে!'

প্রত্যেকটি জায়গা প্রতিটি কোণ-কানাচ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হলাম। বিছানা উলটে পালটে কম্বল-চাদর ঝেড়ে-ঝুড়ে, কাপড়-জামার ভাঁজ খুলে খুলে, সব আসবাব-পত্র সরিয়ে নিয়ে—যে বাক্স কয়েক মাসের মধ্যেও লুসিলা খোলেনি বলছে তাও খুলে—খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু সব খোঁজাখুঁজিই ব্যর্থ হ'ল। লুসিলা তখন মেঝেতে বসে পড়ে হু হু করে কেঁদে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—

'বাইরে গিয়েছিলে কোথাও?'

'হ্যাঁ,—তা গিয়েছি!'—কিছুক্ষণ ভেবেই বলল যেন।

'কোথায় কোথায় গিয়েছিলে বলো তো?

'কয়েকটা জায়গায়ই তো গিয়েছি,—গিয়েছি নানা জিনিস কিনতে!'

'কোন্ কোন্ দোকানে গেছ?'

'মনে পড়ছে না তো···ও, হ্যাঁ, পোষ্ট-অফিসে গিয়েছিলাম, আর সেই রাস্তায়ই অন্য কয়েকটা জায়গায়। পার্কের কাছের কাপড়ের দোকানে, —তারপর এক্‌জিবিশনে, আর—'

'হেঁটে, না বাসে, না রিক্সায়?'

'প্রথমে হেঁটে, তারপর রিক্সায়।'

'কোত্থেকে উঠেছ? নম্বরটা দেখেছিলে?'

'তা তো দেখেছি মনে হয় না। না না, কি করে বা দেখব বলো? রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল রিক্সাটা,—আমারো তখন এমন ক্লান্ত লাগছিল!' লুসিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল আবার।

'শোনো শোনো, একটু বুঝে দেখো।'—কিন্তু লুসিলা তখন একেবারেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে উঠেছে। বললাম—'কোন্ কোন্ দোকানে ঢুকেছ মনে করে দেখতে হবে তো। ঘুরে ঘুরে সেই-সেই দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখবে। দোকানগুলির নামের তালিকাটা

দাও তো, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবো।'

'ওঃ, কিছুই মনে নেই আমার। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।'—সে আর্তস্বরে কেঁদে উঠল। দুলের জন্য এতটা ভেঙে পড়েছে দেখে আমি আর কিছুই বলতে পারলাম না।

সারাটা রাত যে কী ভাবে কাটল! চোখে ঘুম নেই। লুসিলা এপাশ ওপাশ করছে আর কাঁদছে। আমার কোনোরকম অসুবিধে না হয় তাই ঘুমের ভাণ করছে, কিন্তু চুপ করেও পড়ে থাকতে পারছে না। আর, আমি বসে বসে ভাবছি কী উপায়ে হারানো মুক্তো-জোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে। খুব ভোরে উঠলাম। লুসিলা তখনো অস্বস্তিভরে এপাশ ওপাশ করছিল। তাকে আর তুললাম না। ঠিক করলাম, বিজ্ঞ বন্ধু লরেন্সোর কাছ থেকে উপদেশ নেব—এখন কী করা যায়। ভাবছিলাম, সত্যিই বাইরে হারিয়ে গিয়ে থাকলে পুলিশের কাছ থেকে একটা হদিশ মিলতে পারে, এবং লরেন্সো তার ব্যাপক প্রভাব ও গভীর অভিজ্ঞতা বলে আমাকে এই জরুরী খানাতল্লাসীতে যথেষ্ট সাহায্যও করতে পারবে।

'মনিব তো ঘুমুচ্ছেন।'—চাকরটা বলল—'আপনি ভিতরে এসে বসতে পারেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই উনি জাগবেন।'

আমার উদ্বিগ্ন ও অধৈর্য অবস্থাটা ধরা পড়ল চাকরটার চোখেও।

কী যে করি ভাবছিলাম। তাই দেখে চাকরটা আমাকে ভিতরে এনে বসাল। বৈঠকখানায় সিগ্রেটের ও নানা প্রসাধনের সৌরভ। এতটা সময় অপেক্ষা না করে সোজা যদি বন্ধুর ঘরে ঢুকে যেতাম—তা হলে কি হ'ত তাই আজ ভাবি।

বন্ধুটি জানলা খুলে দিয়েছে, আমিও গিয়ে ঘরে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ চোখে পড়ল কি যেন ঝলমল করছে শাদা মখমলের কম্বলের উপর।

সেই মুক্তোর দুলটি!

তাই দেখে আমার বুকের ভিতরটায় যে কী রকম করে উঠল—তোমার নিজের তেমনটা হ'লে তবেই বুঝতে। আর তুমি যদি তখন এসে জিজ্ঞেস করতে—এ অবস্থায় তোমার কী করা উচিত, তা হ'লে একবাক্যে বলে উঠতাম—

'একখানা ছোরা হাতে করে সেই বিশ্বাসঘাতকের ঘরে ঢুকেই এমন ব্যবস্থা করো যেন ঘুম থেকে তাকে আর উঠতে না হয়।'

কিন্তু আমি কি করেছিলাম জানো? নুয়ে পড়ে মুক্তোটি তুলে

নিয়ে চট করে পকেটে রেখেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম বাড়ী। স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে সবে সাজগোছ করছে। তাকে খুবি বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। না, তার গলাটা গিয়ে টিপে ধরলাম না। শান্তকণ্ঠে শুধু মুক্তোটি কানে পরতে বললাম। পকেট থেকে মুক্তোটি বার করে তার সামনে এনে ধরলাম—'এই সেই মুক্তো! খুঁজে পেতে যে খুব কষ্ট হয়নি সে তো বুঝতেই পারছ!'

তারপরেই হঠাৎ অন্ধ ক্রোধে আমি একেবারে পাগল হয়ে গেলাম। প্রতিহিংসা নেবার অদম্য ঝোঁকে হারিয়ে ফেললাম কাণ্ডজ্ঞান। ধেয়ে গিয়ে কান থেকে মুক্তো দুটো ছিঁড়ে এনে পিষে ফেললাম পায়ের তলায়। আমি কেন যে তাকে সাফ খুন করিনি—জানি না! তবে মনে আছে, তক্ষুনি টপাটপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে একটা মদের দোকানে ঢুকে মদ চেয়েছিলাম পুরো এক বোতল।

লুসিলার সঙ্গে আর দেখা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ, একবার হয়েছিল। সে চলছিল এক ভদ্রলোকের হাত ধ'রে এবং তার গায়ে গা এলিয়ে দিয়ে। নরেন্তোর নয়, আর একজনের। আমি লক্ষ্য করলাম—লুসিলার বাঁ কানের নিচের দিকটায় কালো একটা দাগ—কানের লতিটা আগাগোড়াই ছেঁড়া। নিশ্চয়ই আমার কীর্তি। অবশ্য, ঠিক ছিঁড়েই ফেলেছিলাম বলে মনে পড়ছে না তো!

কালো বেড়াল

গত দু'দিন ধরে বর্ষা হচ্ছে,—অলস আমেজ-লাগা. ঝিরঝিরে বর্ষা, অবিশ্রান্ত অবিরাম। মাঝে মাঝে প্রবল ধারা ছাদটাকে ঠুকছে ক্রম-বাড়ন্ত দাপটে! তারপরেই মনে হয় এবারের মতো সব থামল বুঝি: এবার, ধূসর মেঘদল তাদের বুক খালি করে দিল—থেমে গেল বর্ষা। তাদের ভীষণ আক্রোশটা কমে আসে, ছাদের গায়ে ঠোক্‌ঠুকিটাও আস্তে আস্তে থেমে আসে। তবুও তো চলতে থাকে বর্ষা, সেই একটানা অলস আমেজ-লাগা ঝিরঝিরে বর্ষা। এক এক সময় এত আলগোছে ঝরতে থাকে, মনে হয় থেমেই গেছে। উজ্জ্বল-নীল আকাশটি দেখতে পাব বলে জানলাটা খুলে মুখ বাড়িয়ে দিই; কিন্তু আকাশের ধারাযন্ত্র তখনো ঘুরে চলেছে অবিরাম, —বর্ষাও থামে না আর! অবিরাম অবিশ্রান্ত বর্ষণ—অবিশ্রান্ত ·অবিরাম······

জানালার খড়খড়িটা বন্ধ করে বিজলী বাতিটা জ্বালিয়ে দিই। যত রাতই হোক না! ডেস্কের সামনে আরাম-কেদারাটায় বসে ভাবনার স্রোতে ভেসে যাব—ভাবনা আর ভাবনা······

তা আমার সৌভাগ্যের, না দুর্ভাগ্যের?

ব্যাপারটা এমন আচমকাভাবে এসে পড়েছে যে তাকে কেমন করে গ্রহণ করব তাই বুঝে উঠিছি না। কালকের দিনের আগের দিনটিতেও ছিলাম আমি এত সুখী···আর আজকেই আমার প্রাণের উপরে নেমে এসেছে পাষাণ-ভার। পাষাণ-ভার, পাষাণ-ভার!···এমনটা হয়েছে অবিরাম বর্ষণের জন্যে—এই কান্নাভরা বিরহ এই ধূসর ঘন-ধূসর বহিঃপ্রকৃতির ছায়ায়। তবে আমার কেন এমন অস্থিরতা, এমন অস্বস্তি? আমার আবেগ যে ভিতরে থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে,—আমার হৃদয় থেকে আমার অন্তরাত্মা থেকে জেগে উঠে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। না, আমাকে চুপ করে বসে ভাবতে হবে। এই একটা দিন আগেই আমি কেমন করে এত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম ভেবেই পাই না। আর তো খুশি হ'তে পারব না,—একী হ'ল আমার!

এত হঠাৎ! এত হঠাৎ···

মাত্র দশটা দিন আগের কথা!

মাত্র দশটা দিন।

একটা লেখা নিয়ে সে এসেছিল. আমাকে পড়িয়ে মতামত শুনবার জন্যে।

তরুণী—বছর কুড়ি হবে. মাত্র আঠেরও হতে পারে। এবং সুন্দরী! সুন্দরী? নিশ্চয়ই, অবাক করে দেবার মতোই সুন্দর। দোরটা খুলে যেই তাকে দেখেছি, একটা বিচিত্র অনুভূতি আমার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরল।

তার চোখ! বড় বড় কালো পক্ষ্মের ছায়ায় সেই গভীর কালো চোখ দুটি! আমাকে অমনি দুভাগ করে ফেলল! সেই চোখ থেকে আমাকে আর বাঁচাতে পারলাম না। অভিভূত অর্ধচেতন অবস্থায় মনে হ'ল, তরুণ-শুভ্র একখানি মুখে দীপ্তি পাচ্ছে সেই নম্র-শোভন চোখ দুটি, ললাটের চারপাশ ঘিরে দুষ্টুর মতো খেলা করছে কয়েকটি কালো অলক। সমস্ত দেহটি নরম তুলতুলে—একান্ত নমনীয়; অনেকটা শিশুর দেহের মতো।

তার কণ্ঠস্বর! ঠিক তার চোখের মতো। শান্ত, অতল-গভীর, আর এতো আবেগময়। 'বাবু কি এখানে থাকেন? ও, আপনিই কি তিনি?'—সে এসে জিজ্ঞেস করতেই তার আবির্ভাব আমার চোখ-কান এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে আমি ভুলেই গেলাম—তাকে দোরে দাঁড় করিয়ে না রেখে ভেতরে ডেকে আনা উচিত।

সে অবিশ্যি নিজেই এগিয়ে এল। আমার ঘরের একেবারে ভিতরেই চলে এল। তার দিক থেকে একটুখানিও চোখ না ফিরিয়ে আস্তে আস্তে দোরটা বন্ধ করে দিলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম সম্মোহিতের মতো। বুঝতেই পারছিলাম না—আমিই তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব, না সে নিজেই বলবে কে সে, কেন এসেছে।

হাসল সে। রৌদ্র-ঝরা সংগীতময় হাসি, রহস্য-গভীর হাসি। বসতে বলিনি তো?

'তাই তো, বসুন।' আর, তখন আমি—যার মেয়েই হবে এর সমবয়সী—সে কিনা থতমত খেয়ে লাল হয়ে উঠল! তার জন্যে তাড়াতাড়ি করে একখানা চেয়ার এগিয়ে আনতে গেলাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে একটা চেয়ার খুঁজে নিয়ে বসে পড়েছে।

সে কথা বলছে। আমি ডেস্কের সামনে আরাম-কেদারাটায় বসে

তার দিকে চেয়ে আছি, অপলক চোখে চেয়ে আছি। আমার তৃষিত সম্মোহিত কানের উপর ঝরে পড়ছে তার কণ্ঠস্বর!

আমাকে এমনটিই ভেবে রেখেছিল, বলল সে। আমার লেখা সব পড়েছে। আমার সব লেখাই তার জানা, আর লেখার ভিতর দিয়ে আমার ছবিটি এঁকে নিয়েছে মনে মনে। ছবিটিতে একটুও ভুল হয়নি। তবে, আমার চুল যে এতটা পেকে উঠেছে ভাবেনি সে। তাতে আর কি হয়েছে। আমি যে আসলে নবীন—সে তো জানে ঠিকই। আমার কণ্ঠস্বর শুনতে কেমন, এখনো সে আচ করতে পারেনি। তা সে ইঙ্গিতে জানাল—এখন পর্যন্ত আমি একটি কথাও বলিনি। আর, সে হেসে উঠল।

হাসিতে আমি যোগ দিলাম। কথা খুঁজে পাচ্ছি না যে! বুঝতে পারছি বেশ দামী কিছুই বলা উচিত। এই স্বপ্নপ্রতিম তরুণীটি—শিশুর মতো কোমল যার দেহলতা—যে আমার সব লেখা পড়ে মনে মনে এঁকে রেখেছে আমার নিখুঁত একটি ছবি—সে যে আমার মুখ থেকে গভীর-কিছু বিশিষ্ট একটা-কিছু শুনবার জন্যেই বসে আছে, বেশ বুঝতে পারছি। তা ছাড়া, খেলো আমি হতেও চাই না। শস্তাকথা বাজে লোকের মতো কথা আমি বলতেও চাই না। তার মুখেই আরো কথা শুনবার জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকি।

ঘরটার চারদিকে সে চেয়ে চেয়ে দেখছে; দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলির উপর পলকের জন্যে নজর স্থির রাখল। তারপরেই আমার দিকে। তীক্ষ্ণ মর্মভেদী চাউনি,—সে চাউনিতে জেগে আছে গভীর প্রশ্ন আর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

সে তার নিবিড় কণ্ঠস্বরে বলল—আমি কোনো প্রশ্ন করছি না দেখে তাকেই নিজে থেকে বলতে হচ্ছে। নামজাদা লেখকদের কাছে লোকে আসে কেন? কতোদিন থেকে সে আমাকে জানবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল,—কিন্তু তেমন কোনো কারণ ছাড়া কী করে আসা যায়? তাই আজ এসেছে মতামত শুনবার জন্যে উপদেশের জন্যে,—যেমন কোনো কাজ নিয়ে লোকে আসে ডাক্তার বা উকীলের কাছে। কিছু-একটা লিখে এনেছে সে, এখন একজন বিশেষজ্ঞের মতামত শুনতে চায়। আমি কি এই কষ্টটুকু স্বীকার করব না?

বিনয়বশে একান্ত বিনয়বশেই জানালাম,—'দেখব না কেন, সানন্দেই দেখব।'

হাসছে সে। তার লেখাটুকু আমাকে গভীর আনন্দ দেবে বিশ্বাসই করছে না। না, হাতের লেখাটা যে পড়া চলে না। পড়ে শোনাতে বলব ?

গলার স্বরটি শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু পড়তে গেলে লেখার দিকেই চোখ থাকবে,—চোখ দুটি তো দেখতে পাব না।

এবার বলল সে—আমার পড়া মোটেই ভালো নয়। আমার হাতের লেখার চেয়েও খারাপ। হাসতে হাসতে বলি, পড়ার গরজ নেই। কারণ, এখনি পড়ে ফেললে তো সঙ্গেসঙ্গেই আমার মতামত দিয়ে ফেলব এবং তাকেও উঠে বিদায় নিতে হবে, আর আসবে না। তার চেয়ে বরং লেখাটাই রেখে যাক। আবার আসবে,—নিজেই আসবে, এসে শুনবে আমার মতামত। ডাকে পাঠানোটা চাইবে না। নিশ্চয়ই নানাকথা জিজ্ঞেস করতে চাইবে। আর, লেখাটি অবশ্য তখনো আমার পড়া শেষ হবে না, কাজেই তাকেই বারবার আসতে হবে······

আমার ডেস্কের উপরে ছোট্ট একটি লেখা রাখল। এই প্রথম তার হাতখানি দেখতে পেলাম। ছোট্ট হাতটুকু, ফুটফুটে কোমল চামড়া—তলা দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে রক্তাভা।

লেখাটি হাতে নিয়ে নামকরণের পৃষ্ঠাটা দেখি, শুরুটায় ও মাঝখানটায় চোখ বুলোই, আর আমার গায়ের উপরে অনুভব করি তার মিশকালো চোখ দুটি। মাথা তুলতেই আমার চোখের সামনে একজোড়া চোখ। সেই চোখে জেগে আছে গভীর প্রশ্ন, আর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

জানালায় ঠকঠক করছে কী যেন। এবার 'ম্যাও ম্যাও' করছে। তাই তো, অনর্গল বর্ষণ-ধারা থেকে গা বাঁচানোর জন্যে একটা বেড়াল এসে আশ্রয় নিয়েছে জানলার গায়ে। নিশ্চয়ই বেড়াল,—তবু একবার চেয়ার ছেড়ে উঠি দেখবার জন্যে। আমার ভাবনার মাঝে কিছুটা ছেদ পড়বে অন্তত। একটুখানি সরে দাঁড়াবার একটা অজুহাতও বটে! একি, পা যে ঠাণ্ডা বরফ

ভয়ে ভয়ে খড়খড়িটা খুলি। বাইরের অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা কালো বেড়াল চেয়ে আছে: একজোড়া জ্বলন্ত ফসফরাস চোখ। কালো বেড়াল দেখলেই আমার গা ঘিনঘিন করে। আমি যে সংস্কারাচ্ছন্ন তা নয়, তবে কিনা কালো বেড়াল সম্পর্কে যতো সংস্কার গড়ে উঠেছে তা জমে জমে আছে আমার স্মৃতিতে ও স্নায়ুতে। জানালায় ঠকঠক

শব্দ করে তাড়াতে চেষ্টা করি। কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই। আড়মোড়া দিয়ে আরামজনক একটা কোণ খুঁজে নিয়ে গা এলিয়ে দিল। জানালাটা খুলে নিচে রাস্তায় ঠেলে ফেলতে যাই, কিন্তু ওর গা ছোঁবার রুচি হয় না। করুণাও হয় না! বাইরে এখনো সেই বর্ষা···বর্ষা আর বর্ষা। শুকনো একটু জায়গায় শুয়ে থাক না। কার কি আসে যাচ্ছে?

খড়খড়িটা নামিয়ে দিয়ে লেখার টেবিলে ফিরে আসি।

একটা পলক মন থেকে কালো বেড়ালটাকে আগে ঝেড়ে ফেলি, তারপর নতুন করে আমার ভাবনার সূত্র ধরব।

এবারে আমার সৌভাগ্যের আর দুর্ভাগ্যের! আগে বলেছিলাম না —সৌভাগ্যের, না দুর্ভাগ্যের?

তাকে জানালাম—হ্যাঁ, লেখাটা সে আমার কাছে রেখে যেতে পারে। আমি আগাগোড়াই পড়ে দেখব, ভালো করে পড়ে মতামত দেবো।

সবটা দেবো?

নিশ্চয়ই।

মতামত শুনতে কখন আসবে?

কয়েকটা দিন পরেই আসতে বলব।

কয়েকটা দিন পরেই বা কেন? কাল নয় কেন? কালই আসবে। ছোট্ট তো লেখাটা। আধঘণ্টাও তো লাগবে না পড়তে। কাজেই হার মানি। বেশ, কালই আসুক।

ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকল। পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমার স্ত্রী মিশুক মানুষ, হাসছিল। তা, মেয়েটি হ'ল বদমেজাজী, একরোখা আর চোখা ধরণের।

উঠে দাঁড়াল, এবার চলে যাবে।

স্ত্রী হাসছে, আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি না তো?

মেয়েটি কিছুটা উদাসীন সুরেই বলল—না, বহুক্ষণ ধরেই বসে ছিলাম কিনা!

বইার-দোরের চৌকাঠে পা রেখে আবদারে সুরে আমাকে জিজ্ঞেস করল —আপনি নিজেই লেখাটা পড়ে দেখবেন তো?

এক পলকের জন্যে খুব একটা ঝোঁক আসে—দিই, ফিরিয়ে দিই লেখাটা। আমার স্ত্রীর হয়েই প্রতিশোধটা নিয়ে নিই।

কিন্তু দোরটা বন্ধ করে চলে গেছে কখন। আমার জবাব শুনবার

জন্যেও দেরী করেনি। হয়তো সে আমার চোখে অসন্তোষের ঝিলিক দেখে থাকবে।

'এটি আবার কোন্ বেহায়া বেড়াল?'—স্ত্রী জানতে চায়। হো হো করে হেসে উঠলাম আমি।

পরের দিন এলো না। তার পরের দিনও নয়। দু'দিনই ভেবেছি—সে এলো না। ভাবতে চাইনি, তবু মনে এসে হানা দিয়েছে বারবার—অস্বস্তি জাগিয়ে রেখেছে। আসবার কথা দিয়েছে যখন, আসা উচিত ছিল।

লেখাটা পড়লাম। একেবারে বাজে গল্প। এক অজানা পুরুষের জন্যে একটি বিরহিণীর ব্যকুলতা নিয়ে লেখা। কিন্তু প্রকাশের ভাষা একান্ত দুর্বল, লেখার সুরে সততার লেশমাত্র নেই। আমার কাছে আসবার একটা আছিলা খুঁজে নেবার জন্যেই লিখে থাকবে, এটাই আমার নিশ্চিন্ত ধারণা হতে লাগল।

'বেহায়া বেড়াল!'

দুদিন পরে এলো। দোর থেকেই সে আমাকে দেখে হাসল, কেমন অর্থপূর্ণ খাপছাড়া হাসি।

'আপনাকে প্রতীক্ষা করিয়েছি?'

কথার ফাঁদ পাতছ, বেড়াল বেহায়া বেড়াল!

ঘরে আসতে বললাম। ঘরের মধ্যখানে এগিয়ে এল, চারদিকটা দেখতে লাগল, তিনদিন আগে যে দোর দিয়ে আমার স্ত্রী ঘরে ঢুকেছিল সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল, তারপর একটা চেয়ারে ব'সে আমার দিকে। তার নিবিড় গভীর মখমল-কণ্ঠে বলল—

'লেখাটা সব পড়ে দেখেছেন?'

সত্যি কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চিরদিনের জন্যেই তাকে কি সরিয়ে দিতে পারি? আমার কাছে আবার আসবে আমি যে তাই চাই। বললাম—'পড়েছি, তবে সবটা পড়তে পারিনি। কিছু মনে করো না।'

'কতদূর পর্যন্ত পড়েছেন?'

তাই তো, কতদূর বলি এখন!

'এখনো বুঝি পড়তেই শুরু করেননি?'—নিজেই বলে দেয়, তার আগের প্রশ্নের কোনো জবাব দিচ্ছি না লক্ষ্য করেছে।

গল্পটা পড়েছি ঠিকই, হলফ করে বলি। খসড়টাও বলতে শুরু

করি। তারপর নিজেকে প্রতারণা করি, হঠাৎ শেষের দিকটাও যে পড়েছি জানিয়ে দিই।

'তবে সবটাই পড়েছেন, বলুন!'—হাসে।

সায় দিই—'তবে চোখ বুলিয়ে পড়া, এই পাতা উল্টে গেছি আর কি!'

তারপর অতলস্পর্শী কণ্ঠে সে বলতে লাগল—'আমার ছোট্ট গল্পটি তো এমন একটা গভীর কিছু নয় যে দু'বার পড়ে দেখা দরকার! এবারে তাহ'লে আপনার মতামতটা বলুন। যদি বলেন বাজে লেখা, ডাক ছেড়ে কাঁদব না ঠিকই। আমি নিজে কি জানি না কী-বা ওর দাম! তা, আপনার কাছে আবার আসবার কথা বলছেন, তা ভাববেন না। আরো একটা লেখা নিয়ে এসেছি—এই দুদিনেই লিখেছি।'

হায় ভগবান, এ কি? এ কী লজ্জার কথা! রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম।

কালো বেড়ালটা এক লাফে ঢুকে পড়েছে ঘরের ভিতর। ভয়ে ভয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। আস্তে আস্তে ভয়ের বদলে জেগে উঠল বিস্ময়। ভিতরে লাফিয়ে পড়ল কী ক'রে। জানালা তো বন্ধ।

জানালাটার কাছে এগিয়ে যাই। বেড়ালটা দেয়াল ঘেঁষে গুটিয়ে ব'সে, আমার দিকেই চেয়ে থাকে। বাইরে ছুঁড়ে না ফেলবার জন্যে মিনতি করছে যেন। খড়খড়িটা খুলে জানলাটা পরখ করে দেখি। বেশ আঁটা রয়েছে, খিল আঁটাই আছে। জানলার কাচ পরখ করে দেখি। হ্যাঁ, এই তো, নিচের দিকের একটা কোণ ভেঙে রয়েছে। ত্রিকোণাকার ছোট্ট একটা ফুটো। ঝকমক করছে ভাঙা কাচের ধারালো বাঁকা-বাঁকা ধারগুলো।

কাচটা ভাঙলো কখন? আগেই চোখে পড়েনি কেন? ঘরের কেউ-বা দেখেনি কেন?

কিন্তু বেড়ালটাই বা ঢুকল কেমন ক'রে। এতটুকু ছোট্ট ফাঁক দিয়ে অত বড় একটা কালো বেড়াল! সারাটা গা ছুলে গিয়ে থাকবে। ফিরে তাকাই বেড়ালটার দিকে, খুন চেপে বসে। লাথি মেরে বর্ষার অন্ধকারে ছুঁড়ে দিতে যাই। পাশের ঘরের পেতলের খাঁচায় যে কাকাতুয়াটি রয়েছে অন্তত সেটির জন্যেও তো! কিন্তু আমি নিজ হাতে তা করব না। ভেজা বেড়াল ছোঁবও না আমি, তা ছাড়া ছুঁলেই আঙুলে রক্ত লেগে যাবে নিশ্চিতই।

ঝিটাকে ডাকি, বেড়ালটাকে বাইরে ছুঁড়ে দিতে বলি। কেমন করে বেড়ালটা ঘরে ঢুকল—জানতেও চাইল না। নিশ্চয়ই কেউ ঘরে আসতে দিয়েছে। এমন খেয়াল হ'ল কার সেটাই জানার কথা। তার প্রথম ভাবনা হ'ল, বড়ই ভাবনা হ'ল পাখীটিকে নিয়ে—সারা ঘরের আদরের পাখীটি! বেড়ালটাকে খপ্ করে ধরে ঝট্ করে বেরিয়ে যায়। রাস্তার দোর খুলে বাইরে ছুঁড়ে দেয়, বলে—'মর্, পড়ে মর্!' ঝিটার হাতে রক্ত লেগে গেল কিনা জানতে চাই,—কিন্তু সে এদিকে এলো না। তার নিজের কাছে গেছে। ভালোই হয়েছে। এলেই নানা কথা উঠত বহুক্ষণ ধ'রে। আমি একাই থাকতে চাই, নিরালায়। পরে জেনে নেব।

যা বলছিলাম।

বসে বসে বহুক্ষণ ধরে সে কথা বলল। চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল আমার কাছে, এত কাছে এলো যে গায়ে নিশ্বাস লাগছিল। আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল যেন সদ্যকাটা খড়ের মিষ্টি গন্ধ! তার দেহ থেকে একটা আমেজ ছড়িয়ে পড়ছিল, আর আমি তার মধ্যে বসে ঘামিয়ে উঠছিলাম। মাঝে মাঝে তার হাতখানি রাখছিল আমার মাথার চুলের উপর।—যে মাথার চুল কালো নেই আর, পাক ধরেছে। কোথাকার বেহায়া বেড়াল! কী সাহস তার! ধরো, আমার স্ত্রী যদি হঠাৎ এসে দেখে ফেলত।

দোরের দিকে আমার চঞ্চল চাউনি নজরে পড়ল তার! হাসল। আমার স্ত্রীকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে—ভরসা দিয়ে বলল। একটি মেয়ের সঙ্গে একেলা ঘরে। আমার মেয়ে? কথা বলতে বলতে সে আমার ধূসর চুলে হাত বুলোচ্ছিল, প্রেম ও কামনার গভীর দৃষ্টি মেলে চেয়ে ছিল আমার দিকে। তার মখমল-মোলায়েম সুরেলা গলায় সে বলল—লেখকদের স্ত্রীদের আমার অসহ্য ঠেকে।

তারপরেই, শিল্পীদের বিয়ে করা উচিত নয়। মুক্ত থাকবে তারা প্রত্যেকটি নারীর জন্যে,—সমস্ত নারীর জন্যে। উদ্দেশ্যবশত চুপ করে রইলাম। এর কাছে বলব কী। এই মেয়েটি সম্পর্কে আমাকে সাবধান হতে হবে।

আমার হাতখানা নিয়ে আঙুলগুলি দেখতে লাগল। বহুক্ষণ দরদ ভরে ধরে রাখল—নিজের সরু সরু উষ্ণ আঙুলগুলি দিয়ে ঘিরে রাখল।

আর তখনি তো আমার সৃজনধর্মী রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু করার সময়। তার হাতের স্পর্শটুকু ভারী ভালো লাগছিল,—আমিও

গভীরতর দরদে কথা বলে যাচ্ছিলাম ক্রমেই আরো সহজ হয়ে। আমার হাতখানা ছেড়ে না দেয়, তাই। আমি একটা কথার মাঝামাঝি এসে একটা শব্দের আধখানা উচ্চারণ করেছি কি—আচমকা সে ঝুঁকে পড়ে আমার ওষ্ঠে চুমো খেল!

মিলিয়ে গেল বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো।

বেড়াল! সেই বেড়াল আবার এক লাফে ঢুকেছে ঘরে। ঠিক জানালার সেই ফাঁক দিয়ে। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে, বকাবকি শুরু করি। না, এবারে আর ঝিটাকে ডাকব না। জানালাটা খুলি, বেড়ালটাকে ঘাড় ধরে সজোরে আছাড় মারি রাস্তার উপর। পড়তে দেখলাম না, পাথের শানের উপর আছড়ে পড়ল শুনতে পেতাম। এবারে আর বেশ-খানিকটা না ভেবে-চিন্তে আসবে না। তাও নড়াচড়া করতে পারবে, তবে তো!

জানালাটা এঁটে দিই, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। কিন্তু ঐ গর্তটাকে বোজানো দরকার। আবহাওয়াটা এমন খারাপ না হ'লে, আর এমন অসময় না হ'লে আমি নিজেই মিস্ত্রী ডেকে পাঠাতাম। তা, এখন যা হোক একটা-কিছু গুঁজে দেওয়া দরকার। হাতড়ে ফিরি। একটা পত্রিকা রয়েছে। ফুটোটা বন্ধ করে দিই।

এবারে নিশ্চিন্ত মনে আবার আমার ভাবনার স্রোতে ভেসে চলব।

একটি চুমো। একটি লাফ। অন্তর্ধান!

পরের দিন এলো। সেই চোখ, সেই অতলস্পর্শী কণ্ঠ, আর সঙ্গীত-মুখর যৌবন।

আশংকা হচ্ছিল সে আসবে। আশা করতে চেষ্টা করেছি সে আসবে না। তাকে দেখামাত্রই আমার হৃৎপিণ্ডটা বুকের মধ্যে লাফাতে সুরু করল উন্মাদের মতো।

ঠিক আমার স্ত্রী বেরিয়ে যাবার পরেই এসেছে। কখন যায় লক্ষ্য করে দেখেছে কি? কতক্ষণ ধরে বাইরে প্রতীক্ষা করছিল?—জিজ্ঞেস করলাম। সে হাসতে লাগল।

তাই তো, নতুন কিছু নয় তো। আমার কাছে প্রথমবার আসার আগে তো ঢের বেশী প্রতীক্ষা করেছে। লেখা নিয়ে আসার অজুহাতের কথা তো অনেক পরেই মনে পড়েছিল।

আচ্ছা, আমিই তার কাছে যাব—সেটা কি আরো ভালো হবে না?

তার নিজেরি ঘর রয়েছে। যাকে খুশি সে ডেকে নিতে পারে। সম্পূর্ণই স্বাধীন সে।

—বড়ই সহজভাবে সে বলছিল এসব। এত মিষ্টি সুরে, এত সরল ও স্বাভাবিক ভাবে,—আর সেই অতলস্পর্শী মখমল-কোমল কণ্ঠে, তার সেই অতলস্পর্শী চোখে, সেই উদ্দাম যৌবনে !

ইচ্ছে হ'ল ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি। না, না, আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছিলাম—আমার 'না' বলা উচিত। আর, সেই সংগে আমি এও বুঝলাম আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের সমস্তটাই নিষ্ফল !

আমার ভিতরে সে কোথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, আমি তাই জ্বলে উঠেছি দাউ দাউ ক'রে।

আমাকে বুকের মধ্যে কেড়ে নিল উন্মাদ আলিঙ্গনে, আমার ওষ্ঠে এঁটে দিল সুদীর্ঘ কাম-তপ্ত চুম্বন। আমার অন্তরের আমি কলরব করে উঠল—গান গেয়ে উঠল. উল্লসিত হয়ে উঠল।

আজ আমি আবার তরুণ। আমার পুনর্যৌবন ! আঃ, দুর্জনেরি সে কী আনন্দ !

কাল দেখা করার কথা। গতকাল পর্যন্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছি এই দিনটির জন্যেই, এখন ভয় হচ্ছে। আমি চাইনে আর ! তার কাছে যদি গিয়েই পড়ি,—শিউরে উঠছি। এর পরিণতি কোথায় ? কে সে। কী সে ? আমাকেই বা বেছে নিয়েছে কেন ? আমার মাথার চুলে পাক ধরেছে,—আমার মেয়েই যে তার সমবয়সী !

ওকি, ভাঙা কাচের মুখে যে কাগজ গুঁজে দিয়েছিলাম তারি খসখস শব্দ কি ?

ঠিক। কে যেন নখ বসিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছে। সেই কালো বেড়াল কি ? আবার ! এক লাফে ছুটে যাই জানালায়। ঠিক তাই, কালো বেড়ালটা কাগজটাকে টেনে বার করে ইতিমধ্যেই ফাঁকটা দিয়ে গলিয়ে দিয়েছে মাথাটা।

না। এবারে ভিতরে ঢোকা চলবে না। তার মাথাটা আমার হাতটা দিয়ে ঠেসে ধরি,—ঠেসে ধরি জোরে, প্রাণপণ জোরে। জান খাঁচা-ছাড়া না করে ছাড়ব না !

তবু…তবু…কী ভয়ানক তার শক্তি ! চারটা থাবার উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমেই সে আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে—সরে যাচ্ছিল

ফাঁকটা দিয়ে। ইতিমধ্যেই সে জানালার বাইরে নিয়ে ফেলেছে থাবা চারটে। তখন একটা ভয়ঙ্কর ভয়···যুগপৎ উষ্ণ ও হিম অনুভূতির একটা শিহরণ বয়ে চলল সর্বাঙ্গে। চীৎকার করে উঠলাম অসহায়ের মতো।

এ কী দুঃস্বপ্ন! কেমন টিপ টিপ কাঁপছে বুক! জানালায় এসে দাঁড়াই। বাইরে এখনো বৃষ্টি ঝরছে। কালো রাত্রি। জানালার পাশের জায়গাটিতে শুয়ে রয়েছে কালো বেড়ালটা, গোল পাকিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।

ঠাণ্ডা জানালা-কাচে কপালটা ঠেকিয়ে রাখি,—একটা ব্যাকুল কামনা আমাকে যেন তোলপাড় করছে। আর, এইটিও যদি কেবলমাত্র দুঃস্বপ্নই হ'ত। শিউরে উঠি!

ওঃ, ওঃ!

কাল, আজ বাদে কাল,—কালই।···

বিজয়ী প্রেমের গান

॥ ১ ॥

ঘটনাটা পাওয়া গেছে ইতালীর প্রাচীন এক পান্ডুলিপিতে :

ষোলো শতকের মধ্যভাগ। কাব্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক নামজাদা আর্ক-ডিউকদের রাজত্বকালে ধনৈশ্বর্যে জেঁকে উঠেছে ফেরারা শহর। এবং এই ফেরারায়ই ছিল তখন দুটি যুবক—ফেবিও ও মুজিও। সমবয়সী তারা এবং এ-ওর নিকট আত্মীয়, সব সময়েই দুজনে থাকতও একইসঙ্গে। ছেলেবেলা থেকেই এদের পাশাপাশি বেঁধে রেখেছে নিবিড় ভালোবাসা ; দু'জনের সমান-সমান অবস্থাটা এই রাখীকে করে তুলেছে আরো অটুট। দু'জনেই বনেদী পরিবারের সন্তান, ধনী ও স্বাধীনচেতা। দুজনেরি নেই কোনো পারিবারিক ঝামেলা : রুচি এবং গতি-প্রকৃতিও একই রকম। মুজিও ভালোবাসে সঙ্গীত, ফেবিও চিত্রশিল্প। তাদের নিয়ে সমস্ত ফেরারাই গর্ব করে। রাজসভারো গর্ব তারা, শহুরে-সমাজের আকর্ষণের ধন। দুজনের চেহারা কিন্তু একরকম ছিল না,—যদিও লাবণ্য ও যৌবনের ঐশ্বর্যের জন্যে দুজনেরই একটা বিশিষ্ট রূপ ছিল। ফেবিও ছিল আরো দীর্ঘ, মুখখানা সুন্দর, চুল নরম, চোখ দুটি নীল। মুজিওর মুখ ঈষৎ কালোরঙের, চুলও কালো,—এবং তার গাঢ়-ধূসর চোখে ফেবিওর চোখের সেই খুশির আলো নেই—নেই ওষ্ঠে-লাগানো সেই প্রীতি-মধুর হাসিটিও। মুজিওর চোখের পাতার উপরে এসে নেমেছে ঘন ভ্রূ-যুগল ; আর ফেবিওর সোনালী ভ্রূ-বিলাস শুভ্র-মসৃণ ললাটে লীলায়িত—প্রতিপদের চাঁদের মতো। মুজিওর কথাবার্তায়ও জীবনের উচ্ছলতা কম। সে যাই হ'ক, নানা কারণেই এই দুটি বন্ধু মেয়ে-মহলে পেয়ে গেল একটা বিশিষ্ট আসন। তা, পাবারো কথা। সামাজিক বোধ ও উদার ভাবের প্রতীক ব'লে তারা পরিচিত ছিল সর্বত্রই।

ঠিক এই সময়েই ফেরারায় ছিল ভালেরিয়া নামের একটি মেয়ে, সমস্ত শহরেরই সে ছিল এক অপরূপ সৌন্দর্য। অবিশ্যি, সে বড়ো একটা প্রকাশ্যে বেরোতই না ; গীর্জার দিন কি বিশিষ্ট ছুটির দিন ছাড়া

বেড়াতেও যেত না, দিন যাপন করত লোকচক্ষুর আড়ালেই। তার মা ছিলেন অভিজাত পরিবারের বিধবা,—সংগতিসম্পদ বেশী নেই, সন্তানের মধ্যেও এই একটি মেয়ে মাত্র। ভালেরিয়া থাকে তার এই মায়ের সঙ্গেই। একটিবার এই ভালেরিয়াকে দেখলেই সবার মধ্যে জেগে উঠত এক নিরপেক্ষ প্রশংসা ও প্রাণভরা দরদ—এত শান্ত ছিল তার রূপ, সে যেন নিজেও জানত না তার আকর্ষণী শক্তির কী মহিমা! কারো কারো মতে তার মুখখানি ছিল একটুখানি মলিন, চোখ দুটি প্রায় সব সময়েই আনত—যেন একটা শরম, যেন একটু ভয়-ভয়! ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটে উঠতে প্রায়ই দেখা যেত না, যদি কখনো-বা দেখা যেত—তাও একটু আভাস মাত্র! কেউ বড় একটা শুনতে পায়নি তার কণ্ঠস্বরও। তাহ'লেও একটা কথা কিন্তু রাষ্ট্র হ'য়ে পড়েছিল ঃ খুব ভোরে শহরের সমস্ত কিছুই যখন ঘুমে-বিভোর, আপন মনে সে তখন বীণা বাজিয়ে প্রাচীন দিনের গান করে,—কী অনিন্দ্যসুন্দর সেই গান! একটু মলিন দেখালেও ভালেরিয়ার তখন উঠতি-বয়সের ফুটফুটে সৌন্দর্য। এমন কি বৃদ্ধেরাও তাকে দেখে না ব'লে পারত না—'এখনো পাঁপড়ি-ঢাকা রয়েছে এই শুভ্র কুমারী-কুঁড়িটি; তবে যার জন্যে এ পরিপূর্ণ গৌরবে বিকশিত হয়ে উঠছে কী ভাগ্যবান সেই যুবকটি!'

॥ ২ ॥

ফেবিও আর মুজিও জীবনে এই প্রথমবার দেখতে পেল ভালেরিয়াকে —দেখতে পেল একটা সমারোহপূর্ণ বিরাট জন্মোৎসবে। ফরাসীরাজ ষোড়শ-লুইর কন্যার আমন্ত্রণে রাজ-পরিবারের এক নামজাদা ব্যক্তি এসেছেন—তাঁরি সম্মানার্থে এই অনুষ্ঠান। ফেরারার সর্বশ্রেষ্ঠ পার্কে মর্যাদাপূর্ণ আসনে তার মায়ের সঙ্গে ব'সে আছে ভালেরিয়া; এদিকের আসনগুলি ছিল শহরের বিশিষ্ট মহিলাদের জন্যেই বিশেষভাবে সজ্জিত। ফেবিও এবং মুজিও দু'জনেই সেদিন ভালেরিয়ার প্রতি প্রণয়াসক্ত হ'ল গভীরভাবে। দুই বন্ধুর মধ্যে কোনো গোপন আড়াল ছিল না ব'লে তাদের পরস্পরের মনের কথা জানতেও বাকী রইল না ঃ দুজনেরি সম্মতিক্রমে এবং যুক্তমতে স্থির হ'ল, দুজনেই ভালেরিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর, সৌভাগ্যক্রমে যদি কোনো একজনকে সে

বরণ করে, অন্যজনে তার ইচ্ছাকেই মেনে নেবে বিনা দ্বিধায় বা বিনা আপত্তিতে। দিন সাতেকের মধ্যেই (ওদের সুনামের জোরেই বলতে হবে) দুজনেই সেই বিধবা মহিলার বাড়ীতে যাবার সুযোগ পেয়ে গেল। তার বাড়ীতে কারো প্রবেশাধিকার পাওয়াটা অবিশ্যি খুবি শক্ত ছিল।

বিধবাটি তার মেয়ের সঙ্গে এদের দেখা করবার অনুমতি দিলেন এবং তারপর থেকে তারা প্রায় প্রত্যেক দিনই ভালেরিয়ার সঙ্গে দেখাশোনা ও আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পেতে লাগল। এবং দিনে দিনেই তাদের বুকের মধ্যে প্রবলভাবে জ্বলে উঠতে লাগল কামনার শিখা। এদের সঙ্গ ভালেরিয়ার কাছে স্পষ্টতই মনে হয় প্রীতিকর, কিন্তু তার ব্যবহারে সে কারো উপর বিশেষ কোনো অনুরক্তির পরিচয় দেয়নি। মুজিওর কাছে সে থাকত গান নিয়ে; কিন্তু ফেবিওর সঙ্গে কথাবার্তা বলত বেশী, তার কাছে নিজের সহজ ভাবটাও বজায় থাকত বেশী। শেষে একদিন দুইবন্ধু তাদের ভাগ্যের শেষ-সমাধানের সঙ্কল্প গ্রহণ করল, এবং চিঠিতে ভালেরিয়াকে অনুরোধ করে জানাল: সে যেন সহজভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে এবং খুলে বলে—দুই বন্ধুর মধ্যে কাকে সে বরণ করতে চায়।

ভালেরিয়া তার মাকে চিঠিখানি দেখিয়ে বলল—নিজে সে কুমারীই থাকতে চায়। কিন্তু—তার মা যদি মনে করেন এখন তার বিয়ে হওয়া উচিত, তবে তিনি যাকে যোগ্য বলে পছন্দ করবেন, তাকেই সে বরণ করবে। তখন সেই উদারপ্রাণ বিধবাটি তাঁর আদরের কন্যার আসন্ন বিরহের ভারে অশ্রু চেপে রাখতে পারলেন না। অবিশ্যি, এই পাণি-প্রার্থীদের ফিরিয়ে দেবারো কোনো যুক্তিসংগত কারণ আছে বলে মনে করলেন না,—তার মেয়ের জন্যে দু'জনেই সমভাবে যোগ্য। কিন্তু যেহেতু তিনি মনের অন্তরালে ফেবিওর উপরেই বেশী প্রীত ছিলেন এবং সন্দেহ করতেন যে ভালেরিয়াও তাকেই বেশী পছন্দ করে—তাই শেষ পর্যন্ত তিনি ঝুঁকে পড়লেন ফেবিওর দিকেই। পরের দিনই ফেবিও শুনতে পেল তার সুখ-সৌভাগ্যের কথা। কাজেই মুজিওর জন্যে রইল শুধুমাত্র কথা রক্ষা করা এবং ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করা।

সে করলও তাই। কিন্তু তার বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর বিজয়-সৌভাগ্যের একজন দর্শকমাত্র হয়ে থাকাটা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

তাড়াতাড়ি করে সে তার বিষয়-সম্পত্তির অধিকাংশই বিক্রী ক'রে ফেলল এবং কয়েক হাজার টাকা নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়ল পূর্বদিকে কোনো দূরদেশে। ফেবিওর কাছে বিদায়-সম্ভাষণে সে বলল : যে পর্যন্ত না তার মন থেকে কামনার শেষ ক্ষীণ-রেখাটি মুছে যায়—ততদিন সে আর ফিরবে না। শৈশব ও যৌবনের এই বন্ধুকে বিদায় দিতে ফেবিওর নিশ্চিতই বেশ কষ্ট লাগল…কিন্তু স্বাগত শুভদিনের সানন্দ প্রতীক্ষায় কোথায় তলিয়ে গেল অন্য সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, এবং সে মেতে রইল সফল প্রণয়ের নতুন নেশায়।

কিছুদিন পরেই ভ্যালেরিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ফেবিওর এবং এবারেই ফেবিও সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারল কী রত্ন তার ভাগ্যে জুটেছে। ফেরারার কিছুদূরে সুন্দর একটি বাড়ী ছিল তার, চারপাশে ঘিরে আছে ছায়াভরা বাগান। বিয়ের পরে সে ভ্যালেরিয়া ও তার মাকে নিয়ে চলে এল সেখানে। এই সময় থেকে শুরু হ'ল তাদের সুখের জীবন। পরিণীত জীবন ভ্যালেরিয়ার অন্তরের সমস্ত সৌন্দর্যই যেন নতুন করে ফুটিয়ে তুলল মোহন-রূপে। এদিকে ফেবিও-ও দিনে দিনে হয়ে উঠল নামকরা এক শিল্পী,—এখন আর এই যেমন-তেমন এক শিল্প-বিলাসী নয়, সম্ভ্রান্ত এক যথার্থ শিল্পী। ভ্যালেরিয়ার মা এই সুখী দম্পতিকে দেখে আনন্দিতই হলেন এবং ধন্যবাদ দিতে থাকলেন ভগবানকে। দেখতে দেখতে চার বছর যেন উড়ে চলে গেল—একটি মিষ্টি স্বপ্নের মতো। এই তরুণ-যুগলের একটিমাত্রই অভাব ছিল দুঃখ করবার মতো—এ পর্যন্তও কোনো শিশু-সন্তান এসে তাদের ঘর আলো করল না। কিন্তু সে আশাও যে তারা একেবারে ত্যাগ করেছে তাও নয়। চতুর্থ বছরের শেষের দিকে তারা একটা মর্মান্তিক শোকে একেবারেই মুহ্যমান হয়ে পড়ল,—কয়েকদিনের অসুখেই মৃত্যু হ'ল ভ্যালেরিয়ার মা'র।

ভ্যালেরিয়া সবসময়েই চোখের জল ফেলে, অনেকদিন পর্যন্তই এই নিদারুণ শোক সে সামলে উঠতে পারল না। কিন্তু আরো এক বছর কেটে গেলে জীবনের বেগ আবার প্রতিষ্ঠা করে নিল নিজের দাবী এবং স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়ে চলল পুরোনো পথেই। আর, তারপরে গ্রীষ্মের এক সুন্দর সন্ধ্যায় সকলের কাছেই একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ফেরারাতে এসে উপস্থিত হ'ল মুজিও।

॥ ৩ ॥

মুজিওর সেই প্রস্থানের পরে এই পাঁচ বছরের মধ্যে কেউ কোনোদিন শুনতেও পায়নি তার কোনো কথা। তার প্রসঙ্গে সমস্ত কিছুই যেন মিলিয়ে গিয়েছিল শূন্যে, যেন সে মুছে গিয়েছিল এই পৃথিবীর বুক থেকেই। ফেরারার এক রাস্তায় ফেবিও যখন মুজিওকে দেখতে পেল, প্রথমে অনেকটা যেন আঁৎকেই উঠেছিল, তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল আনন্দের আতিশয্যে এবং সঙ্গেসঙ্গেই তাকে আমন্ত্রণ করল তার পল্লীনীড়ে। তার বাগান-বাড়ীতে বড় একটা কাছারী ছিল—বাসভবন থেকে কিছুটা দূরে। ফেবিও সেখানে থাকবার কথাই বন্ধুর কাছে প্রস্তাব করল। মুজিও সম্মত হয়ে গেল এবং সেখানে গিয়ে উঠল সেদিনই। তার সঙ্গে এল ভৃত্য বোবা-মালয়—বোবা কিন্তু কালা নয়; আর, তার চেহারার ভাবভঙ্গীর সূক্ষ্মতা-বিচারে বোঝা যায় খুবি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে লোকটা ······কেটে ফেলা হয়েছে তার জিভ। মুজিওর সঙ্গে আর এসেছে ডজনখানেক বাক্সতোরঙ্গ, দূর বিদেশে ভ্রমণকালে সংগৃহীত নানা জিনিসপত্র। মুজিওর আগমনে খুশীই হ'ল ভালেরিয়া। মুজিওকে সে সাদর অভ্যর্থনা জানাল—যদিও একটু সংযতভাবে। মুজিও যে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেছে তা তার প্রত্যেকটি কথায় ও আচরণে স্বতই লক্ষ্য করা যেত। সমস্ত জিনিস-পত্র ফিটফাট সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল মুজিও। যে সমস্ত জিনিস সে নিয়ে এসেছে মালয়কে সঙ্গে নিয়ে তার বাঁধাছাদা খুলে ফেলল: কম্বল, রেশমী জিনিস, মখমলের জিনিস, বুটিতোলা পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, পানপাত্র, থালা, এনামেল-খচিত জলপাত্র, স্বর্ণরৌপ্যের জিনিসপত্র, মণিমুক্তো-খচিত পাত্র, হস্তীদন্ত-খচিত ঢেউ-খেলানো গোলাকার বাক্স, সুস্বাদু মশলা, গন্ধধূপ, বন্যজন্তুর চামড়া, অজানা পাখীর পালক, আরো নানা বিষয়ের নানা জিনিস—যার ব্যবহার-রীতিটা পর্যন্ত রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। এই সমস্ত মূল্যবান জিনিসের মধ্যে বিশেষ একটি হ'ল মুক্তোর একছড়া কণ্ঠহার। কোনো একটা গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দেওয়ার জন্যে তাকে এটা উপহার দিয়েছেন পারস্যরাজ স্বয়ং।

সেটা নিজের হাতেই পরিয়ে দেবার জন্যে সে ভালেরিয়ার অনুমতি চাইল। কণ্ঠহারটির ভার ও আশ্চর্য উত্তাপ অনুভব করে বিস্মিত হয়ে গেল ভালেরিয়া—মনে হ'ল যেন চামড়াই পুড়ে যাবে! খাওয়া-দাওয়ার পরে সন্ধ্যাবেলায় সকলে মিলে বসে আছে সাইপ্রেস ও লরেলের ছায়ায়,

মুজিও তখন আরম্ভ করল তার অভিযান-কাহিনী। বিচিত্র সব দূর-দেশের কথা : সে দেখেছে মেঘ-চুম্বিত পর্বত, মরুদেশ, সাগর-সমান নদী ; দেখেছে অসংখ্য প্রাসাদ, অজস্র মন্দির, সহস্র বছরের বনানী, রামধনু-রঙ পাখী ও পুষ্পরাজি : তারপর কতো শহর, কতো বিচিত্র জাতি—তাদের নামই তো রূপকথার মতো ! তার পরিচিত হয়ে গেছে সমস্ত পূর্ব-ভূভাগই : সে গেছে পারস্যে, আরবে—যেখানে সৃষ্টির প্রত্যেক কিছু থেকে অশ্বই বেশী সুন্দর ও বীর্যবান : সে গিয়েছে একেবারে ভারতের বুকের মধ্যে—যেখানে আছে বিরাট পাহাড়ী গাছের মতো বর্ধমান বিচিত্র জাতি : সে অভিযান করেছে চীন-তিব্বতের সীমান্ত পর্যন্ত—যেখানে নীরব-নিশ্চল ক্ষুদ্রচক্ষু একটি মানুষ্যের আকারেই অধিষ্ঠিত আছেন জীবন্ত-দেবতা মহান লামা, কতো অদ্ভুত তাঁর কাহিনী। ফেবিও এবং ভালেরিয়া দু'জনেই শুনে গেল মন্ত্রমুগ্ধের মতো। মুজিওর চেহারা বড়ো একটা বদলায়নি, ছেলেবেলা থেকেই তার মুখের রঙ কালো, অধিকতর জ্বলন্ত সূর্যের তপ্তরৌদ্রে পুড়ে পুড়ে এবার হয়েছে যেন আরো কালো—এই পর্যন্তই। কিন্তু তার মুখের ভাবখানায় তফাৎ হয়ে গেছে—হয়েছে আরো সংহত, গম্ভীর মর্যাদায় আরো সম্পূর্ণ। ব্যাঘ্রের গর্জন-ধ্বনিত বনান্ধকারে, শঙ্কিত-নির্জন পথে—যেখানে অসভ্য বন্য মানুষের দল নিশ্চুপ ব'সে থাকে নিঃসঙ্গ পথিককে ধ'রে নিয়ে নররক্তলোলুপা পাষাণদেবীর কাছে বলি দেবার জন্যে,—এমন কি সেইসব বিপজ্জনক ক্ষেত্রের অভিযান কাহিনী বর্ণনাকালেও তার মুখের উপরে প্রকাশ পায়নি বেশী-একটা চাঞ্চল্য। মুজিওর কণ্ঠস্বর হয়েছে যেন আরো গম্ভীর আরো শান্ত। শুধু তার হাত নয়, তার সমস্ত দেহই যেন হারিয়ে ফেলেছে ইতালীয় জাতের স্বাভাবিক ভাবভঙ্গীর সহজ-স্বাধীনতা। ভারতীয় ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে যে-সমস্ত অসাধারণ বিদ্যা সে শিখে এসেছে—তার দু'একটা প্রদর্শন করল অনুচর মালয়ের সহযোগিতায়। উদাহরণ-স্বরূপ : একটা পর্দার আড়ালে দৃশ্যতই অদৃশ্য হয়ে—সহসা আবির্ভূত হওয়া, আড়াআড়ি দুটি বংশদণ্ডের উপরে আঙুলের স্পর্শমাত্র রেখে শূন্যে অবস্থান।···ফেবিও মোটেই আশ্চর্য হ'ল না, কিন্তু ভালেরিয়া নিঃসন্দেহ-রূপে বিস্মিত ও ভীত হয়ে পড়ল······লোকটা কি কোনো যাদুকর? তারপরে, সে ছোট্ট একটি বাঁশী বাজিয়ে ঢাকা-ঝাঁপি থেকে ফণাধারী পোষা সাপগুলিকে যখন বাইরে আনতে আরম্ভ করে দিল—ওদের লকলকে

লিকলিকে ভয়ানক জিভগুলো দেখেই ভালেরিয়া সভয়ে মুজিওকে অনুরোধ করল ঐ জঘন্য জীবগুলিকে সরিয়ে রাখতে। নৈশ ভোজের সময় মুজিও লম্বা-গলার একটা গোলাকার সুরাপাত্র থেকে সুরা ঢেলে দিয়ে আপ্যায়িত করল বন্ধু ও বান্ধবীকে। আশ্চর্য তার সুবাস ও ঘনতা, তার সোনালী রঙের উপর সবুজ ছায়া—জেসপার পাত্রে ঢালবার সময় তা যেন জ্বলে জ্ব'লে উঠছিল এক আশ্চর্য আলোতে! আস্বাদও তার ইউরোপীয় কোনো সুরার মতো নয় মোটেই: খুব মিষ্টি, মসলাগন্ধী, এবং তাতে সর্বাঙ্গেই একটা আরাম-জড়ানো ঘুমের নেশা! ফেবিও এবং ভালেরিয়াকে এক-এক পাত্র দিয়ে, মুজিও নিজেও নিল একটা। ভালেরিয়ার পাত্রের উপরে ঝুঁকে পড়ে আঙুল নাড়তে নাড়তে কী যেন বিড়বিড় করছিল মুজিও। ভালেরিয়ার লক্ষ্য এড়াল না, কিন্তু তার সমস্ত কাজে সমস্ত ব্যবহারেই যেন একটা অদ্ভুত ও অসাধারণ কিছু ছিল ব'লে সে শুধু ভাবল: মুজিও কি ভারত থেকে কোনো নতুন ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছে অথবা সেখানকার প্রথাই এমনি? কিছুক্ষণ নীরব থেকে ভালেরিয়া জানতে চাইল—বিদেশ-ভ্রমণের মধ্যেও সে সঙ্গীত-সাধনা অটুট রেখেছে কিনা। উত্তর-স্বরূপ মুজিও তার ভারতীয় বেহালাটি আনতে পাঠাল মালয়কে। আধুনিক ধরণেরি তার সবটা, তবে চারটি তারের বদলে তার তিনটা; উপরিভাগ নীলাভ সর্পচর্মে ঢাকা, সরু-সরু ঘাটগুলির বাঁক অর্ধচন্দ্রাকার,—শেষপ্রান্তে সূক্ষ্মাগ্র একটি জ্বলন্ত হীরক!

মুজিও প্রথমে 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে কয়েকটি ভারতীয় রাগ বাজাল। ইতালীয় শ্রবণে সেগুলি অদ্ভুত এমন কি অমার্জিত বলেই ঠেকল—তারের ধাতব ধ্বনি মনে হ'ল ক্ষীণ বিলাপ। কিন্তু, মুজিও এবার যখন সর্বশেষ বাজনা ধরল—সহসা যেন অদ্ভুত কোনো আবেগে দুলে উঠল অনিন্দ্য সুর। সেই সুর ফুলে ফুলে প্রবাহিত হতে লাগল সম্মোহিতভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে—বেহালার মাথার সাপটির মতোই কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে! আর, এমন এক উত্তেজনা, আনন্দের এমন একটা বিজয়ী আবেগ এই সুরের জোয়ারে সব বাঁধ ভেঙে বার হ'ল যে, দুলে দুলে উঠতে লাগল ফেবিও এবং ভ্যালেরিয়ার বুকের গভীর পর্যন্ত। মুজিওর মাথা অনবত, বেহালার গায়ে বিন্যস্ত, গণ্ডদেশ ঈষৎ বিবর্ণ, ভ্রূযুগল একটি সরল রেখায় সংযুক্ত: সে যেন ধারণ করেছে আরো সংহত আরো গম্ভীর রূপ। বেহালার মাথার বাঁক-মুখের হীরকটি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রশ্মি—ওটাও যেন

স্বর্গীয় সুরে প্রদীপ্ত! মুজিও যখন সমাপ্তি টেনে বেহালা থেকে হাত নামাল, তখনো তার চিবুক ও কাঁধের মধ্যে বেহালাটি ঘনিষ্ঠভাবে আঁকড়ানো। ফেবিও আবেগভরে জিজ্ঞেস করল—'এটা কী, কী গান?' ভালেরিয়া একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না, কিন্তু মুগ্ধ তার সমস্ত সত্তাই নীরব প্রতিধ্বনি করতে থাকল স্বামীর প্রশ্নের। মুজিও এবার বেহালাটি টেবিলের উপর রাখল এবং চুলগুলি পিছন দিকে একবার একটু সরিয়ে বিনীত হাসির সঙ্গে বলতে লাগল—'ঐ রাগটি? হ্যাঁ, ঐ সঙ্গীতটি একবারমাত্র শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল সুদূর সিংহলে; স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে ওটা "বিজয়ী প্রেমের গান" নামে পরিচিত।'

ঐ সঙ্গীতটির জন্যে ফেবিও আবারো অনুরোধ করতে যাচ্ছিল। 'না, আবার অসম্ভব!'—মুজিও বলল—'আর তা ছাড়া, এখন বেলাও হ'য়েছে যথেষ্ট। শ্রীমতী ভালেরিয়ারও এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আমার পক্ষেও দরকার, আমি পরিশ্রান্ত।'

সমস্ত দিন মুজিওর আচার-ব্যবহার হ'ল ঠিক পুরানো দিনের বন্ধুর মতোই; কিন্তু সন্ধ্যায় বাইরে যাবার সময় সে ভালেরিয়ার হাতখানি নিজের হাতে চেপে ধরল ও নিজের আঙুলগুলি তার হাতের পাতে যেন নিষ্পেষিত করে দিল,—আর এমন তীক্ষ্ণভাবে তার উপর চোখ রাখল যে ভালেরিয়া তার চোখের পাতা উপরেই তুলতে পারল না; কিন্তু তার লাল-হয়ে যাওয়া গালের উপর সে সম্পূর্ণরূপেই অনুভব করল সেই দৃষ্টি। মুজিওকে কোনো কথা না ব'লে সে হাতটা ছাড়িয়ে নিল এবং যে দ্বার-পথে মুজিও চলে গেল সেই দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে! মনে পড়ল: আগেও তাকে দেখলে কেমন একটু ভয়-ভয় লাগত······আর এখন, যেন ভয়-বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ়! মুজিও চলে গেল তার ঘরের দিকে, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের ঘরে।

॥ ৪ ॥

ভালেরিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতেই পারল না; তার সমস্ত রক্তের মধ্যে যেন একটা নেশাভরা জ্বরোভাব, কানের মধ্যে সেই সঙ্গীতের অস্পষ্ট রেশ······তার কারণ কি ঐ সুরা, না মুজিওর কাহিনী, অথবা বেহালার সুর?······ভোরের দিকে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল ভালেরিয়া, এবং অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখল:

সে যেন যাচ্ছে একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে দিয়ে ; ছাদ তার নিচু, এরকম ঘর সে জীবনেও দেখেনি। দেয়ালগুলি স্বর্ণরেখা-অঙ্কিত ছোট ছোট টালি দিয়ে সাজানো। সরু সরু বাঁকানো থাম ধরে রেখেছে মর্মর-ছাদটাকে ; ছাদ ও থাম দুটোই যেন অর্ধস্বচ্ছ। একটা গোলাপী আভা ফুটে বেরুচ্ছে ঘরের সমস্ত দিক থেকে—একাকার হয়ে আছে এক রহস্যময় আলোতে। ঘরের সমস্ত কিছুই আরসীর মতো মসৃণ। মেঝের মাঝখানে পাতলা একটা কম্বলের উপর বুটিতোলা গদি, দুই কোণে প্রায় অদৃশ্যভাবে অবস্থিত প্রকাণ্ড একজোড়া জন্তুর আকারবিশিষ্ট দুটি ধূপাধার, তা থেকে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ধূম্রশ্বাস। কোথাও কোনো জানালা নেই। পর্দা-ঝুলোনো একটা কৃষ্ণবর্ণ দরজা দূর-দেয়ালের প্রান্তে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে। ঐ পর্দাটি সহসা ন'ড়ে উঠে সরে গেল…… ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল মুজিও! ঝুঁকে পড়ে দু'হাত বাড়িয়ে হাসছে! তার ভয়ানক বাহু দুটি এসে ভালেরিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরল সজোরে। অনেক ধস্তাধ্বস্তির পরে ভয়ের গোঙানি দিয়ে জেগে উঠল ভালেরিয়া! বিছানার উপরে সোজা বসে চারদিকটা সে তাকিয়ে দেখতে লাগল : তখনো বুঝে উঠতে পারেনি—সে কোথায় এবং তার কী হয়েছে…… সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ছুটছে……ফেবিও তার পাশেই শুয়ে আছে, সেও ঘুমে। জানালার দিকে ফেরানো তার মুখখানি পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোতে দেখাচ্ছে মড়ার মতো মলিন। মড়ার মুখের চেয়েও করুণ! ভালেরিয়া তার স্বামীকে জাগিয়ে তুললে সে সোজা তাকিয়েই—'কি হ'ল ?'—ব'লে আঁৎকে উঠল। 'আমি, আমি ভয়ানক একটা স্বপ্ন দেখেছি !'—চাপা গলায় উত্তর দিল ভালেরিয়া, তখনো ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার সর্বশরীর……

আর, সেই মুহূর্তেই মুজিওর ঘরের দিক থেকে একটা জোরালো সুর দুলে দুলে আসতে লাগল সাপের মতো। ফেবিও আর ভালেরিয়া দু'জনেই চিনল—মুজিওর সেই বিজয়ী প্রেমের গান। ফেবিও অনেকটা হতবুদ্ধি হয়ে তাকাল ভালেরিয়ার দিকে। ভালেরিয়া চোখ বুঁজে পাশ ফিরে রইল,—যেন শ্বাস রুদ্ধ করে শুনল সঙ্গীতের শেষ রেশটুকু পর্যন্ত। শেষ-কম্পনটি মিলিয়ে যেতে যেতে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল চাঁদ, এবং ঘরটাও হঠাৎ হয়ে গেল অন্ধকার। স্বামী-স্ত্রী কেউই একটি কথা না বলে পড়ে রইল বালিশে মাথা গুঁজে। কে যে কখন ঘুমিয়ে

পড়ল তা জানতেও পারল না।

পরদিন ভোরে প্রাতরাশের জন্যে ভিতরে এল মুজিও। তাকে বেশ প্রফুল্লই দেখাচ্ছিল। সানন্দেই সে ভালেরিয়াকে ডাক দিয়ে কাছে বসাল। ভালেরিয়া যেন কেমন হয়ে গিয়ে উত্তর দিল, আড়াল-চোখে মুজিওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, এবং তার শান্ত মুখ ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখ দেখে ভয় পেয়ে গেল।

মুজিও আজো কোনো গল্প বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আরম্ভেই ফেবিও তাকে বাধা দিয়ে বলল—'নতুন জায়গায় তোমার অসুবিধে হচ্ছে বুঝি? আমার স্ত্রী ও আমি তোমাকে সেই গানটি বাজাতে শুনছিলাম···'

'ও, তা হ'লে তোমরাও শুনেছ! হ্যাঁ, বাজাচ্ছিলাম বটে; কিন্তু আগে ঘুমিয়েছিলাম এবং এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি।' ভালেরিয়া চমকে উঠল। 'কি রকম স্বপ্ন?'—ফেবিও জানতে চাইল। ভালেরিয়ার মুখ থেকে চোখ একটুও না সরিয়ে মুজিও বলতে লাগল: স্বপ্ন দেখলাম, যেন এক প্রশস্ত ঘরের মধ্যে ঢুকছি। ছাদটা ভারতীয় পদ্ধতিতে কারুকাজ-করা? মোড়ানো থামগুলি ধরে আছে ছাদটাকে। দেয়ালগুলি টালি দিয়ে ঢাকা; সেখানে কোনো জানালা বা প্রদীপ ছিল না, তবু সমস্ত ঘরই ভরে আছে একটা গোলাপী আলোয়—সমস্তই যেন স্বচ্ছ পাথরে গড়া। কোণে কোণে চীনদেশী ধুপোধারগুলি থেকে উঠে আসছে ধুয়োর কুণ্ডলী, মেঝেতে পাতলা একটা কম্বলের উপরে বুটিতোলা বালিশ। পর্দা-ঝুলানো এক দোর-পথে আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম, অন্য দোরে একটি নারীমূর্তি—একদিন যাকে আমি ভালোবাসতাম! তাকে এত সুন্দর মনে হ'ল যে আগুন হয়ে আবার জ্বলে উঠল পুরনো দিনের চাপা-ভালোবাসা।

মুজিও অর্থপূর্ণ ভাবেই থেমে গেল হঠাৎ। ভালেরিয়া নিস্পন্দ, ক্রমশই যেন সে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল······নিশ্বাসও যেন ক্ষীণ হয়ে এল।

মুজিও বলল—'তারপরেই জেগে উঠে আমি ঐ গানটি বাজাতে আরম্ভ করি।'

'কে সেই নারী?'—ফেবিও জানতে চাইল।

'কে সে? এক ভারতীয় স্ত্রী, তার অর্থ দিল্লী শহরে তাকে দেখেছি।

সে অবিশ্যি এখন আর নেই, মৃত সে।'

'তার স্বামী?'—ফেবিও নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন জিজ্ঞেস করে বসে।

'তার স্বামীও পরলোকে, তাই তো শুনেছি। তারপর থেকে ঐ দু'জনকেই আর দেখতে পাইনি।'

ফেবিও বলে উঠল—'আশ্চর্য ঘটনা! আমার স্ত্রীও কাল রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে।'

মুজিও এবার তীক্ষ্ণভাবে স্থির-দৃষ্টি রাখল ভালেরিয়ার উপরে। 'আমাকে অবিশ্যি এখনো বলা হয় নি।'—ফেবিও এটুকুও যোগ করল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভালেরিয়া উঠে দাঁড়াল—হঠাৎ ঘর থেকে চলে গেল। প্রাতরাশের পরে আর দেরী না করে রওনা হল মুজিও, বলে গেল—ফেরারাতে তার জরুরী কাজ আছে, সন্ধ্যার আগে সে ফিরতে পারবে না।

॥ ৫ ॥

মুজিওর দেশে ফেরার কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। ভালেরিয়ার উপরে সাধ্বী সেসিলার রূপগুণ আরোপ করে ফেবিও একটি প্রতিকৃতি আঁকতে আরম্ভ করেছিল। বিখ্যাত লিওনার্দো দ্য ভিন্সি-র সুযোগ্য শিষ্য লিউনি ফেরারায় ফেবিওর কাছে আসতেন ও নিজের জ্ঞানমতো উপদেশ দেবার সংগে সংগে তাঁর মহান শিক্ষকের চিত্রণ-পদ্ধতির আদর্শটাও ধরিয়ে দিতেন। প্রকৃতিটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, বাকী শুধু মুখের উপরে বিশিষ্ট কয়েকটি তুলির টান; সেটুকু হ'লেই ছবিটি হয়ে দাঁড়াবে ফেবিওর গর্ব করবার মতো জিনিস। ফেরারার দিকে মুজিওকে রওনা হতে দেখে সে এসে দাঁড়াল তার কলাভবনে; এখানেই সাধারণত তার জন্যে প্রতীক্ষা করে ভালেরিয়া। কিন্তু ভালেরিয়া তো এখানে নেই! তাকে ডাকা সত্ত্বেও সাড়া এল না কোনো। ফেবিও মুহ্যমান হয়ে পড়ল একটা গোপন অস্বস্তিতে—চারদিক খুঁজতে লাগল। না তো, ঘরে কোথাও সে তো নেই। ফেবিও বাগানের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সেখানে তাকে দেখতে পেল নিরালা একটা পথের প্রান্তে। বেঞ্চিতে বসে আছে একেলা, মুখখানি ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর। হাঁটুর উপরে দুটি হাত জোড়-করা। তার পিছনে সাইপ্রেসের গভীর

সবুজের মধ্য থেকে উঁকি মারছে মর্মর-গঠিত এক নরছাগমূর্তি, মুখে দাঁত-বের-করা বিকৃত একটা শয়তানির হাসি ; একটা বাঁশীর মুখে রেখেছে সে তার বিদ্বেষভরা ফুলানো অধরোষ্ঠ ! স্বামীকে দেখে স্পষ্টতই স্বস্তি লাভ করল ভালেরিয়া এবং ফেবিওর ব্যস্তসমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বলল—তার সামান্য মাথা ধরেছে, ও কিছুই না,—এখনি সে এসে বসছে। ফেবিও তাকে কলাভবনে নিয়ে গেল, মনের মতো ভংগীতে বসিয়ে তুলি ধরল, কিন্তু বারবারই খুব অসুবিধে বোধ করতে লাগল,—মুখখানি কিছুতেই মনের মতো ক'রে সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না : মুখখানি কিছুটা মলিন ও ক্লান্ত দেখায় ব'লে নয়,—না, তা নয় ; পবিত্র যে দেবোপম লাবণ্য তাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করত—ঐ মুখের যেটুকু, যেটুকু ভালেরিয়াকেই সাধ্বী সেসিলা রূপে আঁকতে প্রেরণা জুগিয়েছে—তাই তো সেদিন ওমুখে সে খুঁজে পেল না ! তুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফেবিও তার স্ত্রীকে বলল—আঁকবার মতো অবস্থায় নেই সে, এবং এখন তার বরং শুয়ে থাকাই ভালো, কারণ শরীরটাও মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না। সঙ্গেসংগেই চিত্রপটটাকে ফেবিও ফিরিয়ে রাখল দেয়ালের দিকে। ভালেরিয়াও সায় দিয়ে বলল—সত্যিই তার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার, এবং বারবার মাথাধরার কথা উল্লেখ করে চলে গেল শোবার ঘরে।

কলাভবনে বসে আছে ফেবিও একা। তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে অদ্ভুত রকমের একটা বিভ্রান্ত অনুভূতি, সে নিজে তার কোনো অর্থই বুঝে উঠতে পারছে না। তারি বাড়ীতে মুজিওর থাকাটা, ফেবিওর নিজেরি সনির্বন্ধ অনুরোধের জন্যেই থাকাটা—এখন ফেবিওরি কেমন বিস্বাদজনক লাগছিল। তার যে ঈর্ষা হয়েছে তা নয় ; ভালেরিয়ার প্রসঙ্গে ঈর্ষার কথা ভাবাও চলে না। কিন্তু তার বন্ধুর মধ্যে আগের দিনের সেই মানুষটিকে সে যেন আর চিনতে পারছে না। মুজিও যেন ঐ দূরদেশ থেকে তার সঙ্গে একাত্ম করে নিয়ে এসেছে অদ্ভুত অজ্ঞাত ও অভিনব সবকিছুই,—শুধু নিয়ে এসেছে নয়, তার সমস্ত হাড়ে-মাঁসেই মিশে গেছে—মিশে গেছে যতসব যাদুগুণের কাজ, বিচিত্র সঙ্গীত-সুরা, এই মূক মালয়, এমনকি মুজিওর পোশাক থেকে নিঃসৃত উগ্র সুগন্ধ, তার চুল, তার নিশ্বাস পর্যন্ত ! এই সমস্ত মিলে ফেবিওর মধ্যে জাগিয়ে তুলছে একটা সন্দেহ, এমনকি শঙ্কার মতোই একটা অনুভূতি। মালয়ই বা কেন টেবিলের পাশে সাপের মতো অমন অপ্রীতিকর চোখে

তাকিয়ে থাকে এই ফেবিওর দিকেই ? সে যে ইতালীয় ভাষা জানে প্রত্যেক কাজেই তা ধরা পড়েছে। তার প্রসঙ্গেই মুজিও একদিন বলেছে : লোকটা জিভ হারিয়ে যে বিরাট ত্যাগ সহ্য করেছে, তার বিনিময়ে সে এখন আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। কেমন প্রকৃতির শক্তি তা ? আর, জিভের বিনিময়েই বা তা সে কেমন করে লাভ করল……এই সমস্ত ব্যাপারই একেবারে অদ্ভুত ধরণের……একেবারেই দুর্বোধ। ফেবিও তার স্ত্রীর ঘরে এল ; তখনো সে শুয়ে আছে, কিন্তু ঘুমোয়নি। ফেবিওর পায়ের শব্দ শুনেই সে চমকে উঠল, কিন্তু তাকে দেখে খুশীই হ'ল— বাগানে সেই দেখা হবার সময়কার মতোই। ফেবিও বিছানার একপাশে ব'সে ভালেরিয়ার হাতটুকু নিল নিজের হাতের মধ্যে, কিছুক্ষণ নীরব থেকে তাকে জিজ্ঞেস করল,—গতরাতে এমন কি স্বপ্নে সে অমন ভয় পেয়ে ব'সেছে ; তাও কি মুজিওর বর্ণিত স্বপ্নের মতোই ? ভালেরিয়া আরক্ত হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি বলল—'না, না, তা নয় ! আমি দেখেছি— দেখেছি যে ভয়ানক একটা জীব এসে আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে।'

'একটা ভয়ানক জীব, মনুষ্যাকারে ?'—ফেবিও লেগে রইল।

'না, একটা জন্তু—সে একটা জন্তু।' ভালেরিয়া পাশ ফিরে তার আতপ্ত মুখখানি বালিশের মধ্যে লুকাল। ফেবিও আরো কিছুক্ষণ তার হাতখানি ধরে রাখল, নিঃশব্দে তুলে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করাল, তারপর চলে গেল।

এই দুটি যুবক-যুবতীই সারাটা দিন কাটাল হৃদয়ে একটা গুরুভার নিয়ে, তাদের মাথার উপরে ঝুলছে যেন কৃষ্ণবর্ণ কিছু……কিন্তু সে যে কী—ওরা কেউই তো জানে না। ওরা আরো ঘনিয়ে এসে এক হয়ে থাকতে চায়, কিন্তু ওদের শাসিয়ে ফিরছে যেন অশুভ কোনো শক্তি ! কিন্তু একজন আর জনের কাছে বলবে কী জানে না তো। ফেবিও একবার প্রতিকৃতিটায় হাত লাগাতে চেষ্টা করল, একবার 'এরিস্তো' খুলে পড়তে— অল্পদিন হ'ল এঁর প্রকাশিত কবিতা মুখর করে তুলেছে সমস্ত ইতালীকেই। কিন্তু কিছুতেই মন লাগল না……সন্ধ্যার শেষে ঠিক নৈশ ভোজনের সময় ফিরে এল মুজিও।

তাকে আরো শান্ত, আরো প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল, কিন্তু এখানকার প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো কথাই বলছিল না সে, দৈনন্দিন সাধারণ বিষয় নিয়েই

ফেবিওকে নানাকথা জিজ্ঞেস করে কাটাল : জার্মাণ-যুদ্ধ, সম্রাট চার্লসের কথা, তার নিজের রোম ঘুরে আসবার ইচ্ছার কথা, নতুন পোপকে দর্শন করার সঙ্কল্প……ইত্যাদি ইত্যাদি ! এবার সে ভালেরিয়াকে পরিবেশন করল কিছুটা সিরাজ-সুরা। কিন্তু সে প্রত্যাখান করলে নিজের মনেই যেন বিড়বিড় করে বলছিল—'এখন আর দরকার হবে না নিশ্চয়ই।'

ঘরে ফিরে এসে ফেবিও শিগগির ঘুমিয়ে পড়ল, ঘণ্টাখানেক পরে জেগে উঠল হঠাৎ এবং এক সুনিশ্চিত বিশ্বাসের মতোই তার যেন মনে হ'ল : সঙ্গে কেউই শুয়ে নেই—ভালোরিয়া পাশে নেই তার ! তৎক্ষণাৎ উঠে বসতেই ফেবিও দেখল : তার স্ত্রী রাতের পোশাকে ঘরে এসে ঢুকছে বাগানের দিক থেকে। ফুটফুটে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে চাঁদ ; আগেই কিছুটা বিষ্টি হয়ে গেছে। ভালেরিয়ার চক্ষু বোজা, পাথরের মতো নিস্পন্দ মুখে ভয়-বিস্ময়ের ছাপ। বিছানার দিকে সে এগিয়ে আসছে, বাড়িয়ে-দেওয়া দু'হাত দিয়ে বিছানা খুঁজে নিয়ে—শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি অথচ নিঃশব্দে। তার দিকে ফিরে ফেবিও কিছু জিজ্ঞেস করল, কিন্তু উত্তর এল না কোনো ; মনে হ'ল গভীর ঘুমে সে অচেতন ! গায়ে হাত দিযে ফেবিও তার পোশাক ও চুলের উপরে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি অনুভব করল, আর খালি পায়ে লাগানো বালুকণা ! ফেবিও অমনি একলাফে বিছানা থেকে উঠে আধোখোলা দরজা দিয়ে দৌড়ে এল বাগানের মধ্যে। চাঁদের আলোয় চারিদিকের সবকিছুই উজ্জ্বল। ফেবিও তার চারিদিকটা লক্ষ্য করে দেখল : পথের বালুর উপরে দুইজোড়া পায়ের দাগ ; একজোড়া খালি, এবং এই দাগগুলিই চলে গেছে একটা হেনাকুঞ্জের দিকে। হতবুদ্ধির মতোই দাঁড়িয়ে রইল ফেবিও। এমন সময় সহসা আগের রাতে শোনা সেই সঙ্গীতের সুর বেজে উঠল দু'কান ভ'রে। ফেবিও আঁৎকে উঠে মুজিওর বাড়ীর মধ্যে দৌড়ে এল : ঠিক ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে মুজিও, বেহালা বাজাচ্ছে। তার কাছে ধেয়ে গেল ফেবিও—'তুমি এই বাগানের মধ্যে ছিলে ? তোমার পোশাকও যে বর্ষায় ভিজা !'

'না, আমি জানি না। মনে হয়, আমি তো বাইরে যাইনি !'—মুজিও আস্তে আস্তে জবাব দিল। ফেবিওর আবির্ভাব ও উত্তেজনা দেখে সে যেন বিস্মিত। ফেবিও সজোরে তার হাত ধরল—'আবার কেন ঐ গান বাজাচ্ছ ! এবারেও কি স্বপ্ন দেখেছ ?'

মুজিও তেমনি বিস্মিত ভাবে ফেবিওর দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো কথাই বলল না।

'কথার উত্তর দাও?'

মুজিও শুধু গুনগুন করে প্রলাপ বিকারের মতো নিজের মনেই বলতে আরম্ভ করল—

'রুপোর একটি থালার মতন
আকাশে নীরব চাঁদ,
সাপের মতন চিকচিক ক'রে
নদী বয় সারারাত;
শত্রুরা সব ঘুমে অচেতন,
বন্ধুরা জেগে আছে;
বাজের নখরে ভীরু পাখী ডরে—
বলো কে কোথায় কাছে!'

ফেবিও দু পা পিছিয়ে গিয়ে মুজিওর দিকে আড়চোখে চেয়ে রইল, এক পলক কী ভাবল···তারপরে চলে এল ঘরে তার বিছানায়।

নিজের কাঁধের উপরেই ভালেরিয়ার মাথা গোঁজা, হাত দু'টি মরার মতো পড়ে আছে দু'পাশে—গভীর ঘুমে নিষুপ্ত। ফেবিও তখনি তাকে জাগাতে পারল না, অথচ ভালেরিয়ার চোখ কিন্তু তার দিকেই চেয়ে আছে স্থিরভাবে! সহসা সে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরল বিমূঢ় আলিঙ্গনে। তখনো তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে 'কি, কি হয়েছে? মণি আমার, ভয় নেই! কি হয়েছে বলো।'—ফেবিও তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বারবার বলতে লাগল। কিন্তু ভালেরিয়া তখনো অবশ হয়ে লেগে আছে স্বামীর বুকে। 'ওঃ কী ভয়ানক স্বপ্ন!'—ফেবিওর গায়ে মুখ চেপে ফিসফিস করে বলছে। ফেবিও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ভালেরিয়া কিন্তু ভয়ে তখনো কাঁপছে··· ভোরের প্রথম আলোয় কাচের জানালা আস্তে আস্তে হয়ে উঠতে লাগল সোনা—ভালেরিয়াও ঘুমিয়ে পড়ল স্বামীর দুই বাহুর মধ্যে।

॥ ৬ ॥

পরের দিন ভোর থেকেই বাইরে রইল মুজিও। ভালেরিয়া তার স্বামীকে ব'লে কাছাকাছি গির্জায় তার সাধুবাবা লরেঞ্জোর কাছে

চলে এল, তাঁর উপদেশে ও আশীর্বাদে এই আকস্মিক অশান্তি ও ক্লান্তির একটা কিনারা খুঁজে পাবে—এই আশায়।···দুপুর বেলায় ভালেরিয়া সাধুবাবাকে সঙ্গে নিয়ে এল। আগেই 'সবকিছু খুলে বলা হয়েছে, বুঝিয়ে বলা হয়েছে মনের প্রত্যেকটি অলিগলির অশান্তির কথা। ফেবিওকে এক সময় একা পেয়ে সব আলাপ-আলোচনার শেষে সাধুবাবা তাঁকে বললেন: প্রথমে যত শিগগির সম্ভব তার ঐ বন্ধুটিকে বিদায় করা দরকার। কারণ, তার গল্প আর তার সমস্ত অদ্ভুত আচার-ব্যবহারের প্রভাবেই সে ভালেরিয়ার মনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। তা ছাড়া, সাধুবাবার মতে মুজিও এতদিন তার প্রতিজ্ঞাও ঠিকমতো রক্ষা করেনি। খ্রীষ্টধর্মের আলো-বঞ্চিত নানাদেশে এতদিন কাটাবার ফলে সে কতগুলি বিকৃত ধর্মবিশ্বাসের বিষাক্ত বীজও সেসব দেশ থেকে সঙ্গে নিয়ে এসে থাকবে, গোপন যাদুশক্তিও হয়ত আয়ত্ত করে এনেছে। কাজেই বহুদিনের বন্ধুত্বের যদিও একটা দাবী থাকা স্বাভাবিক, তবু বিজ্ঞ দূরদর্শিতা অঙ্গুলি-নির্দেশ করে তফাৎ হয়ে থাকবার প্রয়োজনের দিকেই।

সাধুবাবার প্রস্তাবে ফেবিও তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। তাঁর উপদেশ শুনে ভালেরিয়া এমন কি প্রফুল্লই হয়ে উঠল।

ফেবিও স্থির করল, নৈশ ভোজনের পরেই মুজিওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেবে: কিন্তু তার অদ্ভুত বন্ধুটি তখনো ফিরল না। ফেবিও ঠিক করল—কাল পর্যন্ত মুজিওর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা হবে। তারপর শুতে গেল স্বামী-স্ত্রী।

॥ ৭ ॥

ভালেরিয়া শিগগিরি ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমোতে পারল না ফেবিও। এই রাত্রির নীরবতার মধ্যে সে যা-কিছু দেখেছে ও অনুভব করেছে সমস্তই ফুটে উঠল আরো স্পষ্ট। ব্যগ্র ও একাগ্রভাবে সে নিজের সামনে কতকগুলি প্রশ্ন খাড়া করে রাখল, কিন্তু আগের মতোই সে খুঁজে পেল না তার উত্তর। মুজিও কি সত্যসত্যই যাদুকর হয়েছে? আর, ইতিমধ্যেই কি ভালেরিয়ার উপরে তার বিষাক্ত প্রয়োগ চালায়নি?··· ভালেরিয়া অসুস্থ, কিন্তু তার অসুখটাই বা কী? হাত দিয়ে মাথা ধরে নিশ্বাস রুদ্ধ করে শুয়ে আছে ফেবিও—নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে নানারকম গ্লানিকর চিন্তা-ভাবনার মুখে।

নির্মল আকাশে চাঁদ উঠেছে আবার। মুজিওর ঘরের দিক থেকে অর্ধস্বচ্ছ জানালার কাচের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলোর সংগে—একি, ফেবিও কি স্বপ্ন দেখছে! আলোর সঙ্গে বয়ে আসতে লাগল সুরভিত হালকা-হাওয়ার মতো একটা নিশ্বাস যেন···তার পরেই আকুল আগ্রহের ফিস্ ফিস্ শব্দ···এবং সেই মুহূর্তেই ফেবিও লক্ষ্য করল—ভালেরিয়া যেন নড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। চমকে চেয়ে রইল ফেবিও: ভালেরিয়া উঠে পড়ল—প্রথমে এক পা বাড়াল বিছানার উপর, তারপরে আর এক পা বিছানার বাইরে—তাকে যেন পেয়ে বসেছে অপদেবতায়। তার লক্ষ্যহীন দৃষ্টি পাথরের মতো নিস্পন্দ, হাত দুটি সামনে বাড়িয়ে দেওয়া···এগিয়ে চলেছে সে বাগানের দিকে। ফেবিও অমনি অন্য একটা দরজা দিয়ে দৌড়ে চলে গেল ঘরের বাইরে, এবং ঘরের কোণ ঘুরে এসে বাগানে বেরিয়ে যাবার দরজাটায় খিল দিয়ে দিল বাইরের দিক থেকে···খিলে হাত দিয়েছে কি, এমন সময় পিছন থেকে কে···ঠেলা দিয়ে দিয়ে দরজা খুলতে চেষ্টা করছে বারবার···আর সঙ্গেসঙ্গে সে কী ব্যাকুল গোঙানি!

কিন্তু মুজিও তো এখনো ফেরেনি শহর থেকে!

—কথাটা হঠাৎ ফেবিওর মাথায় খেলে যেতেই বেগে সে ছুটে গেল মুজিওর ঘরের দিকে।

আর, সেখানে?

জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল স্পষ্ট পথ ধরে তার দিকেই আসছে মুজিও, তাকেও যেন কিসে পেয়েছে! দুই হাত সামনে এগিয়ে দেওয়া, দৃষ্টি নেই খোলা দুই চোখে। ফেবিও তার কাছে দৌড়ে এল, কিন্তু সেদিকে কোনো খেয়াল না ক'রে তেমনি এগিয়ে আসছে মুজিও—আস্তে আস্তে একটির পর একটি পা ফেলে। তার সংহত মুখখানা চাঁদের আলোয় হাসছে, মালয়ের মুখের মতোই! ফেবিও তাকে নাম ধরে ডাকতে যাবে, সেই মুহূর্তেই পিছনে তাদের ঘরের দিক থেকে সে শুনতে পেল জানালার খট্ খট্ শব্দ···চারদিকটা লক্ষ্য করল···ঠিক শোবার ঘরের জানালাটা আগাগোড়া খোলা এবং ভালেরিয়া এক পা শূন্যে বাড়িয়ে দিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে······তার হাত দুটি যেন মুজিওকে খুঁজছে···সে যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে তার দিকে যাবার জন্যে!

ফেবিওর বুক হঠাৎ জ্বলে উঠল অসহ্য ক্রোধে—'জঘন্য যাদুকর!'—ভয়ঙ্কর এক চীৎকার ছেড়ে সে এক হাতে মুজিওর ঘাড় চেপে

ধরল, আর হাতে নিজের কোমরের তরবারি খুঁজে নিয়ে আগাগোড়াই ঢুকিয়ে দিল তার পার্শ্বদেশে।

মুজিও তীক্ষ্ম চীৎকারে দুই হাত দিয়ে ক্ষতটা চেপে ধরে ছুটে গেল নিজের ঘরের দিকে···আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ভালেরিয়াও ঐরূপ একটা তীক্ষ্ম চীৎকার ছেড়ে সোজা পড়ে গেল নিচে একেবারে ঘাসের উপরে সাইপ্রাস-গাছটার কাছে···ফেবিও দৌড়ে গেল, তাকে বিছানায় তুলে নিয়ে কথা বলতে লাগল।

অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোখ মেলে চাইল, এবং গভীর অথচ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল···যেন এইমাত্রই সে উদ্ধার পেল আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে···তার স্বামীকে সামনে দেখতে পেয়ে দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে তার কাছে আরো ঘনিয়ে শুলো—'ও তুমি, তুমি !' থেমে গেল ভালেরিয়া, ধীরে ধীরে তার হাতের বাঁধন খুলে গেল ; মাথা এলিয়ে দিল এবং স্বস্তিভরা হাসিমুখে আস্তে আস্তে বলতে লাগল—'বাঁচলাম, সব চলে গেছে, বাঁচলাম। ···কিন্তু, কী যে ক্লান্ত আমি !' এবারে সে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুম ঠিক গভীর হ'ল না।

॥ ৮ ॥

পাশেই ঘুমিয়ে আছে ভালেরিয়া। একটু শুকনো দেখালেও আগের চেয়ে আরো শান্ত তার মলিন মুখখানি। মুখখানি দেখতে দেখতে ফেবিও চিন্তা করছিল সদ্য ঘটনার বিষয়টা···এখন সে করবে কী ?···কী ভাবেই বা অগ্রসর হওয়া উচিত ? যদি সে মুজিওকে হত্যা করে থাকে, —মনে করে দেখল কত গভীর পর্যন্ত তরবারি চালিয়ে দিয়েছে,—তবে তো লুকিয়ে ফেলাও অসম্ভব, আর্ক-ডিউক এবং জজের সামনে সমস্তই প্রকাশ করতে হবে···কিন্তু এমন দুর্বোধ ব্যাপার কীভাবেই বা বুঝিয়ে বলবে তখন ? কীই-বা বলবে ফেবিও ? সে নিজেই তার আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হত্যা করেছে নিজেরি বাড়ীর ভিতরে !···তারা জানতে চাইবে, কেন ? কিসের জন্য ?···কিন্তু—মুজিও যদি মরে না থাকে ? আর বেশীক্ষণ অনিশ্চিতের মধ্যে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। ভালেরিয়াকে ঘুমে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সে সাবধানে বিছানা থেকে উঠে গেল বাইরে—অগ্রসর হ'ল কাছারী ঘরের পথ ধ'রে। নিঃশব্দ নিস্তব্ধ সব, জানালায় একটি-

মাত্র আলো। কম্পিত ভীত বুকে খুলল সে সদর-দোরটা। দোরে তখনো দেখা যাচ্ছে রক্তমাখা আঙুলের দাগ, পথের বালুতে রক্তের কালো কালো ফোঁটা। অন্ধকার-প্রায় একটা ঘরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'ল ফেবিও, চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে সে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত—দাঁড়িয়ে গেল। ঘরের ঠিক মধ্যিখানে একটা পারসিক গালিচা, তার উপর আঁকা কালোরঙের নানা ছবি। মুজিওকে শুইয়ে রাখা হয়েছে—গায়ে জড়ানো একটা লাল শাল, মাথার তলায় একটা বুটিতোলা বালিশ। মুখখানা তার মোমের মতো ফ্যাকাশে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সটান শিথিল, চোখ বোঁজা, নীলাভ চোখের পাতা ছাদের দিকে, নিশ্বাসের কোনো সাড়াশব্দ নাই—একেবারে মড়ার মতো। তার পায়ের কাছে বাঁ দিকে ফার্ণের মতো কী-একটা অজানা গাছ-গাছড়ার ডাল নিয়ে ঝুঁকে বসে আছে মালয়, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার প্রভুর দিকে। মেঝের উপরে ছোট একটি সবুজ প্রদীপ, ঘরের মধ্যে সেইটিই একমাত্র আলো। শিখাটি অকম্পিত, ধুঁয়োহীন। ফেবিওকে প্রবেশ করতে দেখে মালয় নড়ল না একটুও—ফেবিওর দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে আবার ন্যস্ত রাখল মুজিওর উপরে······মাঝে মাঝে ডালটি সে হাওয়ায় দোলাতে লাগল। তার মূক অধরোষ্ঠ নড়তে নড়তে ফাঁক হয়ে উচ্চারণ করছে কী যেন নিঃশব্দ বাণী মেঝেতে মালয় এবং মুজিওর মাঝখানে রয়েছে ফেবিওর সেই তরবারিখানা। মালয় সেই রক্তমাখা তরবারির উপর হাতের ডালখানা দিয়ে জোরে একটা আঘাত হানল। কয়েক পলক কেটে গেল, আরো কয়েক পলক। ফেবিও অগ্রসর হয়ে মালয়ের কাছে ঝুঁকে পড়ে চাপা-গলায় জিজ্ঞেস করল—'এ কি মরে গেছে?' মালয় মাথাটা নিচু রেখেই জড়ানো-শালের মধ্য থেকে হাত বার করে দরজা দেখিয়ে দিল আদেশের ভঙ্গীতে। ফেবিও আবার জিজ্ঞেস করতে যাবে, কিন্তু আবার ঐ উদ্ধত ইঙ্গিত দেখে সোজা বেরিয়ে গেল ক্রোধে ও বিস্ময়ে—কিন্তু বাধ্য এক জীবের মতো! গিয়ে দেখল, ভালেরিয়া আগের মতোই ঘুমোচ্ছে, মুখের ওপরে শান্তির নম্রতর ছায়া। ফেবিও পোশাক খুলল না, বসে পড়ল জানালার পাশে—দু'হাতে মাথাটা ধরে আবার ডুবে গেল ভাবনায়। সূর্য ওঠার পরেও সে একঠাঁয়ে বসে রইল সেই জায়গায়ই। ভালেরিয়া ঘুম থেকে ওঠেনি তখনো।

॥ ৯ ॥

ফেবিও ভেবে রাখল, ভালেরিয়া জেগে ওঠা পর্যন্ত দেরী করে সে রওনা হবে ফেরারার দিকে। হঠাৎ শোবার ঘরের দুয়ারে টক্ টক্ শব্দ ক'রে ডাকল কেউ। ফেবিও বেরিয়ে দেখল তারি পুরাতন ভৃত্য এন্টনিও। বৃদ্ধটি বলতে আরম্ভ করল : মালয় এইমাত্র খবর পাঠিয়েছে যে তার প্রভু মুজিও পীড়িত হয়ে পড়েছেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত-কিছু নিয়ে শহরে চলে যেতে ইচ্ছে করেন। আপনার কাছে তিনি বাক্স-বিছানা বাঁধার জন্যে কয়েকটি ভৃত্যের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন, আর চেয়েছেন কয়েকজন অনুচর। এ বিষয়ে আপনার কি অনুমতি হয়?

'মালয় তোমাকে এই খবর পাঠিয়েছে?'—ফেবিও জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কি রকম? সে তো বোবা!'

'এই দেখুন, এই কাগজে আমাদের ভাষায় এবং বিশুদ্ধ ভাষায়ই লিখে দিয়েছে সবকথা।'

'তাহ'লে, মুজিও পীড়িত?'

'আজ্ঞে, তিনি খুবি পীড়িত, কিছুই আর দেখতে শুনতে পান না।'

'ওরা কি কোনো ডাক্তার দেখিয়েছে?'

'না, মালয় বারণ করে দিয়েছে!'

'তুমি বলছ, মালয় নিজেই ওটা লিখে পাঠিয়েছে?'

'আজ্ঞে, সে-ই।' ফেবিও মুহূর্তকাল চুপ করে রইল। শেষে বলে দিল—তবে সব প্রস্তুত করে দাও।' তা হ'লে মরেনি সে···ফেবিও বুঝে উঠতে পারল না—সে খুশী হবে কি দুঃখিত হবে? পীড়িত? কিন্তু কয়েক ঘন্টা আগেও তো তাকে দেখাচ্ছিল ঠিক একটা মড়ার মতোই।

ভালেরিয়ার কাছে গেল ফেবিও; সজাগ হয়ে সে মাথা তুলে দেখল একবার। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দু'জনের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করল—দীর্ঘ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। 'সে একেবারেই গেছে তো?'—ভালেরিয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করল। শিউরে উঠল ফেবিও।

'একেবারেই গেছে? তুমি কি বলতে চাও যে···'

'সে চলে গেছে তো?'—ভালেরিয়া আবার বলল। ফেবিওর বুক

থেকে এবার নেমে গেল যেন মারাত্মক একটা বোঝা—'না, এখনো যায়নি। আজি অবিশ্যি চলে যাবে।'

'আমাদের সঙ্গে তার আর—আর কোনোদিনই দেখা হবে না তো?'

'না, আর কখনো নয়!'

'তা হ'লে, ওরকম স্বপ্নও আর দেখব না?'

'না।'

ভালেরিয়া আবারো একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। শান্ত একটি হাসির রেখা তার ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল আবার, সে তার হাত দুটি বাড়িয়ে দিল স্বামীর দিকে। 'আমরা তার কোনো কথা ভুলেও আর কোনোদিন বলব না—প্রিয় আমার! তুমি, তুমি আমাকে কথা দাও!··· লোকটা যে পর্যন্ত চলে না যায় আমি এই ঘর থেকে আর বেরুচ্ছি না··· তুমি এখন আমার ঝিদের পাঠিয়ে দাও। আচ্ছা শোনো, ঐটি আগে নিয়ে যাও।'—সে দেখিয়ে দিল বিছানার পাশে ছোট্ট একটি টেবিলের উপরকার মুক্তোর হারটি—মুজিওর উপহার-দেওয়া হার!—'এই এখনি, খুব গভীর একটা কুয়োর ভিতরে দূর করে দাও। এবার তুমি আমার কাছে এস, আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরো। আমি তোমারি—তোমারি ভালেরিয়া। তুমি এস, হ'্যা,—ঐ লোকটা চলে যাওয়ার পর।'

ফেবিও কণ্ঠহারটি তুলে নিল, তখন তার মুক্তোগুলো দেখাচ্ছিল যেন কেমন নিষ্প্রভ! স্ত্রীর নির্দেশমতো কাজ করে গেল ফেবিও। তারপর, বাগানের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কাছারির দিকটায় দূর থেকেই সে লক্ষ্য রাখছিল। তখন সবে শুরু হয়েছে যাত্রার জোগাড়-যন্তরের সোরগোল। ব্যস্তসমস্ত ভৃত্যেরা বাক্স-পেটারা এনে বোঝাই করছে ঘোড়ার গাড়ী···কিন্তু মালয় কোথায়? কাছারির মধ্যে কি ঘটছে তা দেখবার জন্যে একটা অদম্য ইচ্ছা যেন সেখানে টেনে আনল ফেবিওকে। তার মনে পড়ল, ঘরের পিছন দিকে গোপন একটা দরজা আছে, সে পথ দিয়েও মুজিওর শুয়ে থাকবার জায়গাটায় যাওয়া যায়। চাপা-পায়ে কাছে এসে দেখতে পেল, সেই দোরটিতে খিল নেই। ভারী পর্দাটা দুই দিকে হাত দিয়ে সরিয়ে ঘরের মধ্যে থতমভাবে একবার তাকাল ফেবিও।

॥ ১০ ॥

মুজিও কম্বলের উপর শুয়ে নেই। যাত্রার জন্যে প্রস্তুতভাবেই বসে আছে একটা আরাম-কেদারায়। ফেবিও প্রথম যখন তাকে দেখে এসেছে,

তেমনি ঠিক মরার মতো। তার শিথিল মাথাটা ঝুলে পড়েছে চেয়ারের পেছনে, হাত দুটা মরার হাতের মতো শক্ত, নিচে ঝুলছ দু'পাশে; বুকে নেই নিশ্বাসের ওঠা-নামা! মেঝের উপর চেয়ারের কাছে শুষ্ক নানান গাছ-গাছড়া ছড়ানো, তা থেকে বেরুচ্ছে তীব্র একটা দম-আটকানো রকমের গন্ধ, আর কস্তুরীর গন্ধ। প্রত্যেকটি পান-পাত্রের গলায় কুণ্ডলী-পাকানো পিতল-রঙ ছোট এক-একটি সাপ, তাদের সোনালী চোখ মাঝে মাঝে জ্ব'লে উঠছে চকচক ক'রে। মুজিওর দিকে সোজা মুখ রেখে হাত দুই দূরে মালয়ের দীর্ঘদেহটি দাঁড়িয়ে। ঢিলে রকমের বড় একটা পোশাক তার গায়ে, কোমরে জড়িয়ে বাঁধা বাঘের একটা লেজ। মাথায় অতিকায় একটা কালো টুপি, ঝুঁকে পড়েছে মুখের ওপর। নিস্পন্দভাবে সে শুধুমাত্র দাঁড়িয়েই ছিল না, এক-এক সময় সে যেন প্রার্থনা করছিল ভক্তিভরে মাথা নুইয়ে, তার পরক্ষণেই আবার পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে উঠছিল একেবারে সোজা। তারপরে সে তালে তালে দুলে দুলে হাত দুটি সটান বাড়িয়ে দিচ্ছিল সম্পূর্ণটা, এবং মুজিওর দিকে ধেয়ে গিয়ে আদেশের ও ভয় দেখাবার ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি হেনে কপাল কুঞ্চিত ক'রে—পদাঘাত করছিল মেঝেতে। এইসব করার ফলে তার যেন খুব পরিশ্রম, এমন কি কষ্টই হচ্ছিল : জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল, সমস্ত মুখ দিয়ে ঘাম পড়ছিল দরদর ক'রে। এবার সে মেঝেতে বসে পড়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে পুরো একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করল, প্রাণপণ চেষ্টায় দৃঢ়বদ্ধ প্রসারিত মুষ্টি দুটি নিজের দিকে টেনে আনতে লাগল বল্গার মতো ক'রে—যেন সত্যিসত্যিই ধ'রে আছে কতগুলি রশি! ফেবিও এবার ভীষণ ভয় পেয়ে গেল : মুজিওর মাথাটাও যে আস্তে আস্তে চেয়ারের পিঠটা ছেড়ে মালয়ের হাতের অনুসরণেই অগ্রসর হচ্ছে সামনের দিকে!···মালয় ছেড়ে দিল দৃঢ়মুষ্টি, মুজিওর মাথাটাও আবার একটা বোঝার মতোই পড়ে গেল পিছনে। মালয় বারবার বাধ্যের মতোই সেই গতির অনুসরণ করতে থাকল। তখন ফুটে উঠেছে পান-পাত্রের গাঢ়-কৃষ্ণ তরল পদার্থটা, পাত্রগুলি থেকেও যেন শব্দ হতে লাগল ক্ষীণ ঘণ্টাধ্বনির মতো। এক একটি পেতলের সাপ এক-একটি পাত্রকে জড়িয়ে ধরেছে আরামে। মালয় এবার একপা অগ্রসর হ'ল, ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বে তুলে চক্ষু দুটি আগাগোড়া বিস্ফারিত ক'রে মুজিওকে প্রণাম করল মাথা নুইয়ে···নড়ে উঠল যেন মরার চোখের পাতাও—নিঃসাড়ে খুলে

গেল! পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সিসের মতন ঘোলাটে চোখের তারা দুটি। বিজয়ের গর্বে ও আনন্দে মালয়ের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল: একটা হিংস্র হাসিতে এবার সে পুরোপুরি 'হা' করে বুকের গভীর তলদেশ থেকে বহুকষ্টে বার করল একটানা একটা আওয়াজ··· ঐ অমানুষিক জান্তব ধ্বনির উত্তরে মুজিওর ওষ্ঠও ফাঁক হয়ে গিয়ে ধ্বনিত হ'ল একটা ক্ষীণ গোঙানি···এর পরে ফেবিও আর স্থির হয়ে থাকতে পারল না। সে যেন এসে পড়েছে কোন শয়তানের ভেল্কির মধ্যেই। তীক্ষ্ন এক চীৎকার ছেড়ে সবেগে সরে এল এবং যীশুর নাম জপতে জপতে বাড়ী ছুটে এল—যত তাড়াতাড়ি পারে।

ঘণ্টা তিনেক পরে এন্টনিও তার কাছে খবর নিয়ে এল যে সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। জিনিসগুলি বাঁধা হয়ে গেছে এবং সিনর মুজিও তৈরী হচ্ছেন রওনা হবার জন্যে। ভৃত্যের কাছে কোনো কথা না বলে ফেবিও বারান্দায় এল। সেখান থেকে দেখা যায় কাছারি-ঘরটা: সামনে দাঁড় করানো কয়েকটি মালের-ঘোড়া এগিয়ে রয়েছে, দুজনের মতো ক'রে তৈরী একটা তেজীয়ান ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্রধারী অনুচরদের সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে চাকরেরা। এবারে ঘরের দরজা খুলে গেল এবং মুজিও উপস্থিত হ'ল মালয়ের ওপরে ভর রেখে। মালয়ের গায়ে একটা সাধারণ ধরণের পোশাক। মুজিওর মুখখানা মড়ার মতোই ফ্যাকাশে, হাত দুটিও দুপাশে ঝুলানো মড়ার মতোই—তবে হাঁটছে সে!···হ্যাঁ, ঠিক হেঁটেই আসছে। ঘোড়ার উপরে তাকে তুলে দিলে সে সোজা হয়ে বসল, হাতড়ে খুঁজে নিল বলগার রাশগুলি। মালয় পা-দানিতে পা রেখে একলাফে তার পিছনে উঠে বসল, তাকে ধরে রাখল দুই হাত দিয়ে। এবার যাত্রা করল গোটা দলটাই। ঘোড়াগুলি হেঁটে হেঁটে ঘরের পাশটা ঘুরে গেল···ফেবিও যেন দেখতে পেল—মুজিওর কৃষ্ণবর্ণ মুখে কেমন একটা···তবে কি সে 'নজর' দিয়েছে তার উপরে? মালয় শুধু একবার মাথা নেয়াল—বরাবরের মতোই বক্র-সমালোচনার ভঙ্গীতে। ভালেরিয়া কি এসব দেখতে পেয়েছে? তার জানালার পর্দা তখনো খোলা···হয়ত সে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কোথাও।

দুপুরের খাবার সময় ভালেরিয়া এল খাবার ঘরে। তাকে দেখাচ্ছিল বেশ শান্ত ও সুন্দর—সে অবশ্য তখনো বলছিল তার দুর্বলতার কথা। তবে তার মধ্যে আগের মতো কোনো ক্রুততা, আগের সেই অবিরাম বিমূঢ়

অবস্থা এবং গোপন আশঙ্কার ভাবটা এখন আর নাই। মুজিও চলে যাওয়ার পরের দিন ফেবিও যখন তার সেই প্রতিকৃতিতে আবার হাত দিল, এবার যেন সে ফিরে পেল ভালেরিয়ার মুখের সেই শুভ্র ভাবটি—যার উপরে সাময়িক যবনিকা পড়ায় তার খুব অসুবিধা হয়েছিল। পটের উপরে সুনিপুণভাবে চলতে লাগল তার হাতের তুলি। স্বামী-স্ত্রী আবার ফিরে পেয়েছে তাদের সেই স্বচ্ছন্দ জীবন। মুজিও তাদের সমুখ থেকে এমন ভাবেই দূরে সরে গেল, যেন কোনোদিন তাদের সঙ্গে তার পরিচয়ই ছিল না! ফেবিও ও ভালেরিয়া একমত হয়ে স্থির করল—তারা মুজিওর প্রসঙ্গে ভুলেও কখনো আর একটি কথাও মনে আনবে না, তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা একটিবারও জানতে চাইবে না। মুজিওর জীবন-নাটক সকলের কাছেই পড়ে রইল একটা রহস্য হ'য়ে···মুজিও এমনভাবেই উধাও হয়ে গেল, যেন সে পৃথিবী থেকেই সরে গেছে একবারে। একবার ফেবিও সঙ্কল্প করল, সেই ভয়ঙ্কর রাতের ঘটনাটা ভালেরিয়াকে খুলে বলবে···কিন্তু ভালেরিয়া বোধ হয় তার সঙ্কল্প বুঝতে পেরে চক্ষু মুদে শ্বাস বন্ধ করে রইল, যেন সে তৈরী হচ্ছে একটা আঘাতের জন্যে। ভালেরিয়ার অবস্থাটা ঠিকই বুঝল ফেবিও, এবং তার ওপরে সে আর এ আঘাত আনল না।

শরতের এক মধুর ভোরে ফেবিও তার সাধ্বী সেসিলার ছবিতে শেষ স্পর্শগুলি বুলিয়ে দিচ্ছে, ভালেরিয়া অর্গানের কাছে বসে মাঝে মাঝে ঘাটগুলির ওপরে আঙুল চালাচ্ছে খুশিমতো···সহসা তারি অজ্ঞাতে হাতের নিচে থেকে বেজে উঠল একটা সুর—কী আশ্চর্য, মুজিওর সেই বিজয়ী প্রেম-সঙ্গীতের প্রথম কলিটি! আর সেই মুহূর্তেই ভালেরিয়া তার বিবাহিত জীবনে এই প্রথমবারই অনুভব করল, তার মধ্যে যেন নড়ে উঠছে একটি নতুন জীবন···ভালেরিয়া চমকে উঠে থেমে গেল—'তার অর্থ ?···তা হ'লে কি আমার—'

পাণ্ডুলিপিটি শেষ হয়েছে এইখানেই।

বিষণ্ণ ভালোবাসা

'ভোলো মোর গান, কী হবে লইয়া এইটুকু পরিচয় ;
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয়।
জানায়ো আমারে যদি আসে দিন, এইটুকু শুধু যাচি,-
কণ্ঠ পারায়ে হয়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি।'

॥ সেই অনিন্দ্য প্রাসাদ ॥

ডাক্তার বলছিলেন—'আমার মনের রাজ্য জুড়ে রয়েছে কয়েকটা ভয়ানক কাহিনী, কিন্তু সবকথা বলারও একটা বিশিষ্ট স্থান ও সময় থাকা দরকার।'

'কিন্তু এখন তো মোটে দুটো, রেজিনার গল্পটা শুনে আমরা খুবি উৎসুক হয়ে পড়েছি।'—গৃহস্বামিনী বললেন।

'বলুন, বলুন আপনি।'—চারিদিক থেকেই মিলিত অভ্যর্থনা।

ডাক্তারবাবু সম্মতিভরে মাথা নোয়ালেন। নিঃশব্দ চারিদিক।

—ভেঁদোম থেকে শ'খানেক হাত দূরে, লয়ের নদীর তীরে ধূসর রঙের একটা বাড়ী, খুব উঁচু, চারপাশ থেকে একবারেই বিচ্ছিন্ন। এমন কি একটা দোকান বা ঘরও দেখা যায় না কাছাকাছি। বাড়ীটার সামনেই একটা বাগান, নেমে এসেছে নদী পর্যন্ত। ঝাড়-জঙ্গলগুলি পথটির দুপাশে সুন্দর করে ছাঁটা থাকত একদিন, আজ নির্বিবাদে জড়াজড়ি করে রয়েছে উচ্ছৃংখল ভঙ্গীতে। কয়েকটা উইলো গাছ জল থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছে পাঁচিলের মতো, আড়াল করে রেখেছে বাড়ীটার আধখানা। বুনো লতাগুলি সমস্ত তীরদেশ ছেয়ে ফেলেছে তাদের শ্যামল-সুন্দর প্রাচুর্যে। ফলের গাছগুলি অযত্নে পড়ে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন বন্ধ্যা জঞ্জাল! পথটি একদিন ছিল কাঁকর-বিছানো, আজ আগাছা জমে আছে তার উপর, বা আরও সত্যি করে বলতে গেলে পথের কোনো চিহ্নই নেই কোনোদিকে।

একমাত্র পাহাড়ের চুড়া থেকেই দেখা যায়—পাহাড়ের গায়ে ভেঁদোমের এই বাড়ীটা: মনে হয় বাড়ীটা ছিল বুঝি কোন তরুপ্রিয় পল্লীবাসীর। ভিতরে একটা কুঞ্জ বা কুঞ্জের ধ্বংসাবশেষ। মনে পড়ে পল্লীর শান্তিময় ওই নীড়ে সেদিনকার এক নিরালা জীবন।

বাড়ীর ছাদটা ভয়ানকভাবে বিধ্বস্ত। বাইরের জানলাগুলি সব সময়ই বন্ধ; ঝুল-বারান্দায় চড়ুইয়ের বাসা। দোরটা যেন চিরদিনের জন্যেই বন্ধ। সিঁড়ি কয়েকটা ধাপ পর্যন্ত ঢেকে আছে আগাছায় জঙ্গলে। কত দিনরাত্রে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে ক্ষয়ে গেছে কাঠ, উঠে গেছে রঙ। চারিদিকের নিথর নীরবতা মাঝে মাঝে ভেঙে যায় পাখী বা বন-বেড়ালের

ডাকে। ইঁদুর ও টিকটিকিরা মিলে ঘুরে বেড়ায় চারিদিকের এই অবাধ রাজত্বে, মারামারি করে খায় নিজেদের মৃতমাংস। এক অদৃশ্য বিরাট হাত সমস্ত কিছুর উপরেই যেন টেনে নামিয়েছে বিরাট রহস্যের যবনিকা।

ঔৎসুক্য বশে রাস্তা থেকে যদি তাকান তো দেখবেন : সামনেই রয়েছে প্রকাণ্ড এক সিংহদ্বার; ছেলেপিলেরা বহু গর্ত খুঁড়েছে তার গায়ে। এই ছেঁদা দিয়ে চোখে পড়বে, ওপারে এক ধ্বংসের ছবি। হা করে আছে দেয়ালের অসংখ্য ফাটল, ধ্বসে পড়েছে ভাঙা-ভাঙা সিঁড়ি। ঊর্ধ্বদেশ থেকেই এখানে যেন নেমে এসেছে দেবতার নির্মম অভিশাপ। ভগবানই বুঝি অপমানিত হয়েছেন এখানে! নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকবে। সরীসৃপেরা বুকে ভর করে ঘোরাফেরা করছে ধ্বংসস্তূপের উপর। এই শূন্য পরিত্যক্ত গৃহ যেন বিরাট এক হেঁয়ালি —চির নিরুত্তর!

আগের দিনে এই প্রাসাদ ছিল ছোটখাট একটা রাজ্যবিশেষ। চিকিৎসার ব্যাপারে এই ভেঁদোমে থাকার সময় বাড়ীটা আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখত এক বিচিত্র নেশার আনন্দে। ধ্বংসের মাঝেই কত সুন্দর এর রূপ! কালের নিষ্ঠুর হাতে দিন দিন যতই ভেঙে আসছে এর দেহ, ভাঙা বুকের নিগূঢ় নিভৃতে এ যেন বয়ে ফিরছে কোন গূঢ়তত্ত্ব রহস্য। কতবার আমি চারিদিকের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘুরেছি, সাহসভরে পথ করে নিয়েছি এই অদ্ভুত বাগানের মধ্যে। এই ভূমি সর্বসাধারণের নয়, কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয় যেন। এই বিশৃংখল সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বুনে চলেছি কত স্বপ্ন, ডুবে গেছি নেশার মতো এক বিষণ্ণ বেদনায়। নিয়তির নিষ্ঠুর হাতে এখানে ঘুরে ফিরছে যেন মানুষের মতো এক জীবন-ধারা। এ যেন সাধুশূন্য গুহাবাসের নির্জন স্তব্ধতা, মৃতশূন্য কবরভূমির নিঝুম শান্তি,—স্মৃতিস্তম্ভের অসংখ্য লিপিতেও অস্ফুটে গুঞ্জন করজে শুধু অতীতের ভাষা! কিন্তু এইখানেই তো দেখেছি আমি বিষণ্ণ-নির্জন এক পল্লী-জীবন। প্রায়ই এসে চোখের জল ফেলেছি এখানে, হাসিনি একটিবারও। একদিন বসে আছি, হঠাৎ মাথার উপরে শুনলাম একটানা একটা গম্ভীর ধ্বনি—বুনো ঘুঘুর ধাবন্ত ডানার শব্দ। কিন্তু ভয়ে শিউরে উঠল আমার সর্বাংগ। চারিদিকে স্যাঁতসেতে ধ্বংসস্তূপ, সাবধানে পা ফেলতে হয়,—তার উপর গিরগিটি, ইঁদুর ও ব্যাঙেদের ভিড়। আদিম অন্ধ প্রকৃতির সে এক অবাধ উল্লাস!

একদিন সন্ধ্যাবেলা কেঁপে উঠলাম ভয়ে হাওয়ার বেগে ঘুরে গেল 'ওয়েদার-ককটা', তারি কড়্কড়্ শব্দটা ঘরের মধ্যে বেজে উঠল আর্ত-নাদের মতো। হোটেলে ফিরে এলাম ভাবতে ভাবতে। গৃহস্বামিনী খাবার পরে এসে দাঁড়ালেন কিছুটা রহস্যের মতোই এবং বললেন—'মঁশিয়ে রেগ্নাল্ট এসেছেন।'

'কে মঁশিয়ে রেগনাল্ট?'

'বাঃরে! আপনি চেনেন না তাঁকে?'—বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ দেখলাম দোরে এক ভদ্রলোক; তাঁর জামাটা ছেঁড়া ও পুরনো হ'লেও তার উপরে আঁটা রয়েছে একটা মুক্তো, দু'কানে সোনার কুণ্ডল! জানতে চাইলাম কে তিনি।

'আমিই মঁশিয়ে রেগনাল্ট। ভেঁদোমের একজন এটর্ণি।'

'কিন্তু যতদূর মনে হচ্ছে আমার পক্ষে তো এখন কোনো উইল করা সম্ভব নয়।'

'আরে, দাঁড়ান মশাই!'—আমাকে থামিয়ে দেবার ভঙ্গীতেই তিনি যেন হাত তুললেন—'খবর পেলাম, আপনি প্রায়ই বেড়াতে যান লা গ্রান্দ প্রাসাদের বাগানে?'

'হ্যাঁ, তা যাই।'

'দাঁড়ান একটু!'—তিনি আবার সেই ভঙ্গী করলেন—'কিন্তু সে তো অন্যায়, বিগতা কাউণ্টেস দ্য মেরেটের উইলরক্ষাকারী হিসেবে তাঁরই নাম নিয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি, এই অভ্যাসটি পরিত্যাগ করুন। আমি মশাই গোঁয়ার তুর্কী নই, সামান্য ব্যাপারকে গুরুতর করে তুলতে চাই না। তা ছাড়া, ভেঁদোমের সর্বশ্রেষ্ঠ এই প্রাসাদটিকে কেন যে আমি বাধ্য হয়ে এমন ভগ্ন-জীর্ণ অবস্থায় রক্ষা করে আসছি—তা আপনার না জানাই স্বাভাবিক। সে যাই হ'ক, শিক্ষিত লোক আপনি, আপনি যেমন খুশি চলাফেরা করতে পারেন,—কিন্তু উইলের বন্ধনে বাঁধা বলেই আমি আপনাকে আবারো স্মরণ করিয়ে দেব ওখানে পদার্পণ না করতে। দেখুন, আমি নিজেও বড় একটা ওমুখো হই না। ওঃ, তাঁর সেই উইলের সময় সমস্ত শহরেই সে কী বিরাট হৈ-চৈ!'

ভদ্রলোক নাক ঝাড়তে থামলেন একবার। তাঁর কথা শুনেই বুঝলাম যে মাদাম মেরেটের সম্পত্তি রক্ষার সঙ্গে তাঁর স্বার্থ

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তা যা হ'ক, আমার কল্পনার মাঝখানে পড়ল চকিত যবনিকা। তা হ'লে তো এবারে জানতে হবে মূল ব্যাপারটা কী?

বললাম—'দেখুন, এই অদ্ভুত অবস্থার মূল কারণটা জানতে চাইলে কি অপরাধ হবে আমার?'

এই কথায় ভদ্রলোক যেন একেবারেই বিকশিত হয়ে উঠলেন—একটা আনন্দ ছেয়ে গেল তাঁর সারা মুখে। নস্যির কৌটোটা থেকে এক টিপ নস্যি নিয়ে তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি 'না' জানালে নিজেই নিলেন বড় এক টিপ!

মশাই, একদিন সন্ধ্যেবেলা শুতে যাচ্ছি (তখনো বিয়ে হয়নি আমার) এমন সময় শুনলাম, মাদাম মেরেট আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর বাড়ীতে। তাঁর পরিচারিকাটি, বেশ মেয়েটি মশাই, এখন সে থাকে একটা হোটেলে,—সে নিজেই কাউণ্টেসের গাড়ী নিয়ে হাজির! আচ্ছা, দাঁড়ান একটু। একটা কথা বলা উচিত ছিল আগেই। আমার এই ভেঁদোমে আসার দু'মাস আগেই কিন্তু ম'শিয়ে কাউণ্ট মেরেট মারা যান প্যারিসে গিয়ে। তাঁর শেষ-জীবনটা বড়ই করুণ—সবরকম বদখেয়ালেই খোয়ালেন জীবনটা। বুঝলেন না?

ভদ্রলোক মারা যাওয়ার পরেই মাদাম মেরেটও লা গ্রান্দ প্রাসাদ ছেড়ে দিলেন। কেউ কেউ বলে তিনি নাকি চেয়ার টেবিল আলনা—এক-কথায় সব জিনিসপত্রই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। আচ্ছা, মেরেট গেছেন কখনো? যাননি? আঃ, সে কি চমৎকার জায়গা।

মাথায় একটা ঝাঁকুনি মেরে শুরু করলেন আবার: শেষের মাস-তিনেক কাউণ্ট আর কাউণ্টেস বাস করতে লাগলেন বড় অদ্ভুত ধরণে—কোনো অতিথিকেই বাড়ীতে আসতে দিতেন না। মাদাম শুতেন নিচ-তলায় আর ম'শিয়ে দোতলায়। মাদাম মেরেট কখনোই বাড়ী থেকে বেরুতেন না, একমাত্র রোববার ছাড়া! তারপর, এই লা গ্রান্দ ছেড়ে তিনি মেরেট এলেন। তখন তাঁর মধ্যে এসে গেছে বিরাট এক বিপর্যয়: সেই প্রিয় মহিলাটি, প্রিয় বললাম—কারণ তিনিই আমাকে দিয়েছেন এই হীরকাট—তিনি খুব অসুখে পড়লেন। কিন্তু তাঁর মানসিক অবস্থা এমন যে ডাক্তার ডাকাটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। অনেকে ভাবল, মাথাই খারাপ হয়েছে তাঁর। তারপর শুনুন, মাদাম মেরেট কি জন্যে ডেকেছেন

তা ভেবে ভারী উৎসুক হয়ে রইলাম ! সেদিন রাতেই সমস্ত শহরে জানাজানি হয়ে গেল—মেরেট যাচ্ছি আমি।

পথে পরিচারিকাটির কাছ থেকে এটুকু জানতে পেলাম—সেদিন রাতেই বোধ হয় মারা যাচ্ছেন মাদাম ! রাত এগারোটায় পেঁছিলাম গিয়ে প্রাসাদে। মস্ত বড় সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রশস্ত কয়েকটা অন্ধকার ঘর পেরিয়ে এলাম মাদাম মেরেটের শোবার ঘরে।

তারপর শনুন, মেয়েদের মধ্যে চলিত কাহিনী থেকে বোঝা যায় (তা সব কাহিনীই তো আর সত্যি নয়!) মাদাম মেরেট ছিলেন যৎকিঞ্চিৎ ভ্রষ্টা! হ্যাঁ, তারপর মস্ত বড় বিছানার মধ্যে তাকে তো খুঁজেই পাচ্ছি না। সুন্দর কারুকাজকরা সেই প্রাচীন দিনের জমকালো বিছানা। পাশেই পাতা রয়েছে একটা আরাম-কেদারা—তাঁর বিশিষ্টা এক সখীর জন্যে, পাশেই দুটো ছোট কেদারা। মশাই, সেই ঘরটা দেখলে মনে হবে আপনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন? সমস্ত কিছুই যেন মৃত্যুর হিম-নিশ্বাসে ভরা !

—এই পর্যন্ত বলেই ভদ্রলোক অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাতটা তুললেন।

শেষ পর্যন্ত দেখলাম তাঁকে প্রদীপের ক্ষীণ আলোয়ঃ মুখখানি মড়ার মতো ফ্যাকাশে, দুটি হাত অস্থিচর্মসার, চুলগুলি শাদা। বহুকষ্টে তিনি বিছানায় বসে আছেন। কালো চোখ দু'টি মুমূর্ষুর মতো নিষ্প্রভ, পলকহীন! সরু হাত দু'টি যেন কোমল চামড়ায় ঢাকা দু'খানা হাড়—জেগে আছে প্রতিটি শিরা-উপশিরা! হ্যাঁ, একদিন তিনি খুবি সুন্দরী ছিলেন। তাঁকে দেখে এখন চমকে উঠলাম। ডাক্তার মানুষ আমি, অনেক মুমূর্ষু দেখেছি, কিন্তু এমন কঙ্কালসার চেহারা কক্ষনো আর চোখে পড়েনি। ক্ষয়ে ক্ষয়ে এখন যেন পড়ে আছে তার একটা ছায়া মাত্র! মুমূর্ষুর চারপাশে কান্নাও শুনেছি অনেক—কিন্তু এই নির্জন নিস্তব্ধ ঘরে এই মহিলার মৃত্যুর মতো এমন মর্মান্তিক চিত্র কখনোই চোখে পড়েনি আর। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই, তাঁর বুকঢাকা চাদরে পর্যন্ত ওঠানামা নেই! স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি শুধু। শেষে তাঁর বড় বড় চোখ দু'টি নড়ে উঠল, একখানা হাত তুলতেই আবার পড়ে গেল বালিশের উপর। মৃদু নিশ্বাসের মতো বেরোল একটি অস্ফুট কথা—'আপনার পথ চেয়েই বসে আছি আমি।' হঠাৎ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর গাল দু'টি। কথা কইতে খুবি কষ্ট হচ্ছিল।

'মাদাম !'—আমি কথা বলতে যাচ্ছিলাম। নিষেধ করলেন !

আমি বসলাম। মাদাম বহুকষ্টে বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে মোড়ানো একটা কাগজ বার করলেন। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমল কপালে। 'আপনার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি আমার উইল। ও, ভগবান, ওঃ !' একটা ক্রুশ হাতে নিয়ে ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সবশেষ।

বাড়ী ফিরে দেখলাম, উইলের বিশ্বস্তভার দেওয়া হয়েছে আমারি উপর। ভেঁদোমের হাসপাতালের নামে দান করা হয়েছে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি। একমাত্র 'অনিন্দ্য প্রাসাদ' প্রসঙ্গেই তাঁর নির্দেশ : কাউণ্টেসের মৃত্যুর পরেও পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বাড়ীটা থাকবে ঠিক আগের মতোই। কোনোরকম সংস্কার, বা বাড়ীর মধ্যে কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ। এজন্যে দরকার হ'লে রাখতে হবে দারোয়ান। এই সব শর্ত যথাযথ পালন করা হ'লে পঞ্চাশ বছর পরে এই সম্পত্তি হবে আমারি বংশধরের। কারণ, আইনজীবী নিজেই আইন-মতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না ; অন্যথায় সম্পত্তি যাবে মাদাম মেরেটের উত্তরাধিকারীদের হাতে,—তাও নির্ভর করছে অবিশ্যি কতগুলি শর্ত রক্ষা করার উপর এবং সেই শর্ত-গুলিও পঞ্চাশ বছরের আগে খুলে দেখা নিষিদ্ধ। তা, কে আর খুলে দেখতে যাচ্ছে ?'—খুশিমুখেই থামলেন তিনি।

আমি বললাম—'এমন নিখুঁত করেই আপনি মুমূর্ষু নারীর বর্ণনা করেছেন যে আমার চোখের সামনে এখনো দেখছি তাঁর রুগ্নদেহ। কিন্তু আপনি বোধ হয় অনুমান করেছেন উইলের মধ্যে কি লেখা আছে ?'

'দেখুন, আমাকে যিনি এই হীরকটি উপহার দিয়েছেন আমি তাঁর কোনোরকম সমালোচনা করব না।'

এবারে তিনি রওনা হলেন, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলছিলেন—'আর তো প'য়ত্রিশটা বছর ! তা, অনেককেই বাঁচছে তো ! কিন্তু দাঁড়ান একটু—'এই বলেই শয়তানের মতো একটা আঙুল উঁচিয়ে বললেন আবার—'লক্ষ্য করবেন, সে পর্যন্ত বেঁচে থাকলে—সে পর্যন্ত,—তা এখন তো আমার বয়স ষাট মাত্র !'

দোর বন্ধ করে ভাবতে ভাবতে বসে পড়লাম আরাম কেদারাটায়। এমন সময় কার সাবধানী হাতে খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে এলেন হোটেল-কর্ত্রী মাদাম লেপাস,—খুবই হাসিখুশি মানুষটি।

'আচ্ছা দেখুন, ম'শিয়ে রেগনাল্ট আপনাকে অনিন্দ্য প্রাসাদের কথা বলছিলেন?'

'হ্যাঁ'।

'কি বললেন তিনি?'

দু' এক কথায় বললাম সব। শনতে শুনতে আগ্রহে তিনি ঝুঁকে পড়ছিলেন, আমার মুখের দিকে তার তীক্ষ্ণ নজর ঠিক গোয়েন্দার মতো—উৎসুক শ্রোতার মতো।

'মাদাম লেপাস, মনে হচ্ছে আপনি আরো-কিছু জানেন, নইলে এত আগ্রহ ভরে শুনতে আসবেন কেন?'

'সত্যি বলছি। না, আর কিছু জানিনে আমি।'

'মিছা শপথ করবেন না, গোপন কিছুর আস্বাদে ডাগর হয়ে উঠেছে আপনার চোখ। আচ্ছা, কী ধরণের লোক ছিলেন তিনি?'

'ম'শিয়ে কাউণ্ট মেরেট?—খুব লম্বা চওড়া চেহারা, খুব রাগী,—আমরা সব মেয়েরাই তাঁকে ভালোবাসতাম খুব। মাদাম মেরেটও ছিলেন তখনকার দিনে নাম-করা ধনী ও সুন্দরী। বিশহাজার ফ্রাঁ ছিল তার মাসিক আয়। নারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন মণিস্বরূপ। এমন সুন্দর স্বামী-স্ত্রী দেখেনি কেউ।'

'সুখী ছিলেন তারা?'

'হুঁ, তাই তো—যতদূর মনে হয়—বুঝতেই পারছেন, আমরা চুনো-পুঁটির দল রুইকাৎলার দলে মিশতেই পারতাম না। মাদাম মেরেটকে অবশ্য মাঝে মাঝে স্বামীর দাবানি সহ্য করতে হ'ত। কিন্তু ভদ্রলোক বদরাগী হ'লেও আমরা সবাই ভালোই বাসতাম তাঁকে।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন ছাড়াছাড়ির মূলে কোনো একটা ঘটনা আছে বলেই তো মনে হয়।'

'আমি তো বলিনি—আছে। তেমন-কিছু আছে বলে জানা নেই আমার।'

'ঠিক বলছেন না। নিশ্চতই জানেন আপনি।'

'তা—তা—দেখুন, তা হ'লে আপনাকে বলছি সব। এ পর্যন্ত বলবার মতো বিশ্বস্ত লোকই পাইনি আমি। আপনি ভদ্রলোক, আমার এই হোটেলে আছেনও বহুদিন—আপনাকেই বলতে পারি পনের হাজার ফ্রাঁর কাহিনী—'

শুনতে লাগলাম :

স্পেনীয় যুদ্ধ বন্দীদের সম্রাট এখানে পাঠালেন। সরকারী খরচেই একটি বিশিষ্ট বন্দীর তত্ত্বাবধানের ভার পড়ল আমার উপর। নামজাদা কোনো রাজপুত্রই হবে সে। আঃ, কী সুন্দর ছিল সেই যুবক! আঃ, যদি দেখতেন একবার! মাথাভরা কালো চুল, গায়ের রং কিছুটা তামাটে, তাই দেখতে আরো সুন্দর। আর কাউকেই অমন দামী পোশাক পরতে দেখিনি,—যুবরাজ রাজকন্যারাও তো থাকেন আমার এখানে। খুবি কম খেত সে। এমন নম্র ও দরদী ছিল তার আচার-ব্যবহার যে কিছুতেই ভোলা যায় না তাকে! ওঃ, আমি খুবি ভালোবাসতাম তাকে। সে অবিশ্যি তিন চারটের বেশী কথা আমার সঙ্গে বলেইনি। কেমন একটু অদ্ভুত মানুষ!

গির্জায় গিয়ে সে বসত মাদাম মেরেটের কাছাকাছি। বেড়াতে যেত সে পাহাড়-চূড়ায় দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মাঝে। এই ছিল তার বন্দী-জীবনের সান্ত্বনা—এখানে এসে নাকি তার স্বদেশের কথা মনে পড়ত। স্পেন যে পাহাড়ের দেশ!

একদিন রাত করেই বেরোল সে, এবং ফিরল না দুপুর রাতেও। একটু ভাবনায়ই পড়লাম, যে রকম খেয়ালী মানুষ! দোরের চাবি নিয়ে গেছে, তাই আর রাত জেগে রইলাম না। সে থাকত আমারি একটা বাড়ীতে রু দ্য মর্টার-এ। পরের দিন শুনলাম, একটি সহিস ছেলে নদীতে তার ঘোড়াকে স্নান করানোর সময় একজন স্পেনীয় যোদ্ধাকে দেখেছে ওপার থেকে সাঁতার কেটে আসতে। যুবকটি বাড়ী এলে বললাম—অমন রাতে নদীতে সাঁতরানো ভালো নয়।

তারপর শেষে একদিন ভোরে তার আর দেখা নেই, ফিরেই আসেনি সে! তার জিনিষ পত্র হাতড়াতে হাতড়াতে পেলাম এক টুকরো লেখা ও সঙ্গে চার হাজার ফ্রাঁ, পঞ্চাশটা গিনি, এবং ছোট্ট একটা বাক্সে দশ হাজার দামের একটা মুক্তো। কাগজে লেখা রয়েছে, সে যদি না ফেরে তবে সেই টাকাটা রইল তার আত্মার মুক্তি কামনায়।

খুব খোঁজাখুঁজি হ'ল। শেষ পর্যন্ত তার পোশাকটা পাওয়া গেল একটা পাথরের উপর—সেই অনিন্দ্য প্রাসাদ থেকে সোজা নদীর ওপারে। তখন কী আর করা যায়, পুড়িয়ে ফেলা হ'ল তার পোশাক এবং তারি ইচ্ছা-অনুসারে প্রচার করা হ'ল সে পলাতক।

সবারি ধারণা হ'ল ডুবেই মরেছে সে। আমার অবিশ্যি ধারণা হ'ল ঠিক উল্টোটা—মাদাম মেরেটের সঙ্গেই এ ঘটনার যোগাযোগ আছে কোথাও। আমি জানি, মাদাম প্রাণের মতো ভালবাসতেন একটা ক্রুশ এবং মরবার সময় পর্যন্ত হাতে হাতে রেখেছেন সেটাকে। এদিকে স্পেনীয় বন্দীটিরো ছিল একটা ক্রুশ, কিছুদিন পর সেটাকে আর তার কাছে দেখা যায়নি। আচ্ছা এবারে বলুন, এই পনেরো হাজার ফ্রাঁ কি ন্যায়ত আমারই নয় ?

—কয়েক মিনিট কথা বলে মাদাম লেপাস চলে গেলেন। আমার মনের মধ্যে এক উৎসুক আশঙ্কা, এক শঙ্কিত স্তব্ধতা ! মাঝরাতে গির্জায় গেলে যেমনটা হয়। হঠাৎ এবারে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট জেগে উঠল—সেই অনিন্দ্য প্রাসাদ, ঝাড়জঙ্গলে ঢাকা, দরজা-জানলা বন্ধ, শূন্য প্রকোষ্ঠ, সমস্ত কিছুই শূন্য।

না, এই রহস্যের তলদেশ খুঁজে দেখব আমি, একে একে তিনটি লোকের মৃত্যু হ'ল কি জন্যে ?—স্বামী, স্ত্রী আর ঐ বন্দী যুবকটির !

সমস্ত ভেদোঁমের মধ্যে রোজেলিনকেই মনে হ'ল সবচেয়ে রহস্যময়ী, তার ভিতরেই আছে কোনো গোপন সন্ধান ! অপূর্ব সুন্দরী সে, কুমারী ! ঠিক করলাম যদি দরকার হয় এই রোজেলিনের সঙ্গেই ভাব করে নেব : সাধারণ প্রেমের নারী নয় সে, সে যেন একটা ভয়ানক রোমান্সের শেষ অধ্যায় !

একদিন জানতে চাইলাম মাদাম মেরেটের কথা এবং সমস্ত কাহিনীই গোপন থাকবে প্রতিশ্রুতি দিলে সেও রাজী হ'ল। এটোর্ণি ও মাদাম লেপাসের কাহিনী এবার স্পষ্ট রূপ নিয়ে ফুটে উঠল রোজেলিনের মুখে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :

অনিন্দ্য প্রাসাদের নিচুতলার একটা ঘর, দেয়ালের গায়ে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড আলমারী। মাদাম মেরেট শুতেন নিচের এই ঘরে, আর ম'শিয়ে মেরেট উপরতলায়। কিছুদিন থেকেই স্ত্রীর শরীর অসুস্থ, তাই তিনি শুতেন আলাদা। ম'শিয়ে মেরেট হঠাৎ একদিন ক্লাব থেকে ফিরলেন বেশ একটু রাতেই, ক্লাবের আলাপ-আলোচনায় এবং খেলার নেশায় দেরী হয়ে গেছে খুব। এদিকে তাঁর স্ত্রী ভেবেছেন যে রোজকার মতো স্বামী ঘুমিয়ে আছেন উপরে।

ম'শিয়ে মেরেট প্রথম প্রথম রোজেলিনের কাছে খোঁজ নিতেন, তাঁর

স্ত্রী ঘুমিয়েছে কিনা ; আজকাল তিনি সোজা নিজের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু সেদিন হঠাৎ স্ত্রীর ঘরে এলেন তাঁকে দেখতে। বিলিয়ার্ড খেলায় চল্লিশ ফ্রাঁ হেরেছেন, সে ব্যাপারে স্ত্রীর কাছ'থেকে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় স্ত্রীকে দেখেছেন খুবি ফিটফাট, নিশ্চয়ই শরীর তাঁর ভালোই যাচ্ছে, মনটাও হাসিখুশি। কিন্তু স্বামীরা সবকিছুই বোঝেন একটু দেরীতে ! যাক, রোজোলিনকে না ডেকে তিনি নিজেই এলেন নিচের ঘরের দিকে, তাঁর পায়ের পরিচিত শব্দ বেজে উঠল সিঁড়িতে সিঁড়িতে !

ভদ্রলোক স্ত্রীর ঘরের দোরটা খুলেছেন, অমনি ওদিকেও বন্ধ হয়ে গেল দেয়ালের আলমারীটার দোরটা ! কিন্তু ভিতরে এসে দেখলেন—স্ত্রী একা। স্বামী ভাবলেন, রোজোলিনই বোধহয়। কিন্তু হঠাৎ একটা সন্দেহ লক্ষ লক্ষ সঙ্কেত-ধ্বনির মতো বেজে উঠল তাঁর অন্তরের মধ্যে ! সতর্ক হলেন তিনি—স্ত্রীর চোখে মুখে লক্ষ্য করলেন অবর্ণনীয় একটা উদ্বিগ্নতা, শঙ্কার সঙ্কেত !

'খুব দেরীতে এলে তো আজ !'—স্ত্রী বলছিলেন। তাঁর কণ্ঠ স্বভাবতই মিষ্টি, কিন্তু এখন শোনাল কেমন ভাঙা-ভাঙা জড়ানো।

মঁশিয়ে মেরেট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কারণ তখনি অন্য এক দোর দিয়ে ঢুকল রোজোলিন। এবার ? তিনি বুকের উপরে হাত দুখানি ভাঁজ করে পায়চারি করতে লাগলেন।

'কোনো খারাপ খবর পেয়েছ কি, না শরীর খারাপ ?—তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন ভীরুভাবেই। কিন্তু স্বামী একটা কথারো উত্তর দিলেন না।

স্বামীর মুখ দেখেই মাদাম মেরেট শঙ্কার ইঙ্গিত পেয়েছেন। মঁশিয়ে মেরেটের এখন তাঁরি সঙ্গে থাকাটা দরকার,—রোজোলিনকে এ ঘর থেকে ছুটি দিলেন তিনি। স্বামী এসে দাঁড়ালেন স্ত্রীর মুখোমুখি এবং কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলেন—'তোমার ঐ আলমারীতে কেউ আছে ?' মাদাম মেরেট তার দিকে শান্তদৃষ্টি মেলে সরল সুরেই উত্তর দিলেন—'না, ভুল করছ তুমি।'

'না'—কথাটা যেন ঘা মারল মঁশিয়ে মেরেটের বুকের মধ্যে। না, বিশ্বাস করেন না তিনি। কিন্তু স্ত্রীকেও তো এমন শান্ত-সুন্দর, এমন পবিত্র দেখায়নি কোনোদিন। মঁশিয়ে মেরেট উঠে আলমারীটা খুলতে গেলেন।

মাদাম মেরেট এসে তাঁকে হাত ধরে থামিয়ে দিলেন এবং করুণভাবে মুখ তুলে অদ্ভুত এক আবেগের সঙ্গে বললেন—'মনে রাখবে—কাউকে যদি না দেখতে পাও, তোমার আমার মাঝে এখানেই শেষ !'

স্ত্রীর এই মর্যাদাময় রূপ দেখে ভদ্রলোকের মনে বোধহয় শ্রদ্ধাই জেগে উঠল—'না, জোসেফাইন ! খুলব না আমি। কারণ, তা হলে যেদিক থেকেই হ'ক আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে। শোনো, আমি জানি, বিশ্বাস করি—তুমি পবিত্র, সাধ্বী, প্রাণের বিনিময়েও পাপ করবে না ! (মাদাম মেরেট স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন বিস্মিতের মতো !) শোনো, এই তোমার পবিত্র ক্রুশ, স্পর্শ করে শপথ করো—ওখানে কেউ নেই। আমি বিশ্বাস করব তোমার কথা, দোর খুলতে যাব না আর।'

মাদাম ক্রুশ স্পর্শ করে বললেন—'শপথ করছি আমি।'

স্বামী বললেন—'আবার বলো, বলো : ভগবানের নামে শপথ করছি আমি,—ঐ আলমারীতে কোনো লোক নাই।'

—মাদাম মেরেটও আউড়ে গেলেন নির্বিকারে।

'আচ্ছা বেশ !'—ম'শিয়ে মেরেটের স্বর কঠিন। কিছুকাল পরে বললেন—'বাঃ, চমৎকার ক্রুশ দেখছি একটা, একেবারেই নতুন দেখছি !'

'হ্যাঁ, ওটা দিয়েছে দুভিদেয়ার, গত বছর স্পেনীয় বন্দীরা ভেদোঁমে এলে সে একজন স্পেনীয় বন্দীর কাছ থেকে কিনে রেখেছিল ওটা।'

'বেশ তো !' ক্রুশটা রেখে 'বেল' বাজালেন ম'শিয়ে মেরেট, এবং বাইরে এসে রোজেলিনকে চাপা গলায় বললেন—'গয়েন ফ্লংকে ভালোবাসো তুমি ? তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব, আরো দেব টাকা। কিন্তু সব গোপন রাখতে হবে। যাও, শিগগির যাও তাকে ডাকতে, তা না হলে—' ভ্রুকুটি করলেন তিনি।

এতক্ষণ দূর থেকে তিনি স্ত্রীর দিকে নজর রাখছিলেন, এবার কাছে এসে স্বাভাবিক ভাবেই শুরু করলেন আলাপ ও আলোচনা—খেলায় হারবার কথা, নানা কথা।

গয়েন ফ্লং এসে উপস্থিত। লোকটা রাজমিস্ত্রী। তাকে দেখেই তো মাদাম মেরেটের চক্ষুস্থির !

এদিকে, কিছুদিন থেকেই নিচের ঘরটার গা-আলমারীটা বুজিয়ে দেবার কথা ছিল। এই নতুন পরিস্থিতিতেই ম'শিয়ে মেরেট কাজটা শেষ করবেন ঠিক করলেন। কাজে লাগালেন গয়েন ফ্লংকে।

মাদাম ডাকলেন—'রোজেলি, আমার চুলটা একটু আঁচড়ে দাও তো।' স্বামী তীক্ষ্ণ নজর রেখে পায়চারি করছিলেন সেই ঘরেই। কিন্তু মিস্ত্রীর কাজে টুকটাক শব্দ হচ্ছিল, এবং সেই সুযোগে মাদাম মেরেট রোজেলিনকে বললেন—'তোমাকে হাজার ফ্রাঁ দেব, দেয়ালটা বুজিয়ে দেবার কালে একটুখানি ফাঁক রাখতে বলো, একটুখানি।'

গয়েন ফ্লং দোরটা বুজিয়ে দিচ্ছে। স্বামী স্ত্রী চুপচাপ। আধাআধি তৈরী হয়েছে দেয়াল। মঁশিয়ে যখন তার দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই ফাঁকে মিস্ত্রীও এক ঘায়ে আলমারীর গাঁথুনিতে একটু ফাঁক রেখে দিল। মাদাম মেরেট বুঝল, ইতিমধ্যেই রোজেলিন বলে দিয়েছে মিস্ত্রীকে। মঁশিয়ে মেরেট ছাড়া তিনজনেই এবার দেখতে পেল সেই বন্দী যুবকটিকে। স্বামী সেদিকে ফিরবার আগেই মাদাম মেরেট ইঙ্গিতে জানালেন—'আশা আছে।'

কাজ শেষ হয়ে গেল চারটে রাতে। মঁশিয়ে মেরেট তাঁর স্ত্রীর ঘরেই ঘুমোবেন আজ।

পরদিন ভোরে জেগেই মঁশিয়ে মেরেট আলস্যভরে বললেন—'ও, তাই তো! আমার পাশপোর্টটা তো গিয়ে আনার কথা!'

টুপিটা পরে দোরের কাছে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ক্রুশটা নিয়ে চললেন দুভিদেয়ারের কাছে।

স্বামী বেরিয়ে যেতেই মাদাম মেরেট রোজেলিনকে ডাকলেন—'শিগগির, শিগগির এস—কুড়ুলি দিয়ে এক্ষুনি দেয়াল ভাঙব, আবার তৈরী করে রাখবে গয়েন ফ্লং।'

রোজেলিন নিয়ে এল কুড়ুলি। মাদামের অবস্থা তখন হিংস্র এক উন্মাদের মতো, তিনি ঘায়ের ওপর ঘা মারতে লাগলেন দেয়ালে। কয়েকটা ইঁট খুলে গেল, আর একটা জোর ঘা লাগাবার জন্যে মাথা তুলতেই,—ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে মঁশিয়ে দ্য মেরেট! এবং সঙ্গে সংগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাদাম মেরেট।

'মাদামকে শুইয়ে দাও বিছানায়।'—নির্মম কঠিন সেই স্বর। আগে থেকে বুঝেই তিনি এই ফন্দীটা খাটিয়েছেন। দুভিদেয়ারকে আগেই তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেও এসে হাজির হ'ল: মাদাম মেরেট তখন মোটামুটি সামলে উঠেছেন। মঁশিয়ে মেরেট তখন দুভিদেয়ারকে জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা, তুমি কি কোনো স্পেনীয়ের কাছ থেকে এই ক্রুশটা

কিনেছিলে ?'

'না, হুজুর !'

'চমৎকার !'—স্ত্রীর দিকে তাঁর দৃষ্টি ঠিক শিকারী বাঘের মতো। বিশ্বস্ত চাকরকে বললেন—'জিন, আমার খাবারটা এই ঘরেই দিয়ে যাবে তুমি ; মাদাম অসুস্থ, এ ঘর ছেড়ে যেতে পারছি না।'

এই সাংঘাতিক লোকটি বিশটি দিনের মধ্যে একটিবারও স্ত্রীর ঘর ছেড়ে নড়লেন না। প্রথম কয়েকদিন আলমারীর ওখানে একটু শব্দ শুনতে পেলেই মাদাম মেরেট এগিয়ে যেতেন সেই দুর্ভাগা মুমূর্ষুর দিকে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই স্বামী এসে পথ আগলে দাঁড়ান এবং বলেন—'তুমিই তো পবিত্র ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করেছ : ওখানে কেউ নাই !'

—কাহিনীটা শুনে মেয়েরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল, কেউ কেউ আঁৎকে উঠল শেষের দিকটায় ! আস্তে আস্তে যেন একটা ভয়াবহ যবনিকা উঠে গেল সবার উপর দিয়ে !

নাচ-মুখোশের অন্তরালে

আগেই বলে রেখেছি, আমি বাড়ীতে নেই। কিন্তু এক বন্ধু ঢুকল এসে জোর ক'রেই। চাকরটা জানাল—'মিঃ এণ্টনি!' চাকরটার আড়ালেই দেখতে পেলাম কালো ফ্রককোটের একটা অংশ। ফ্রককোটটাও সম্ভবত আমার ড্রেসিং-গাউনটা দেখে ফেলেছে! এবার আর গা ঢাকা দেওয়া যাবে না।

'বেশ, ঢুকতে দাও।' জোরে জোরেই বললাম আমি। 'যাও, জাহান্নামে যাও!'—বললাম মনে মনে।

কাজের সময় কোনো ক্ষতি না করেও বিরক্ত করতে পারে—একমাত্র কোনো প্রণয়িণী কুমারীই! কারণ, অন্তরে অন্তরে তোমার কাজের সংগে সে তো ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত।

অগত্যা তার কাছে এলাম—কঠিন কোনো অধ্যায় লিখবার সময় কেউ এসে বিরক্ত করলে অবস্থাটা হয় যেমন, ঠিক তেমন মেজাজেই! কিন্তু তাকে এমন মলিন ও বিপর্যস্ত দেখলাম যে প্রথমেই বলে উঠলাম —'একি, কি হয়েছে তোমার?'

'ওঃ, দম নিতে দাও!'—বলল সে—'আমি তোমাকে সব কথাই বলছি। হয়ত তা স্বপ্ন, হয়ত পাগল হয়ে গেছি আমিই।'

সে একটা আরাম কেদারায় ধপ্ করে বসে পড়ে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল মাথাটা।

বিস্ময়ভবে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। টপ্ টপ্ করে জল ঝরছিল তার চুল থেকে; জুতো হাঁটু ও ট্রাউজারের নিচুটা ছিল কাদায় ভরা। জানালায় এসে দোরেই দেখতে পেলাম তার চাকর ও সহিসকে, কিন্তু বুঝে উঠলাম না কিছুই।

আমার বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করল সে। 'পেরে-লেশেজের কবরভূমি থেকে এলাম এইমাত্রই!'—বলল সে।

'দশটায় ছিলে সেখানে?'

'হ্যাঁ, আর সাতটার সময় ছিলাম একটা ভয়ানক মুখোশ-নাচে।' কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না—মুখোশ-নাচের সংগে পেরে-লেশেজের কী সম্পর্ক? হাল ছেড়ে দিলাম। অন্যদিকে ফিরে পকেট থেকে

একটা সিগ্রেট বার ক'রে আঙুলের মধ্যে অনবরত ঘোরাতে থাকলাম অসীম ধৈর্যভরে।

এবারে সে কথা শুরু করতেই আমি জানিয়ে দিলাম, এরকম ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার মতো ধাত আমার নয়। সে আমার হাতখানি ঠেলে দিল একপাশে।

তখন আমি ঝুঁকে পড়লাম সিগ্রেট ধরাতে—কিন্তু সে আমাকে থামিয়ে দিল আবারো।

'আলেকজান্দার!'—সে বলে উঠল—'তোমার হাত দুটি ধরে বলছি, একবার শোনো।'

'কিন্তু মিনিট পনেরো সমানে কাটিয়ে দিলে, একটি কথাও তো মুখ দিয়ে বেরোয়নি এখনো।'

'ওঃ, সে এক অদ্ভুত কাহিনী।'

দাঁড়িয়ে পড়ে সিগ্রেটটা রাখলাম পকেটের মধ্যে এবং অপেক্ষায় রইলাম হাত দু'খানি বুকের উপর ভাঁজ ক'রে—আত্মসমর্পণের ভংগীতে। আমারো এবার বিশ্বাস হচ্ছিল যে পাগল হয়ে যাচ্ছি আমিও।

'মনে আছে তোমার অপেরার সেই বলনাচ—যেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'—কিছু পরেই বলল সে।

'সেই যেখানে অন্তত দু'শ লোক জড়ো হয়েছিল।'

'হ্যাঁ ঠিক সেইখানেই। তোমাকে ছেড়ে আমি চলে গেলাম নতুন একটা মজার ব্যাপারে। তুমি বারণ করছিলে, কিন্তু নিয়তিই ঠেলে পাঠাল আমাকে। তোমার তো দূরদৃষ্টি আছে—তুমি কেন আমাকে ঠেকিয়ে রাখলে না?···

বিষণ্ন ও বিরক্ত মনেই চলে আসছিলাম অপেরা ছেড়ে।

হলঘর হৈ-হল্লায় মুখরিত—বক্সে মেঝেতে সর্বত্রই হৈ-হল্লা। ঘুরতে লাগলাম সমস্ত ঘরময়—অন্তত বিশটি মুখোশ ডাক দিল আমাকে, তাদের নিজেদের নামও জানিয়ে দিল সংগে সংগে।

এরাই এই মুখোশ-নাচের উদ্যোক্তা,—এবং সবাই হ'ল অভিজাত শ্রেণীর ধনিক বা বণিক। কিন্তু সে-কথা তাদের মনেও থাকে না এই নৃত্য-বাসরে। সবাই অবিশ্যি শিক্ষিত ও মার্জিত পরিবারেরি তরুণ-তরুণী। এখানে তারা বংশমর্যাদা বা শিক্ষার কথা ভুলে গিয়ে আমোদ করে প্রাণ খুলে। অনেকবারই এমনি নাচের কথা শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি।

কয়েকটা ধাপ উঠে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম নিচের জন-সায়রের উত্তাল দোলা। নানা রঙের কোট, চিত্র-বিচিত্র পোশাক, অদ্ভুত সব মুখোশ—সব মিলে মনেই হয় না দৃশ্যটি মনুষ্য-জগতের। শুরু হ'ল গান! কখনো এই বিচিত্র প্রাণীরা দুলতে লাগল অর্কেস্ট্রার সুরে সুরে,—আর সেই সঙ্গে কী অট্টহাসি, সে কী চীৎকার আর শিসের চোট! হাতে হাত দিয়ে ধরে নিয়েছে এ ওর বাহু বা ঘাড়, সবমিলে সে এক বিরাট বৃত্ত! ঘূর্ণয়মান গতিতে তরুণ-তরুণীরা নাচছে, পায়ের শব্দ বাজছে, উড়ছে ধুলো, ঘরের মধ্যে আলো-ঝলকের মাঝে ফুটে উঠছে ধূলিকণা। ক্রমেই বেড়ে উঠছে নাচের তাল আর চীৎকারের মাত্রা! ক্রমেই ঘুরে ঘুরে চলছে নাচিয়েরা, হেলে দুলে চলছে মাতালের মতো, চিৎকার করছে ক্ষ্যাপা মেয়েলোকের মতো। আনন্দের চেয়ে উন্মাদনা বেশী, সুখের চেয়ে উচ্ছ্বাসই বড়। যেন দানবের দৌলতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক নারকীয় নাটক!

সব দৃশ্য একে একে চলে যাচ্ছে আমার চোখের উপর দিয়ে : তাদের ঘূর্ণীগতির দোলা লাগছে আমার গায়ে। আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে পরিচিত লোকেরা এমন দু-একটা রসাল কথা ছুঁড়ে মারছিল যে লজ্জায় আমি লাল হয়ে উঠছিলাম। ঠিক ঘরের ভিতরকার মতোই আমার মাথার ভিতরেও ঘুরপাক খেতে লাগল ঐসব গুঞ্জনধ্বনি, হৈ চৈ আর গান-বাজনা। শিগগিরি আমার দশা এমন চরমে উঠল যে বুঝতে পারলাম না—আমার চোখের সামনেকার সবকিছু স্বপ্ন, না সত্যি! নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম—আমিই পাগল হয়ে গেছি, না ওরা? উল্লসিত ঘূর্ণীর মাঝে নিজেকে ছেড়ে দেবার জন্যে একটা দুর্দম আকাঙ্ক্ষা জাগল,—আমিও বিচিত্র ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে চীৎকার করতে থাকব ওদেরি মতো! আর একটু হলেই পাগল হবার উপক্রম! হঠাৎ ভয় হ'ল। ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে এলাম বাইরে,—দোর পর্যন্ত পিছু পিছু ধাওয়া করতে লাগল সেই চিৎকার আর হাসি। গুহা থেকে বেরিয়ে আসা কামার্ত হরিণীর চীৎকারের মতো সেই শব্দ!

গেটে এসে দাঁড়ালাম—নিজেকে সামলে নেবার জন্যে। রাস্তায় নামতে যেন সাহস হচ্ছে না। সে এমন একটা উন্মত্ত অবস্থা যে ভয় হচ্ছিল পথই চিনে উঠতে পারব না, হয়ত বা চলন্ত গাড়ীর তলায়ই চাপা পড়ব।

ঠিক এমন একটি মাতালের মতো দশা—কিছুটা সামলে উঠলে তবেই

যে বুঝতে পারে নিজের বেসামাল অবস্থাটার কথা : তার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু শক্তি থাকে না, স্থির দৃষ্টিও হয় অর্থহীন ! আর, তাই বুঝতে পেরে সে তখন আঁকড়ে ধরে রাস্তার কোনো থাম বা কোনো গাছ।

ঠিক তখনি একটা গাড়ী এসে থামল দোরের কাছে, তার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটি মহিলা। বার-বারান্দায় ঢুকে সে মাথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল, যেন হারিয়ে গেছে পথ। কালো একটা পোশাক তার গায়ে, মুখখানি মখমলের ঝালরে ঢাকা। সে দোরের কাছে এসে দাঁড়াল।

'আপনার টিকিট ?'—জিজ্ঞেস করে দারোয়ান।

'টিকিট ? টিকিট নেই তো !'

'টিকিট অফিস থেকে নিয়ে নিন একটা।'

সে বাইর বারান্দায় এসে ত্রস্তের মতো একে একে খুঁজতে লাগল সব পকেটই।

'টাকা নেই তো !'—বলে ওঠে—'হ্যাঁ এই যে আমার আংটি, এটার বদলে ঢুকতে দিতে পারেন।'

'তা হয় না।'—টিকিট-অফিস থেকে বলল—'আমরা অন্যায় লাভ করতে চাই না।'

আংটিটা সরিয়ে দিল সে, এবং সেটা মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে আমার পায়ের কাছে এল।

মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছে পাষাণ-মূর্তি'র মতো,—আংটির কথাও ভুলে গেছে, ভাবনায় ডুবে আছে।

আংটিটা তুলে দিলাম তাকে। দেখলাম, ওড়নার ভিতর দিয়ে তার চোখ দুটি আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে।

'আপনি আমাকে ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করুন, এটুকু আপনাকে করতেই হবে।'

'কিন্তু আমি যে চলে যাচ্ছি।'—বললাম।

'তবে, এই আংটিটার বদলে দুটো ক্র'া দিন আমাকে। এই উপকার-টুকুর জন্য চিরদিন আপনাকে মনে রাখব।'

আংটিটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে অফিস থেকে দুটো টিকিট কিনলাম। দু'জনে একসাথেই ঢুকলাম এবার। বারান্দা দিয়ে ঢুকবার সময় মনে হ'ল তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে, একহাত দিয়ে সে আমার বাহু জড়িয়ে ধরল।

'আপনার কি কষ্ট হচ্ছে খুব !'—জিজ্ঞেস করলাম।

'না, না, ও কিছু নয় ! কেমন একটু মাথা ঘুরছে আমার।' তাড়াতাড়ি হলঘরে ঢুকল সে। জনারণ্যের মধ্য দিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে পথ করে সেই মুখোশ-পরা লোকদের অনুসরণ করতে করতে আমরা তিনবার ঘুরপাক খেলাম হলঘরটা। দু' একটা অশ্লীল অভদ্র কথা মেয়েটির কানে পেঁছিতেই সে যেন শিউরে উঠছিল। একটি মেয়ের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন জায়গায়—একথা ভেবে লজ্জাই লাগছিল। এবার হলঘরের প্রান্তে পেঁছিলাম এসে।

একটা সোফার উপরে ধপ করে বসে পড়ল সে, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তার চেয়ারের পেছনটা ধ'রে।

সে বলতে লাগল—'আমার অদৃষ্ট ! এসব নিশ্চয়ই আপনার কাছে ক্ষ্যাপামি বলেই মনে হবে, আমার কাছেই মনে হয়। এসব ব্যাপার ধারণায়ও ছিল না আমার, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এমনটা হতে পারে। কিন্তু কয়েকজন লোক আমাকে লিখে জানিয়েছে—একটি মেয়ের সাথে সে আসবে এখানে। এমন জায়গায় কি ধরণের মেয়েলোক আসে তা তো বুঝতেই পারছেন।'

বিস্মিত হলাম আমি। সেও তা বুঝল—'আমিও তো এখানেই এসেছি ! আপনি জানতে চাইছেন, কেন ? আমার কথা আলাদা। —আমি—আমি তো তাকে খুঁজছি। আমি তাঁর স্ত্রী ! আর এই সব লোক এসেছে মাতলামি আর নষ্টামির জন্যে। কিন্তু আমি—আমি যে ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছি ! সর্বত্রই খুঁজেছি তাকে, একটা কবরভূমিতে রয়েছি সমস্ত রাত—পড়ে রয়েছি বধ্যভূমিতে পর্যন্ত ! অথচ আপনার কাছে শপথ করছি, কুমারী বয়সে মাকে ছাড়া একটিবারও রাস্তায় পা বাড়াইনি। বিয়ের পরে চাকরকে সংগে না নিয়ে একা রাস্তায় নামিনি। আর, আজকে আমি এখানে এসেছি—একটা খারাপ মেয়ের মতোই ! অজানা এক পুরুষের বাহুতে রেখেছি আমার বাহু, এবং তিনি কি মনে করেছেন ভেবে ওড়নার আড়ালে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। সবি বুঝি আমি—কিন্তু কখনো কি বুঝেছেন ঈর্ষা কী ভয়ানক !'

'সে দুর্ভাগ্য হয়েছে আমার !'—বললাম।

'তা হ'লে আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন, আপনি বুঝবেন সব। মানুষকে যে শক্তি লজ্জা ও পাপের মধ্যে টেনে নামায়—আপনি তা

অনুভব করতে পারবেন, আপনি উদ্‌ভ্রান্তের মতোই তা হ'লে ছুটে থাকবেন লক্ষ্যহারা প্রাণের টানে। প্রতিহিংসার জন্যে এমন সময় মানুষে কি না করে বসতে পারে?'

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। আমাদের সম্মুখ দিয়ে দুটি মুখোশ চলে যাচ্ছিল, সে তীক্ষ্ণ চোখে তাদের অনুসরণ করল।

'চুপ!'—বলল সে।

আমাকে সংগে নিয়ে সে চলতে লাগল তাদের পিছু পিছু। আমি যেন একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছি, অথচ তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। অনেকগুলি রশি যেন আমার সামনে ঘুরছে ফিরছে, কিন্তু একটাকেও আমি ধরে রাখতে পারছি না।

কিন্তু মেয়েটিকে এত বিব্রত দেখে সবকিছু জানবার জন্যে কৌতূহলই জাগল। তার সব কথা শুনে যাচ্ছি আমি, ঠিক একটি শিশুর মতোই অনুসরণ করছি দু'টি ছদ্মবেশীকে। স্পষ্টতই তাদের একটি পুরুষ, একটি মেয়ে। নিচু গলায় কথা বলছিল তারা, কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম। 'ওই যে সে!'—আমার সঙ্গিনী মেয়েটির গলা ধরে আসে—'ওই তার কথা! হাঁ, ওই যে সে—'

মুখোশ দুটির একটি হাসছিল।

'ঠিক তার হাসি! সে-ই, হ্যাঁ, সে-ই। লোকজন আমাকে ঠিকই জানিয়েছে।'

দুটি ছদ্মবেশীই ঘুরে ঘুরে চলছে। আমরাও অনুসরণ করে ফিরছি। হল থেকে বেরুল তারা। আমরাও পিছু পিছু। মাঝামাঝি জায়গায় একটা বক্সের কাছে এসে থামল তারা, আমরাও ঠিক দুটি ছায়ার মতোই অনুসরণ করছি তাদের। একটা ছোট বক্স খুলে ঢুকল তারা, বন্ধ হয়ে গেল দোরটাও।

আমার বাহুতে আশ্রিতা মেয়েটি তখন এমন ব্যস্ত হয়ে উঠল যে আমি ঘাবড়েই গেলাম। তার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু আমার গায়ে সে এলিয়ে পড়েছে বলে অনুভব করছিলাম তার বুকের স্পন্দন, তার দেহের কম্পন! তার দুঃখের কথা শুনে ও তার দেহের অবস্থা দেখে আমার মনে জেগে উঠল কেমন একটা বিপদের আভাস। যদিও তার কারণ জানি না কিছুই……হ্যাঁ, দুনিয়ার সমস্ত ধনদৌলতের বিনিময়েও আমি তখন সেই মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে পারতাম না।

ছদ্মবেশী দুটিকে বক্সে ঢুকে দোর বন্ধ করতে দেখে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—একেবারেই বিমূঢ়ের মতো, তারপর তাদের দোরের কাছে ঝুঁকে পড়ে কান খাড়া করে রইল। এমন অবস্থায় একটু নড়াচড়া করলেই ধরা পড়ে যাবে—সর্বনাশ হয়ে যাবে! তাই আমি তাকে জোর করে টেনে নিয়ে এলাম পাশের বক্সে, দোরটা বন্ধ করে দিলাম। বললাম—'শুনতে চাইলে এখান থেকেই শুনুন, দয়া করে এখান থেকেই শুনুন।'

সে হাঁটু গেড়ে বসে 'পার্টিশন'-এ কান চেপে রাখল, আর আমি—আমি পাষাণ-মূর্তির মতো তার পাশে দাঁড়িয়ে। হাত দু'খানা বুকের উপর ভাঁজ করা, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে নানা চিন্তার ভারে।

মেয়েটির যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম তাতেই বুঝলাম—খুব সুন্দরী সে। মুখের নিচের দিকটা ওড়নায় ঢাকা ছিল না, সেটুকু কী যে লাবণ্যময়, কী যে কোমল ও নিটোল! টুকটুকে কোমল অধর! ওড়নার পাশে দাঁতের সারি দেখাছিল মুক্তো-মালার মতো! হাত দু'টি যেন মর্মরে কুঁদে গড়া, তনুলতা যেন শিল্পীর প্রণয়ে গড়া। কালো সিল্কের মতো নরম চুলের রাশি এলিয়ে পড়েছে পিঠের উপর, শিশুর পায়ের মতো ছোট্ট পা দু'টি চঞ্চল স্কার্টের নিচু দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বারবার। এত ছোট সেই পা দু'টি, তার নমনীয় দেহলতার অপরূপ দোলা তা যেন সইতে পারছে না!

আঃ, কি অপরূপ সুন্দরী সে। আর কী সৌভাগ্যবান সেই পুরুষ যে তাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারবে, পাবে তার ভালোবাসা, নিজের বুকে অনুভব করতে পাবে তার ওই কোমল বক্ষ-কমলের কম্পন, তার গভীর প্রাণের স্পন্দন—ভীরু ধুক ধুক! সে-ই তো বলতে পারবে—'ভালোবাসার কি অপূর্ব মহিমা! লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে আমি সেই 'ভালোবাসা—সেই স্বর্গীয় ভালোবাসা পেয়ে ধন্য!' ওঃ, কে সেই ভাগ্যবান পুরুষ?

তাই ভাবছিলাম। তখন মেয়েটি উঠে আমার কাছে কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগল—

'আমি সুন্দর, সত্যিই সুন্দর! বয়সও আমার কম, মাত্র উনিশ। ফুলের মতোই শুভ্র, অকলঙ্ক আমি। বেশ, আজ তবে তাই হ'ক!' সে তার দুই বাহু দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল—'হ্যাঁ আমি তোমার,

আমাকে নাও !' অমনি তার ওষ্ঠ এঁটে রইল এক নিবিড় চুম্বনে। চুম্বন নয়, বরং কামড়ের মতোই একটা অনুভূতি আমার সর্বাঙ্গে জাগিয়ে তুলল কেমন এক বিষণ্ণ শিহরণ ! আমার চোখের সামনে বয়ে গেল আগুনের ঝড় ! কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আমার দুই বাহুর মধ্যে আধমরার মতো এলিয়ে পড়ল, কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ধীরে ধীরে সামলে উঠল সে, ওড়নার নিচু দিয়ে দেখলাম তার চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। তার মুখের নিচের দিকটায় চোখ পড়ছিল শুধু,—কী মলিন করুণ সে ছবি ! ঠক ঠক ক'রে দাঁত কাঁপছে—সবি তো দেখতে পাচ্ছিলাম।

এবারে সব ঘটনা মনে করে সে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—'আমার উপরে আপনার কণামাত্র করুণাও যদি থাকে, একটুও সহানুভূতি যদি থাকে তবে আমার দিকে ফিরে তাকাবেন না আর, কখনো জানিতে চাইবেন না আমার কথা। আমাকে যেতে দিন, ভুলে যান আমাকে, একেবারে ভুলে যান। আমি নিজেই মনে রাখব আমাদের দুজনকেই !'

আবারো সে উঠে দাঁড়াল, কী ভেবে হঠাৎ ছুটে গিয়ে দোর খুলল, এবং ফিরে এসে আবারো বলল—'আমাকে অনুসরণ করবেন না, আপনার পা ছুঁয়ে অনুরোধ করছি। আমার কোনো খোঁজখবর নেবেন না।'

সামনের দোরটা একবার খুলে গিয়েই বন্ধ হয়ে গেল—তার ও আমার মাঝখানে ! আমার চোখের আড়ালে চলে গেল সে—স্বপ্নের মতো ! আর দেখিনি তাকে কোনোদিনই।

কোনোদিনই আর দেখিনি ! এই ছ'মাসের প্রত্যেক দিন তাকে খুঁজেছি আমি সর্বত্র—বলনাচে, প্রদর্শনীতে, মাঠেঘাটে। কখনো কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলেই, শিশুদের মতো ছোট্ট দুটি পা আর কালো চুলের রাশি দেখলেই ছায়ার মতো আমি অনুসরণ করেছি, কাছে ঘনিয়ে এসেছি, তাকিয়ে রয়েছি তার মুখে। বুকে কত আশা, হয়তো তার মুখের সরমের রাঙা আভাসটুকু দেখেই চিনব তাকে ! কিন্তু কোথাও তো তাকে আর খুঁজে পাইনি, কোথাও দেখিনি তাকে। শুধু রাতে—রাতের স্বপ্নেই এসেছে সে। ওঃ, স্বপ্নে এসেছে সে, আবারো এসেছে সে ! আবারো অনুভব করেছি তার আগমন, অনুভব করেছি তার আলিঙ্গন, তার বুকচাপা বুক-ভাঙা আলিঙ্গন ! সেই আলিঙ্গনে আছে এক

সর্বনাশা শক্তি আছে কী যেন রাক্ষুসী মায়া। তারপর, তারপর খুলে পড়েছে আবরণ, ফুটে উঠেছে একখানি মুখ—মেঘে-ঢাকা অস্পষ্ট মুখ। কখনো-বা চাঁদের মতো উজ্জ্বল, চারদিকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে বৃত্তাকারে। আর কখনো-বা এসেছে সে নগ্ন এক শুভ্র কঙ্কাল, একটা খুলি! চোখ উবে গেছে কোটর থেকে, ঠক ঠক করছে কয়েকটি দাঁত।

সত্যিই, সেই রাত থেকে আমি আর বেঁচে নেই,—অজানা এক নারীর জন্যে জ্বলে পুড়ে মরছি উন্মাদ প্রেমের দহনে; কত আশা করে করে আশাহত হয়েছি নিত্য নিয়ত। অধিকার না থাকলেও জ্বলে মরেছি ঈর্ষার জ্বালায়—অথচ জানি না ঈর্ষা করছি কাকে! এই উন্মাদনার কথা বাইরে কারো কাছে স্বীকার করতেও সাহস হয় না, অথচ সব সময়ে সে আছে আমার পিছু পিছু, ক্ষয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে! আমাকে মেরে ফেলছে সে—আমার সেই অচিনা!'—এই কথা বলেই সে বুক থেকে টেনে বার করল একটা চিঠি।

'তোমাকে সব বলেছি'—সে বলল—'এখন এই চিঠিটা পড়ো।'

চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলাম—

'আপনি বোধ হয়, সেই অভাগিনী মেয়েটিকে ভুলে গেছেন। তবে, সে কিছুই ভোলেনি—আর ভোলেনি বলেই আজ মরছে সে!

'এই চিঠি পড়ার সময় এ পৃথিবীতে থাকব না আমি। পেরে লেশেজের কবরভূমিতে গিয়ে মেরী নামের সবচেয়ে নতুন কবরটি দেখতে চাইবেন একবার। কবরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে একটু প্রার্থনা করবেন এই অভাগিনীর জন্যে।'

'হায় ভগবান!'—এণ্টর্নি বন্ধু বলতে লাগল—'কাল চিঠি পেয়ে আজ ভোরেই গেছি সেখানে। আমাকে তারা কবরটা দেখাল! আমি কবরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুঘণ্টা প্রার্থনা করলাম, আর কাঁদলাম শুধু! বুঝতে পারছ, আলেকজান্দার? সেই কবরেই রয়েছে সে, সেই নারী। নিভে গেছে তার সুন্দর প্রাণ—মিলিয়ে গেছে, তার পোড়াদেহ ঈর্ষায় অনু-শোচনায় ভেঙে পড়েছে মাটির তলায়। সেই নারী, আমার পায়ের কাছে—এই মাটির নিচে! একদিন বেঁচে ছিল সে, আর আমার জন্যেই চলে গেল আজ কোন্ যবনিকার আড়ালে! এখন নির্জন কবরের মতোই সে আসন পেতেছে আমার সারাটা জীবন জুড়ে! সেই অচিনা আমার বুকেও কবর দিয়ে রেখে গেছে একটি মৃতদেহ—মৃত্যু-হিম একটি দেহ! ওঃ, ওঃ,

ভগবান! এমন আর শুনেছ তুমি? এত ভয়ানক কিছু শুনেছ আর? অথচ আজ তো সবি অন্ধকার! কোনোদিনই তো তাকে আর দেখতে পাব না? কবর খুঁড়ে বার করে এনে আবারো তাকে বাঁচিয়ে তুলব, হয়তো তার সেই মুখখানি আমার মানস-পটে এ'কে রাখবার মতো কোনো চিহ্ন, কোনো কিছু খুঁজে পাব আমি। আমি কী যে ভালোবাসি তাকে, তুমি কি বুঝবে বন্ধু! পাগলের মতো ভালোবাসি তাকে। তার কাছে গিয়ে মিলবার জন্যে আমি আত্মহত্যা করতাম, কিন্তু সে যে আমার সেই চিরদিনের অচিনা, চিনি না যে কে সে! কে আমার সেই অচিনা! এ পৃথিবীর মতোই ওপারেও তো সে আমার চির-অচিনাই থেকে যাবে!'

—এই বলেই সে চিঠিটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বারংবার চুমো খেতে লাগল, আর হু হু করে কাঁদতে লাগল—ছোট্ট একটি শিশুর মতোই।

আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। কি যে বলব ভেবে না পেয়ে তার সাথে সাথে আমিও ঝরঝর করে কে'দে ফেললাম।

রূপ না দিলে যদি

আমার এক বন্ধু আমাকে এই গল্পটি শুনিয়েছিলেন ঃ

আমি তখন মস্কো শহরে ছোট্ট একটি বাড়ীতে থেকে পড়াশোনা করতাম। আমার পাশের বাড়ীতেই থাকত একটি মেয়ে। মেয়েটি বিদেশী। নাম তেরেসা। লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। মোটা মোটা ভুরু দুটোতে ঘনিয়ে রয়েছে যেন ঝোপের অন্ধকার। মুখখানা চ্যাপ্টা কদাকার— কুঁদে গড়া হয়নি, কোদাল দিয়েই গড়া হয়েছে যেন! চোখের দৃষ্টিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জানোয়ার। গম্ভীর ও কর্কশ কণ্ঠস্বর; চাল-চলন ও ভাব-ভংগী গাড়োয়ানের মতো, গায়ের জোর পালোয়ানকে হার মানায়। আমাদের দু'জনের ঘর ছিল মুখোমুখী—দুই চিলেকোঠায়। মেয়েটি ঘরে আছে জানলে আমি কক্ষনো দোর খুলতাম না। তবে পথে পার্কে প্রায়ই দেখা হ'ত তার সঙ্গে। সে তখন আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু মৃদু হাসত। কখনো বা দেখতাম মেয়েটি ঘরে ঢুকছে—চোখ দুটি লাল, চুল এলোমেলো। সে তখন নির্লজ্জের মতো আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, হেসে বলত—'আপনি লেখাপড়া করছেন?'

মেয়েটির এই বোকার মতো হাসি আমার কাছে বড্ড বিরক্তিকর লাগত। তার সংগে যাতে আর দেখা-সাক্ষৎ না ঘটে সে জন্যে বিরক্তিতে আমি এ বাসা ছেড়েই দেব ঠিক করেছিলাম; কিন্তু বাড়ীটি ছিল বেশ ভালো জায়গায়—শহরের প্রান্তে। সেখানকার নিরালায় পরম শান্তিতে থেকে শহরের সবকিছুই দেখতেও পেতাম; বাড়ীটির পাশের রাস্তাটাও ছিল নিঃঝুম নীরব। কাজেই এমন ভালো জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যাওয়াটা হ'ল না। একদিন ভোরে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে আছি— হঠাৎ দেখি খুলে গেল ঘরের দরজাটা, ঢুকল এসে তেরেসা।

'আপনি লেখাপড়া করছেন?'—মেয়েটি ঘড়ঘড়ে গলায় বলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—'কি চাও?' মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম। লুকানো লজ্জার একটা আভা ফুটে উঠল তার চোখেমুখে। তা, এমনটি তো আর কখনো দেখিনি!

মেয়েটি বলতে লাগল—'আপানার একটুখানি অনুগ্রহ চাইতে এসেছি।' শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম—এটা হ'ল এক ধরণের অজুহাত

আর কি! কোনোই জবাব দিলাম না। সে আবার বলে যেতে লাগল—'বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখতে হবে।'

মাথামুণ্ডু বলছে কি সব! একটুখানি ভাবলাম এবং বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে কালি-কলম নিয়ে টেবিলের পাশে এসে বসলাম। তাকে বললাম—'ভিতরে এসো, বলো কি কি লিখতে হবে।'

সে ভেতরে এসে উন্মুখ আগ্রহে আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম—'তা, বেশ তো! কিন্তু কার কাছে লিখতে হবে শুনি?'

'বলশেভের কাছে! থাকে সে রেইল রোডে, ওয়ারশ!'

'কি লিখতে হবে তার কাছে? শিরোনামায়ই বা লিখব কি?'

শিরোনামায় লিখবেন—'আমার বলস্—প্রাণাধিক! ভগবান তোমার কল্যাণ করুন। প্রিয়তম, কেন এতো দিনের মধ্যেও তোমার প্রাণের পাখী তেরেসার কাছে কোনো চিঠিপত্রই লেখোনি! এতে হতভাগী যে কত ব্যথা পায় তা কি তুমি বোঝো না?'

অতিকষ্টে হাসি চেপে রাখলাম। এই বেচারী 'পাখীটি'-র কথা ভাবতেই আমার তাক লেগে গেল। লম্বায় হবে পুরো ছ' ফুট, হাত দুটো ঠিক মুষ্টিযোদ্ধার মতো, মুখখানা পোড়াকাঠ। ঝিয়ের কাজ ছাড়া জীবনে বোধ হয় আর কোনো কাজই করেনি—আর সে কিনা প্রাণের পাখী! কিন্তু আমি এবারে সোজা তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'এই বলশেভটি কে?'

'আমার বলশ—' সে যেন হঠাৎ ঘাবড়ে গেল। তার ধারণাই ছিল না কেউ তাকে এমনভাবে তার বলশেভের কথা জিজ্ঞেস করতে পারে।

'বলশেভ আমার প্রবাসী প্রণয়ী...'

'প্রবাসী প্রণয়ী?'

'আপনি অবাক হলেন?'—মেয়েটি বলল, 'কেন, আমার মতো তরুণীর কি কোনো প্রণয়ী থাকতে পারে না?'

আমি তখন ভাবলাম—তরুণী? কি হাসির কথাই না শুনছি। জিজ্ঞেস করলাম,—

'কদিন হ'ল তার প্রেমে পড়েছ?'

'আজ দশ বছর।'

যাই হ'ক, শেষ পর্যন্ত আমি তার চিঠি লিখে দিয়েছিলাম ; ভালোবাসার এত করুণ আর দরদমাখা ভাষায় সে চিঠি লেখা হয়েছিল যে ইচ্ছে হ'ল আমি নিজেই বলশেভের আসনটি দখল করে বসি,—অবিশ্যি এই প্রণয়-আবাহন তেরেসার নয়, আর কারো কাছ থেকে এলে তবেই। প্রেমলিপি লেখা শেষ হ'লে মেয়েটি আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল।

তারপর আবার সে গম্ভীর ভাবে বলল—'আমি কি আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি ?'

'না, ধন্যবাদ ! আমার জন্যে তোমাকে কিছুই করতে হবে না।'

'আমার কিন্তু বড় ইচ্ছে হয় আপনার জামা-কাপড় সেলাই করে দিই, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি।'

আমি এ কথায় খুবি বিরক্তি বোধ করলাম, তাকে জানিয়ে দিলাম আমার কোনো কাজই তাকে করতে হবে না। বাধ্য হয়ে মেয়েটি প্রস্থান করল।

প্রায় দু'হপ্তা কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যায় আমি জানলার পাশে বসে আছি, মাঝে মাঝে উঠে পায়চারি করছি আর গুনগুনিয়ে গান গাইছি। সেদিনটার আবহাওয়া ছিল বড্ড বিশ্রী, কাজেই বাইরে যাইনি। হঠাৎ দেখি দরজাটা খুলে গেল। নিশ্চয়ই কেউ এসেছে।

এ-যে তেরেসা !

'আপনি কি পড়াশুনায় খুব ব্যস্ত আছেন ?'

'না, কেন ?'

'দয়া করে কি আপনি আমাকে আর একটি চিঠি লিখে দিতে পারেন ?'

'তা দিতে পারি। কার কাছে, বলশের কাছে ?'

'না, আমি তার জবাবটা চাই।'

'কি বললে ?'—আমি রীতিমতো চেঁচিয়েই উঠছিলাম আর কি !

'আপনি আমায় মাফ করুন, দেখছেন না আমি বড় বোকা। মনের কথা গুছিয়ে বলতে পারি না। এ চিঠি আমার জন্যে লেখাতে আসিনি,—আমার এক বন্ধুর জন্যে। বন্ধুও ঠিক বলতে পারি না, তবে আমার খুবি পরিচিত। কি করে লিখতে হয় জানে না সে ; আমার মতো তারো একজন প্রণয়ী আছে, বিদেশে থাকে সে—'

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এতে সে' ভারী লজ্জা

পেয়ে গেল। লজ্জায় ভয়ে সে যেন আড়ষ্ট হয়ে রইল, তার হাত কাঁপতে লাগল। মনে হ'ল, আমি তার আসল ব্যাপারটা ধরে ফেলেছি।

আমি তখন বেশ রাগের সুরেই তাকে বললাম—'দেখো, যেসব কথা তোমার বন্ধুদের সম্বন্ধে বলেছ তার সবি তোমার মিথ্যে কথা—তোমার উদ্ভট কল্পনা! আসলে এটা হ'ল আমার এখানে আসবার একটা ফিকির। হ্যাঁ, শুনে রাখো, তোমার সংগে কোনো কথা বলতেও আর রুচি হয় না আমার। বুঝলে তো?'

আমার এখনো বেশ স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে যেন লজ্জায় ও অপমানে বিবর্ণ হয়ে গেল,—কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না। হঠাৎ মনে হ'ল, মেয়েটিকে নিশ্চয়ই ভুল বুঝেছি, আমাকে ফাঁদে ফেলবার মতো দুঃসাহস নিয়ে নিশ্চয়ই সে আমার কাছে আসেনি। এর পিছনে একটা কিছু আছে অবিশ্যি, কিন্তু কী আছে?

মেয়েটি বলতে যাচ্ছিল—'আপনি তো লেখাপড়া করেন—' কিন্তু কথা শেষ না করেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বসে রইলাম, মনে অত্যন্ত অস্বস্তি হ'ল। মেয়েটি যে সশব্দে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল—শুনতে পেলাম। সে চলে গেছে বেশ একটু রাগত ভাবেই। কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবলাম, মনে হ'ল মেয়েটিকে ফিরিয়ে না দিলেই ভাল হ'ত। তার জন্যে সত্যিই তখন খুব দুঃখ হ'ল।

তার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। টেবিলের পাশে বসে মাথা নিচু করে সে হাত খুঁটছিল।

আমি একটু লজ্জিত হয়েই বললাম—'শোনো তেরেসা, তুমি···'

—বলতে বলতে গল্পটির এ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেই আমার মন ব্যথায় ভরে ওঠে। মেয়েটি আমায় দেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে এগিয়ে এল। চোখ তার লাল, আমার কাঁধে হাত রেখে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল; ব্যথার ভারে তার বুক যেন ভেঙে যাচ্ছে।

সে যেন সব-কথা খুলেই বলতে চায়, অথচ স্পষ্টভাবে কিছুই বলতে পারছে না—'শুধু,—শুধু কয়েকটি ছত্র···লিখে দিলে···আপনার···আপনার কি আসে যেত? ওঃ, আপনাকে ভেবেছিলাম···এত···এত ভালো! না, না—সত্যিকারের বন্ধু ব'লে কেউ নেই, শুধু···আমি পড়ে আছি একা!'

তার কথা শুনে আমি তো হতভম্ব, কি যে বলব কিছুই ঠাহর

করে উঠতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—'তবে কি বলশেভ ব'লে কেউই নেই ?'

'না।'

আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারলাম না—'না, সে হতে পারে না, তেরেসা !'

'না, সত্যিই বলশেভ বলে আমার কোনো প্রণয়ী নেই।'

আমার মাথা যেন ঘুরতে লাগল, দিশেহারার মতো আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। নিশ্চয়ই আমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ একজন উন্মাদ হয়ে থাকব। সে, নয় তো আমি।

মেয়েটি টেবিলের কাছে এগিয়ে এল এবং দেরাজ খুলে হাতড়াতে হাতড়াতে একটুকরো কাগজ বার করল—'এই চিঠিটা আমাকে লিখে দিয়েছিলেন। এই নিন, ফিরিয়ে নিন। আপনি তো আর লিখে দিলেন না, আর কেউ হয়ত দয়া করেও লিখে দেবে।'

বলশেভের কাছে যে চিঠিটা লিখে দিয়েছিলাম সেটা সে আমার হাতে দিল।

'তার অর্থ'! কিছুই যে খেই পাচ্ছি না। শোনো' !— আমি বলে উঠলাম—'এসব কি হচ্ছে তোমার, কেন অপরকে দিয়ে এত করে চিঠি লেখাও—যদি তা ডাকেই না পাঠাও ?

'কিন্তু পাঠাব কার কাছে ?'

'কেন, বলশেভের কাছে—তোমার প্রবাসী প্রণয়ীর কাছে।'

'আমি তো বলেছি এরকম কেউ নেই।'

না, আর এগোনো অসম্ভব। চলে আসা ছাড়া কি আর করি ! মেয়েটি কিন্তু আমার হাত ধরে আবার তার মনের ব্যথার কথা বলতে শুরু করে দিল।

'না, বলশেভ বলে কেউ নেই ! এ নামে আমার কোনো প্রেমিক নেই !' সে যেন মনের কথা আর প্রকাশ করতে পারছে না এমন ভাব করল—'কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে তাকে যে আমার চাই-ই। আমি বেশ জানি, আর দশজন মেয়ের মতো নই আমি, কিন্তু যদি তাকে মনে করে লিখেই থাকি তো কার কী ক্ষতি ?'

'কি সব বকছ তুমি, কার কাছে লেখার কথা বলছ ?'—আমি আরো বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি এই একটু আগেই বললে বলশেভ

বলে কেউ নেই, সবি তোমার নিছক কল্পনা।'

'হায় ভগবান, সে যদি নাই থাকে তাতেই বা কার কী আসে যাচ্ছে। আমার সত্যিকারের কোনো বলশেভ নেই, কিন্তু আমি ভাবি সে আছে। সত্যি সত্যি আছে ভেবে চিঠি লিখি। সেও উত্তর দেয়। আবার লিখি আমি, আবার পাই তার জবাব—এইটুকুই আমার সান্ত্বনা।'

এবারে আমি সবি বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা সত্যিই বড় দুঃখের! কিছুটা লজ্জিতও হলাম, নিজেকে অপরাধী মনে হ'ল। আমি যেন নিদারুণ আঘাত পেলাম। বেচারীর কী দুর্ভাগ্য, বাপ নেই মা নেই আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব বলতে কেউ নেই—এক কথায় বলতে গেলে একটুখানি ভালোবাসা দেখাবারো কেউ নেই তার। অথচ বুকে তার অফুরন্ত প্রেমের উৎস। বেচারী তাই কল্পনায় সৃষ্টি করছে তার প্রণয়ীকে।

ব্যথাভরা একটানা ঘড়ঘড়ে স্বরে মেয়েটি আবার বলতে লাগল— 'আপনাকে দিয়ে বলশেভের কাছে আমি যে চিঠি লিখিয়েছিলাম সেটাই আর একজনকে জোরে জোরে পড়ে শোনাতে অনুরোধ করেছি। তারপর বলশেভের কাছ থেকে তার প্রিয়তমা তেরসার কাছে—আমার কাছে সেই চিঠির জবাবটা চেয়েছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, বলশেভ বেঁচে আছে কোথাও—জানি না সে কোথায়—তাই তো আমিও কোনোরকমে বেঁচে আছি! এতে এ জীবনটাকে খুব কঠোর, খুব নিদারুণ, খুবি একেলা মনে হয় না।'

এরপর থেকে নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে দু'বার করে আমি তাকে চিঠি লিখে দিতাম—তেরেসার কাছ থেকে বলশেভের কাছে, বলশেভের কাছ থেকে তেরেসার কাছে। আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে, তার চিঠির ভাষা হ'ত প্রণয়ের উত্তেজনায় বা উচ্ছ্বাসে ভরপুর! বিশেষ ক'রে জবাবগুলি! সে তা শুনতে থাকত একান্ত আগ্রহ ভরে; কখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত, কখনো বা আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাসতে থাকত।

মাস তিনেক পরে কোনো কারণে সে ধরা পড়ে; জেলে পাঠানো হয় তাকে। আর কখনো এই হতভাগিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, খুব সম্ভব সে কারাগারেই মারা গেছে······

একটি চুম্বন

রাতের মতো অবস্থান করবার জন্যে অশ্বারোহী সেনাদল পথিমধ্যে এক গাঁয়ে এসে থামল। তাঁবু খাটানো ও নানা সাজ-সরঞ্জাম সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার কাজে সবাই যখন একান্ত ব্যস্ত—ছোট্ট একটি ঘোড়ায় চেপে একজন লোক এসে হাজির হ'ল। টুপিটি খুলে সে সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বলল—'এখানকার জমিদারবাবু ভন্ রাবুবেক তাঁর বাড়ীতে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।'

—এই বলেই আবার সে ঘোড়ায় চেপে অদৃশ্য হয়ে গেল। অফিসার দল যথাসময়ে রওনা হল জমিদার বাড়ীর উদ্দেশে···

দলের আগে আগে ছিল লেফটেনেন্ট লবিতকো। লম্বা-চওড়া চেহারা, গোঁফ কামানো, ঠোঁটের ভাঁজটি ভারী সুন্দর। সেনাদলের মধ্যে তার বিশেষ একটি সুনাম ছিল—কোথাও মেয়েলোকের অস্তিত্ব থাকলেই সে অনুভব করতে পারে—বহুদূরে থাকলেও! সঙ্গীদের দিকে ফিরে সে তাই বলে উঠল—'হ্যাঁ, ধরেছি ঠিকই! মেয়েরা আছে নিশ্চিতই—রক্তের মধ্যেই সাড়া পাচ্ছি যে!'

ভন্ রাবুবেক নিজেই সদর দরজায় এসে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন; অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, তাঁদের আগমনে তিনি খুবি খুশি হয়েছেন, রাতে থাকার ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে সবিনয়ে মার্জনাও চাইলেন।···

বৈঠকখানার দোরে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানালেন দীর্ঘাঙ্গী এক বর্ষীয়সী মহিলা। বেশ সুন্দরী, ঘনকৃষ্ণ তাঁর ভুরু, মুখখানি লম্বা ছাঁচের—দেখতে অনেকটা যেন মহারাণীর মতোই।···

অফিসারগণ খাবার হলঘরে প্রবেশ করল। সেখানে ছোট বড় দশ-বারোজন মেয়ে ও পুরুষ একটা লম্বা টেবিলের একধারে বসে বসে চা খাচ্ছিল। পেছন দিকে সিগ্রেটের ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে বসে ছিল কয়েকটি যুবক। তার মধ্যে একজন তারস্বরে ইংরেজীতে কি যেন বলা-বলি করছিল! তারো পেছনে দেখা যাচ্ছে একটা ঘর—আলোতে ঝলমল করছে।

'সমবেত অতিথিবৃন্দ, আপনারা সংখ্যায় এত অসংখ্য যে সবাইকেই

এক এক করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় !'—জমিদারবাবু সারা মুখে প্রফুল্লভাব ধারণ করার চেষ্টা করেন—'আপনারা নিজেরাই বরং সহজভাবে আলাপ পরিচয় করে নিন !'

তখন অফিসারদের মধ্যে কারো মুখ হয়ে উঠল গম্ভীর, কারো মুখে ফুটে উঠল হাসির রেখা—এবং সকলেই বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, বিশেষ ক'রে একজন—সে হ'ল রায়বোভিচ্। লোকটি খুবি বেঁটে, চোখে চশমা।

গৃহস্বামীর কথামতো সবাই অবিশ্যি বসে পড়ল টেবিলের চারপাশে। কিন্তু রায়বোভিচের মুখখানা, তার লাল গোঁফ জোড়া, তার চশমা—তার সবকিছুই শুধু যেন নিবেদন করছিল—'আমি যে সবার চেয়ে লাজুক, সবার চেয়ে বেঁটে, সবার চেয়ে বেরসিক !' প্রথমে সে ঘরে ঢুকে টেবিলের কাছে মুখ নিচু করে বসেই রইল শুধু···কোনো জিনিষপত্রের দিকে বা কারো মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারল না। নানা রকমের মুখ, নানা পোশাক-পরিচ্ছদ, টেবিলে সারি সারি গ্লাস···সব মিলে কেমন একটা আবছা চেতনা একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি তাকে এমনভাবেই আচ্ছন্ন করে ফেলল যে তার ইচ্ছে হ'ল মুখ লুকিয়ে বসে থাকে শুধু ! জনসভায় দাঁড়িয়ে অনভ্যস্ত বক্তার দশাটা হয় যেমন ! তার শূন্য-দৃষ্টির সামনেও সবকিছুই তেমনি থমকে দাঁড়িয়ে রইল অর্থহীনভাবে। কিছুক্ষণ পরে সে চারপাশের সঙ্গে কিছুটা খাপ খাইয়ে নিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। নিজে সে মুখচোরা স্বভাবের—অমিশুক প্রকৃতির, তাই নতুন পরিচিতদের আশ্চর্য স্বাভাবিকতা ও মিশুক-স্বভাব·লক্ষ্য করে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। ভন্ রাবুবেক, তাঁর স্ত্রী, অন্য দুজন বর্ষীয়সী মহিলা, নীলাম্বরী মেয়েটি ও লাল গোঁফওয়ালা যুবকটি অর্থাৎ কিনা রাবুবেকের ছোটছেলেটি···তার অর্থ প্রত্যেকেই এক একজনের পাশে বসে এত সহজ সুরে আলাপ পরিচয় শুরু করল যে দেখে শুনে মনে হ'ল—তারা বুঝি আগেই বেশ খানিকটা রিহার্সেল দিয়ে নিয়েছে।

পিয়ানোতে কে যেন বাজিয়ে চলছিল ব্যথার সুর। জানলা দিয়ে বয়ে আসছিল নির্মল সমীর। সকলেরি মনে হচ্ছিল···এ যেন বসন্তের শেষ। ভারী মধুর আবহাওয়া। হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসছিল গোলাপ লাইলাক্ ও পপ্লারের সৌরভ।

সুরের আমেজে বিশেষ করে সুরার আমেজে রায়বোভিচ্ মশগুল হয়ে

জানলায় হেলান দিয়ে বসে মৃদুমৃদু হাসছিল। তারপর মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তার মনে হচ্ছিল···গোলাপ লাইলাক্ ও পপ্‌লারের সৌরভ বাগান থেকে বয়ে আসছে না,···আসছে মেয়েদের দেহ থেকে পোশাক থেকে!

ভন্ রাবুবেকের ছেলে একটি তন্বী কুমারীকে ডেকে নিয়ে নাচতে নাচতে সমস্ত ঘরটা ঘুরপাক খেয়ে এল দু-তিনবার। লবিত্‌কো পিছল মেঝের উপর দিয়ে পিছ্‌লে এসে ঘরময় চক্কর দিতে লাগল নীলাম্বরী মেয়েটিকে নিয়ে। শুরু হ'ল নাচের মহড়া। রায়বোভিচ্ কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। জীবনে সে কখনো নাচেনি, কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে নাচবার মতো পরম সৌভাগ্য কোনোদিন তার হয়নি। সবার সামনে এক অচেনা তরুণীর লীলায়িত দেহকে বাহুতে জড়িয়ে ধরতে পারাটা রায়বোভিচের কাছে পরম তৃপ্তির মনে হয়, কিন্তু নিজেকে এমন অবস্থায় সে কল্পনায়ও ভাবতে পারে না। একদিন সে তার সঙ্গীদের দুঃসাহসিকতা দেখে তাদের ঈর্ষা করেছে এবং নিজের লাজুক স্বভাব ও কদাকার চেহারার জন্যে মনে মনে শুধু ব্যথাই পেয়েছে,—তারপর বয়সের সঙ্গে সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে সমস্ত রকম বিরূপ অবস্থার মধ্যে। আজ তাই নৃত্য-চঞ্চল যুগলদের দেখে দেখে তার আর ঈর্ষা হচ্ছিল না, তার মনপ্রাণ ছেয়ে ফেলল শুধু কেমন একটা বিষণ্ণ বেদনা···

প্রথম কিস্তি খেলা শেষ হ'ল। রায়বোভিচ্ একমাত্র তাস ছাড়া আর কিছুই খেলেনি কখনো, সে উদাসভাবে তাকিয়ে রইল শুধু। শেষ হবার আগেই রায়বোভিচের ক্লান্তি ধরে গেল, তার মনে হ'ল সে ওখানে অবান্তর ও অনাবশ্যক কিছু একটা,—একটা বাধা বিশেষ! নাচঘরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে আবার সে চলতে লাগল।

পথিমধ্যে ছোটখাট একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। কিছুদূর এগিয়ে আসতেই সে বুঝল যে পথ ভুল হয়েছে। তিন-তিনটা চাকর যে ঘরটায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল—সেটা তো পেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। একে একে আরো দুটো ঘর পেরিয়ে গেল—তবু সেই চাকরদের দেখা নেই। এবারে ভুলটা বুঝতে পেরে একটুখানি পিছিয়ে এসে ডান দিকে মোড় ফিরতেই দেখতে পেল আর একটা ঘর। আবছা অন্ধকার। ঘরটা আগে দেখেছে বলে মনে হ'ল না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সোজা সে

এগিয়ে গেল, দোরটা খুলল। অন্ধকার ঘর। একটা দোরের ফাঁক দিয়ে ঢুকছে এক ঝলক উজ্জ্বল আলো। দোরটার পেছনেই শোনা যাচ্ছে চাপা বিষণ্ণ সুর। নাচঘরটার মতোই এ ঘরটির জানলাগুলিও খোলা, ভেসে আসছে পপলার লাইলাক্ ও গোলাপের গন্ধ।

রায়বোভিচ্ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়েই রইল শুধু। হঠাৎ শোনা গেল কার দ্রুত পদধ্বনি, পোশাকের মৃদু খস্‌খসানি। একটি আবেগ-বিহ্বল নারী-কণ্ঠ ফিসফিস করে বলে উঠল—'আঃ, তুমি এলে!' রায়বোভিচ্‌কে জড়িয়ে ধরল দুটি সুরভিত বাহুলতা,—নিশ্চয়ই কোনো নারীর! জড়িয়ে ধরল তার গলা। একটি গরম গাল লাগল এসে তার গালের উপর, শোনা গেল একটি মৃদু চুম্বনের আওয়াজ। কিন্তু মেয়েটি তক্ষুনি আঁৎকে উঠল অস্ফুট স্বরে। রায়বোভিচের মনে হ'ল, মেয়েটি যেন ভয়ে হঠাৎ তার কাছে থেকে ছিটকে পড়ে গেল দূরে,—পালিয়ে গেল। আর একটু হ'লে রায়বোভিচ্ নিজেও চীৎকার করে উঠত আর কি! তাড়াতাড়ি সে ছুটে গেল সেই আলোর ঝলকটির দিকে—

নাচঘরে ফিরে এসেও তার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল, হাত দু'খানি এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে তাড়াতাড়ি সে লুকিয়ে রাখল পিঠের দিকে। নিদারুণ লজ্জায় ও শঙ্কায় তার অন্তরাত্মা যেন শুকিয়ে উঠল। তার মনে হ'ল একটি নারী এইমাত্রই যে তাকে আলিঙ্গন করেছে, চুম্বন করেছে—সেকথা জেনে ফেলেছে ঘরের প্রত্যেকেই। উদ্বিগ্নভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু সবাইকেই নাচে গানে আলাপে আলোচনায় মত্ত থাকতে দেখে এবারে নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে সে ভাসিয়ে দিল তার জীবনের এই প্রথম-সুখের জোয়ারে! নতুন-কিছু ঘটেছে তার জীবনে : এইমাত্রই তার গলা জড়িয়ে ধরেছে দু'খানি কোমল বাহু, যেন সে স্বপ্নমাখা! বাঁ কানের কাছটিতে—ঠিক এইখানটিতে চুমু খেয়েছে এক অচেনা রহস্যময়ী। সেখানে লেগে রয়েছে সুখ-শীতল একটুখানি অব্যক্ত অনুভূতি—পিপারমেণ্টের স্পর্শের মতো! জায়গাটি যতই ঘষছেন ততই যেন শিরশিরিয়ে উঠছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত! কী একটা অনুভূতি ক্রমেই যেন ছড়িয়ে পড়ছে শিরায় শিরায় সর্বাঙ্গে···তার ইচ্ছে হ'ল নাচে একটুখানি, আপন মনে একা একা কথা বলে, বাগানে গিয়ে প্রাণ খুলে হাসে······সে নিজে যে বেঁটে ও বিশ্রী (একবার এক মহিলা বলেছিলেন —রায়বোভিচ্ শুনে ফেলেছিলেন আড়াল থেকে), তার রং যে ছাইয়ের

মতো ফ্যাকাশে—সেকথা আর মনেই রইল না। শ্রীমতী ভন্‌ রাব্‌বেক তার পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় রায়বোভিচ্‌ পুরো দু-পাটি দাঁত বার করে তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যে ভদ্রমহিলা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, চেয়ে রইলেন অবাক হ'য়ে।

চশমাটা ঠিকমতো নাকে লাগতে লাগতে রায়বোভিচ্‌ বলল—'আপনার বাড়ীটি কিন্তু বেশ!'

শ্রীমতী রাব্‌বেক হেসে জানালেন যে বাড়ীটি ছিল তাঁর বাবার, তারপর জানতে চাইলেন রায়বোভিচ্‌ সামরিক বিভাগে রয়েছেন কতদিন, চেহারা এত শুকনো কেন ইত্যাদি ইত্যাদি···খানিকক্ষণ আলাপ করে তিনি এগিয়ে গেলেন অন্যদিকে। রায়বোভিচের মুখে কিন্তু তখনো বিকশিত হয়ে রয়েছে সেই গালভরা হাসিটি···মনে হ'ল, আজ তার চারদিকেই যেন কত দরদী সব আপন-জন···

খেতে বসে সে তার সামনের খাবারগুলি অন্যমনস্কের মতোই খেতে লাগল, চারদিকের কথাবার্তার একটি অক্ষরও তার কানে ঢুকল না। সে ব্যাপৃত রইল তার জীবনের এই ছোট্ট অভিযানটির রহস্য ভেদ করার চেষ্টায়। ঘটনাটি খুবি মধুর বটে, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। কোনো কুমারী, হয়তো বা কোনো বিবাহিতা নারীই,—সেই অন্ধকার ঘরে কোনো পুরুষের সংগে দেখা করা স্থির করেছিল ; তারপর বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করে অধৈর্য হয়ে হঠাৎ রায়বোভিচ্‌কেই তার প্রণয়ী বলে ভুল করেছে, বিশেষ করে রায়বোভিচ্‌ নিজেও তো সেই ঘরে ঢুকে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল,—সে নিজেও যেন কারো প্রতীক্ষা করছিল······এবারে সে বুঝতে পেরেছে চুম্বনের পিছনের ইতিহাসটি!

কিন্তু কে সে ?···একে একে সমবেত মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবতে লাগল : তার বয়স নিশ্চয়ই বেশী নয়, কারণ বয়সী মেয়েরা কখনো পর-পুরুষের সংগে গোপনে দেখা করতে যায় না। আর, সে নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে···তার গায়ের মিষ্টি গন্ধে, তার গলার স্বরে, তার পোশাকের খস্‌খসানিতেই তা টের পেয়েছি······

একটি নীলাম্বরী মেয়ের দিকে সে অপলক চোখে চেয়ে রইল···ভারী সুন্দর মনে হ'ল তাকে। সুঠাম কাঁধ, নিটোল বাহু, চোখাচোখা নাক-মুখ, মরালগ্রীবা! তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল এ তার সেই অচেনা সুন্দরী ছাড়া আর কেউ নয়···হ্যাঁ নিশ্চয়ই সে···কিন্তু এর

হাসিতে যে ধরা পড়ছে কেমন কৃত্রিমতার ছাপ, লম্বা নাকটা কেমনভাবে কুঁচকে উঠছে বারবার। কেমন যেন বুড়োই দেখাচ্ছে তাকে! এবারে তার নজর পড়ল গিয়ে একটি কৃষ্ণাম্বরার উপর। বয়স আরো কম, আরো সাদাসিধে···দু'গালে দুটি টোল পড়ে কেমন সুন্দর, গ্লাস থেকে চা খাবার ভঙ্গীটিও কী মনোরম! এবার রায়বোভিচের মনে হচ্ছে এটিই তার অচিনা প্রিয়া···তার মনের মানসী! কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখে পড়ল···মেয়েটির অঙ্গ-গঠন বড্ড চ্যাপ্টা ধরণের! তাই এবারে সে তার পাশের মেয়েটির দিকে মনোযোগ দিল।

'আচ্ছা, নীলাম্বরী মেয়েটির গ্রীবা ও বাহুলতা, সুন্দরী কৃষ্ণাম্বরার গালের টোলটি এবং তার সঙ্গে লবিতকোর পাশের মেয়েটির আয়ত চোখ দুটি—কেউ যদি একত্র করে দিতে পারত, তা হ'লে···'

চুম্বন-চকিতা মেয়েটির তনুলতা সে তার মনের পটে আঁকতে লাগল। আজ যদি সে পাশে থাকত! রায়বোভিচের সমস্ত মনপ্রাণ আকুল হয়ে উঠল তারি প্রতীক্ষায়।

খেয়েদেয়ে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে বিদায় নিল অতিথিবৃন্দ। ভন্ রাবুবেক ও তাঁর স্ত্রী রাতে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে আবারো ত্রুটি স্বীকার করলেন।

রাবুবেক এবারে খুব দরদের সঙ্গেই বললেন (বহির্যাত্রী অতিথিরা সমাগত অতিথিদের চেয়ে নাকি ঢের বেশী সমাদর পেয়ে থাকেন!)—'সত্যিই খুব খুশি হয়েছি, ফিরতি-পথে আবার পদার্পণ করবেন যেন। সোজাই এসে পড়বেন, আর দ্বিধা কেন?'

অফিসার দল পেরিয়ে গেল বাগানের পথ। আলোর ঝলমলানি আর লোকের গণ্ডগোল থেকে বেরিয়ে এসে বাগানটা মনে হ'ল নিঝুমে অন্ধকার। শুধু রায়বোভিচের নয়, সকলের বুকেই জেগে উঠল একটি সাধ···রাবুবেকের মতো তাদেরো কি একদিন অমন সুন্দর বাড়ী হবে, হবে বাগান, হবে অমন একটি পরিবার, হবে কি অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার মতো সৌভাগ্য!···হ'ক না কৃত্রিম ভদ্রতা-বোধ থেকেই···অতিথিদের কি পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত করতে পারবে······

সেনাবাসে ফিরে এসে রায়বোভিচ্ তাড়াতাড়ি পোশাক খুলে শুতে গেল, শুয়ে শুয়ে ধূসর ছাদটার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল—'কে সে!'

তার ঘাড়ে তখনো লেগে রয়েছে স্বপ্নের প্রলেপ, মুখে পিপারমেণ্টের স্পর্শের মতো সেই সুখশীতল অনুভূতি। মনের মধ্যে ঘুরছে ফিরছে শুধু নীলাম্বরী মেয়েটির সুঠাম কাঁধ নিটোল বাহু, আর কৃষ্ণাম্বরার গালের টোল ও সরু কোমর, সুন্দর পোশাক ও কানের মুক্তোজোড়া! এইসব কিছুই সে মনের মধ্যে এঁকে রাখতে চাইছিল চিরদিনের মতো, কিন্তু ছবিগুলি তার চোখের সামনে নাচতে নাচতে মিলিয়ে যেতে লাগল বারবার। চোখ বুঁজে থাকলে ছবিগুলি একেবারেই হারিয়ে যায় বটে, কিন্তু তখন স্পষ্ট শোনা যায় কার চকিত পদধ্বনি, শোনা যায় পোশাকের খসখসানি, চুম্বনের মৃদু আওয়াজ। পাগল-করা এক অকারণ পুলকে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার দেহ-মন—সে বসে থাকে এই সুখ-স্বপ্নের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে।

চাকরটা এসে লবিতকোকে জানিয়ে গেল 'বিয়ার' পাওয়া যাবে না। লবিতকো মহা ভাবনায় পড়ে গেল, ঘরময় পায়চারি করতে লাগল শুধুই। বলল—'মদ আর মেয়ে না জোটাচ্ছি তো কী বলেছি। এক্ষুনি বেরোচ্ছি···না পারি তো বাপের ব্যাটাই নই আমি!'

বহুক্ষণ ধরে সাজসজ্জা করে একটি সিগ্রেট ধরিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে লবিতকো বেরিয়ে পড়ল সোজা, কিন্তু হঠাৎ সিঁড়িপথে দাঁড়িয়ে পড়ল—'নাঃ, একা একা যেতে ভালো লাগছে না! রায়বোভিচ, তুমি বেরোবে একবার?'

কিন্তু তার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সে ফিরে গিয়ে ধীরে ধীরে পোশাক খুলে শুয়ে পড়ল।

রায়বোভিচ মাথার উপরে চাদরটা টেনে নিল, গুটিয়ে শুয়ে মাথার ভিতরে ভাসমান বিচ্ছিন্ন ছবিগুলিকে গ্রথিত করতে চেষ্টা করল, পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণ পরেই; ঘুমের আগে এই অনুভূতিটুকু তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল যে কেউ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, তাকে সুখী করেছে; সুন্দর সুখময় একটা কিছু এসে ধরা দিয়েছে তার ব্যথিত জীবনে,—তার বিশেষ কিছু অর্থ নাই বা থাকল! ঘুমের মধ্যেও জড়িয়ে রইল এই ভাবনাটুকু।

যখন সে জাগল তার কাঁধের সেই সুখস্পর্শটুকু আর নেই, তবু আগের দিনের মতোই একটি অভূতপূর্ব আমেজে ভরে আছে তার সারাটা বুক। ভোরের আলোয় রঙীন জানলার দিকে চেয়ে রইল সে, মুগ্ধের মতো কান

পেতে শুনতে লাগল বাইরের পথের কলরোল……

আধঘণ্টার মধ্যেই আবার রওনা হ'ল সেনাদল। ভন র‍্যাবুবেকের বাড়ী পেরিয়ে যেতে যেতে রায়বোভিচ্ সেইদিকে চেয়ে রইল। জানলার খড়খড়ি বন্ধ, ভিতরে সবাই এখানো ঘুমিয়ে রয়েছে নিশ্চয়ই। যে তাকে কাল রাতে চুমু খেয়েছে সে—সেও ঘুমুচ্ছে : মনের পটে আঁকতে লাগল তার ঘুমন্ত ছবি : শোবার ঘরের জানলাটা আগাগোড়াই খোলা, ভিতরে উঁকি মারছে একটা গাছের সবুজ একটি ডাল। ভোরের মিঠে হাওয়া-বইছে, হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে পপ্‌লার লাইলাক ও গোলাপের গন্ধ। বিছানা রয়েছে পাতা, চেয়ারের উপরে ফেলে রেখেছে সে গত রাতের সেই পোশাকটি : টেবিলের উপরে হাতঘড়ি, নিচে একজোড়া স্যাণ্ডাল। সবকিছুই তার চোখের উপরে ভেসে উঠল নিখুঁত ছবির মতো। কিন্তু এসব নয়—সে দেখতে চাইছিল শুধু তার অঙ্গ-গঠনটি, তার সেই স্বপ্নমধুর হাসিটি। কিন্তু কিছুতেই তো মনের পটে তা ফুটে উঠছে না, পাশ দিয়ে যেন পিছলে যাচ্ছিল বারবার—হাতের মুঠোয় পারার মতো! কিছুদূর এগিয়ে আসতে রায়বোভিচ্ পেছনে ফিরে তাকাল। রোদে নেয়ে উঠেছে হলুদ রঙের গির্জাটি, সেই বাড়ীটি, সেই নদী আর বন। নদীর দুইতীরে সবুজের সমারোহ, আর নদীর বুকে কোথাও পড়েছে ছায়া, কোথাও ঝলমল করছে রোদ। কী সুন্দর! রায়বোভিচ্ আবার ফিরে তাকাল সেই গাঁয়ের দিকে। তাকে ছেয়ে ফেলল কেমন একটা ব্যথার ছায়া—যেন সে তার জীবনের প্রিয়তম যা-কিছু অতি-আপনার যা-কিছু পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে দূরে!

সারাপথে সেই অতি-পরিচিত সঙ্গীদের মুখদেখা আর ভালো লাগে না। ডানদিকে নবীন সর্ষে ক্ষেত, বাঁ দিকে গম। সামনে উড়ছে ধুলো, আর তারি মধ্যে দেখা যাচ্ছে শুধু মানুষের সারি, পেছনেও সেই ধুলো আর মানুষের সারি। সামনের মাথার সারি আর পেছনের মুখগুলির দিকে রায়বোভিচ্ তাকাচ্ছিল উদাসভাবে। অন্যদিন হলে ইতিমধ্যে সে হয়ত দু'চোখ বুঁজে ঝিমোতে শুরু করে দিত, কিন্তু আজ সে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে তার নতুন সুখ-স্বপ্নের স্রোতে। যাত্রাকালে সে নিজেকে বুঝিয়ে রেখেছিল যে চুমোর ব্যাপারটা ছোটখাট একটা মজার ব্যাপার, ও নিয়ে বেশী ভাববার কি আছে? কিন্তু কিছুপরেই সেই ধারণাটা রেখে নিজেকে আবার ভাসিয়ে দিল গোপন স্বপ্ন-স্রোতে…তার মনে হ'ল সে

যেন রায়বেকের বৈঠকখানায়ই রয়েছে—কখনো সেই নীলাম্বরার পাশে, কখনো কৃষ্ণাম্বরার! চোখ বুঁজে মনে হ'ল ঃ আলোছায়ায় রহস্যময়ী সে এক অচেনা নারীর পাশেই রয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলছে, তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরছে বুকে। তারপর একদিন—তাকে ফেলে চলে গেল যুদ্ধে, তারপর ফিরে এসে নিজের স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে শুরু করল আরাম করে খাওয়া-দাওয়া!

পথের মাঝে মাঝে পাহাড়, প্রত্যেকটি পাহাড়ে উঠবার আগেই শোনা যাচ্ছিল সেনাপতির আদেশ—'হুঁশিয়ার!' আর প্রতিবারেই রায়বোভিচের ভয় হচ্ছিল তার স্বপ্নজাল ছিঁড়ে গেল বুঝি, কঠিন বাস্তব ভূমিতে সে হুঁচোট খেয়ে পড়ল বুঝি!

সেনাদল যাচ্ছিল প্রকাণ্ড একটি পল্লীভবনের পাশ দিয়ে। রায়বোভিচ বাগানের দিকে তাকাল। সম্মুখে প্রসারিত কাঁকর-ছড়ানো বীথিপথ, দু'পাশে নবীন বার্চগাছের সারি। কবির মতোই সে মনের পটে আঁকতে লাগল একটি মনোরম ছবি ঃ সুন্দর দুটি ছোট্ট পা ফেলে ফেলে একটি মেয়ে হেঁটে চলেছে সেই পথটি ধ'রে। আর হঠাৎ কেন যেন সেই-রাতের চুম্বন-চকিতা নারীটিই এসে দাঁড়াল তার সামনে। অথচ আশ্চর্য, গতরাতে শত চেষ্টা করেও কিন্তু তাকে মনে আঁকতে পারছিল না। এবারে সেই নারী-মূর্তিটি ধীরে ধীরে তার বুকের মধ্যে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করল, এবং এই রূপ কোনোদিনই আর মুছে গেল না।

দুপুর বেলা পেছন থেকে শোনা গেল সুউচ্চ আদেশ ঃ অফিসারদের ডানদিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। রায়বোভিচের সামনে এসে সেনাপতি মন্তব্য করলেন—'পোশাকটা একটু সামলে নিন!' তারপর সেনাপতি এগিয়ে গেলেন আরো সামনে।

'ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয়েছে স্বপ্নাতীত, একান্ত বিস্ময়কর, কিন্তু আসলে তো সে একটা সাধারণ ঘটনামাত্র!' রায়বোভিচ সেনাপতির গাড়ীর পিছনে ধাবন্ত উৎক্ষিপ্ত ধূলি-মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল—'এ তো সাধারণ একটা ব্যাপার, সকলের জীবনেই ঘটে থাকে এমন···আমাদের এই সেনাপতির কথাই ধরি না, তিনিও নিশ্চয়ই প্রেমের পড়েছিলেন, তারপরে বিয়ে হয়েছে, ছেলেপিলে হয়েছে। ক্যাপ্টেনেরো বিয়ে হয়েছে, বৌয়ের ভালোবাসা পেয়েছে—যদিও তার ঘাড়টা একটা ষাঁড়ের মতো এবং কোমর বলতে কোনো অঙ্গই নেই! তারপর

মাল্‌মানভ্‌—কাঠখোট্টা লোক, ঠিক যেন একটা গণ্ডা। তারোও বিয়ে হয়েছে প্রেম ক'রেই! তা, আমিও তো আর দশজনের মতো, দু'দিন বা দশদিন বাদে আমারও হবে!'

সেও যে আর দশজনের মতো, তার জীবনও যে সাধারণ জীবন থেকে ব্যতিক্রম নয়—এই চেতনা তার বুকে জাগিয়ে তুলল সাহস ও আনন্দ। এবারে সে কল্পনার রাশ একেবারেই ছেড়ে দিল, ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের ছবি এঁকে নিল মনের মতো ক'রে।

গন্তব্যস্থলে পেঁাছে অফিসার দল তাঁবুতে বিশ্রাম করতে লাগল। দিনভর দিবাস্বপ্নের মৌতাতে মেতে রায়বোভিচের মাথা ঘুরছিল,—নীরবেই সে সুরাপান করছিল। কিন্তু তিন নম্বর গ্লাসের পরেই জমে উঠল রায়বোভিচের নেশা, স্নায়ুর বাঁধন আলগা হয়ে এল, সঙ্গীদের কাছে তার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলবার জন্যে অধীর হয়ে উঠল অদম্য আগ্রহে।

'জানলেন, সেই রাবুবেকদের ওখনে ভারী মজার একটা ব্যাপার ঘটেছিল!'

—কেমন নিস্পৃহ স্বরেই বলে যায় রায়বোভিচ্‌—'গেলাম বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে, তারপর—' চুম্বন-দানের ইতিহাসটি সে সবিস্তারেই বর্ণনা করে গেল। কিন্তু এ কি, এত কম সময় লাগল! এক মিনিটও নয়? সত্যিই অবাক হ'ল সে। ভেবেছিল, চুম্বন-দানের গল্পটি বলতে বলতে রাত ভোর হয়ে যাবে! লবিত্‌কো নিজে ছিল ঝানু মিথ্যেবাদী, কারো কথাই সে বিশ্বাস করত না; রায়বোভিচের দিকে তাকিয়ে সে তাই অবিশ্বাসের হাসি হাসল। অন্য এক অফিসার-বন্ধু ভুরু দুটো কুঁচকে রেখে বই থেকে মাথা না তুলেই বলল—'আশ্চর্য ঘটনা বটে! বলা নেই কওয়া নেই—একলাফে একটা লোকের ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া! মেয়েটা নিশ্চয়ই মাথা-পাগলা, অন্তত আমার তো তাই মনে হয়!'

'হ্যাঁ, সত্যিই মাথা-পাগলা!'—রায়বোভিচ্‌ও সায় দেয়।

'একবার কিন্তু আমারো ঠিক এমনটা হয়েছিল।'—লবিত্‌কো শুরু করে দেয়—'গতবার যাচ্ছিলাম কভ্‌নায়, সেকেণ্ড ক্লাশে। গাড়ী তো লোকে লোকারণ্য, ঘুমানো দায়। একটা টাকা দিলাম গুঁজে গার্ডের হাতে, সে আমাকে নিয়ে এল ঘুমুবার কামরাতে, জিনিষপত্রও নিয়ে এল। সটান শুয়ে পড়ে চাদরে গা ঢেকে নিলাম···চারদিক অন্ধকার,

হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন আমার গা স্পর্শ করল, আমার মুখের উপর' পড়ল তার নিশ্বাস। হাত বাড়িয়ে দিলাম, হাতে লাগল আর একটি হাতের স্পর্শ······চোখ মেলে দেখি কি,—হয়ত বিশ্বাস হবে না আপনাদের—আমার ঠিক বুকের কাছেই একটি মেয়ে! কালো দুটি চোখ, ডালিমফুলের মতো রাঙা ঠোঁট, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে লালসার নিশ্বাস, বুকটা ঠিক বালিশের মতো······'

'বুকের ব্যাপারটা নয় বুঝলাম,'—এক বন্ধু আস্তে আস্তে ফোড়ন কাটে—'কিন্তু কথাটা হচ্ছে অন্ধকারে লাল ঠোঁট দেখলে কি ক'রে?'

লবিত্‌কো প্রথমটা বিব্রত বোধ করে, তারপর উপহাস করতে থাকে বন্ধুবরের কল্পনা-শক্তির অভাব দেখে। রায়বোভিচের কেমন আহত মনে হতে লাগল। ও-জায়গা থেকে সরে এল সে, প্রতিজ্ঞা করল—কোনোদিন কারো সংগে আর গায়ে পড়ে আলাপ করতে যাবে না।

আবার শুরু হ'ল তাঁবুর জীবন। গড়িয়ে চলল দিনের পর দিন। প্রত্যেক দিনই একিরকম একঘেয়ে। রায়বোভিচের দশাটা হ'ল প্রেম-পাগলের মতো, তার ভাবনা-চিন্তা আচার-ব্যবহারও হয়ে উঠল তেমনি। রোজ ভোরে চাকরটা জল দিয়ে গেলে তাই সে মাথায় ঢালতে ঢালতে ভাবে—তার জীবনে আবির্ভাব ঘটেছে মহান ও মধুর কিছুর।

সঙ্গীরা নারী বা প্রেম-ঘটিত কোনো কথা বললে আজকাল সে কান পেতে শোনে, শুনতে শুনতে আরো ঘনিয়ে বসে। তার মুখ দেখে মনে হয়, যেন এমন গল্প বলা হচ্ছে যার মধ্যে সে নিজেই অংশ গ্রহণ করেছিল। রোজ সন্ধ্যেবেলায় লবিত্‌কো দলবল সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ের দিকে চলে যেত 'মধুর অভিসারে'; রায়বোভিচ্‌ও সঙ্গ নিত বটে,—তবে যেতে যেতে সে যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ত, নিজেকে যেন ভৎর্সনা করতে থাকত, মনে মনে ক্ষমা চাইত সেই 'তার' কাছে···বিশ্রাম-কালে বা বিনিদ্র রজনীতে যখনি আকুল আগ্রহে ভাবতে ইচ্ছে করত শৈশবের কথা, বাবা-মার কথা, তার প্রিয় সবকিছু—একে একে বুকের মধ্যে ছবির মতো জেগে উঠত সেই মেশ্‌তেচ্‌কো গ্রাম: সেই অদ্ভুত ঘোড়াটি, সেই রাবুবেক, তাঁর স্ত্রী—দেখতে যিনি মহারাণীর মতো। তারপর, সেই অন্ধকার ঘর, দোরের ফাঁকে সেই আলোর ইশারা···

৩১ শে আগস্ট দুটো কামান-বাহিনী সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে তাঁবু থেকে। সারাটা দিন সে যেন অধীরভাবে কাটাতে লাগল একটা

মধুর উৎসাহে—যেন সে ফিরে যাচ্ছে গাঁয়ে তারি জন্মভূমিতেই। সেই অদ্ভুত ঘোড়াটি, সেই গির্জা, রাবুবেক পরিবারের কৃত্রিম ভদ্রতা, সেই অন্ধকার ঘর—সেই সবকিছু আবার দেখবার জন্যে আকুল হয়ে উঠল তার মনপ্রাণ। প্রেমিকের বুকের ভিতরটা ভরে ওঠে যেমন নতুন আশার মধু-গুঞ্জনে, রায়বোভিচের সারাটা মনও তেমনি বলছিল—আবারো দেখতে পাব তাকে। বিহ্বল হয়ে সে শুধু ভাবতে লাগল—মেয়েটিকে কেমন করে সেদিন অভ্যর্থনা জানাব,—তাকে কী বলব? সেই চুম্বনের কথা কি সে ভুলে গেছে? কিন্তু ব্যাপারটা যদি অন্যরকম হয়? তাকে যদি দেখতেই না পাই তো সেই অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে একটিবার আবার সব অনুভব করে আসব······

সন্ধ্যের দিকে দিগন্তে দেখা দিল পরিচিত গির্জাটি, শাদারঙের সেই বাড়ীগুলি। রায়বোভিচের বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল, পেছনের অফিসারটি কি বলছিল কানেই এল না। সবকিছুই ভুলে গেছে সে, তৃষিত নয়নে চেয়ে আছে শুধু সুদূরের ঝলমল নদীটির দিকে, বাড়ীগুলির ছাদের দিকে, চিলে-কোঠার মাথায় পাখীর বাক্সটার দিকে, তার চারদিকে চক্কর দিয়ে উড়তে-থাকা অস্ত-রঙীন পায়রার ঝাঁকের দিকে!

গির্জাভূমিতে এসে পৌঁছল সবাই। রায়বোভিচ্ প্রতীক্ষা করছিল—এই বুঝি কেউ সেই ঘোড়াটিতে চড়ে রাবুবেকের বাড়ীতে চা-খাওয়ার নেমন্তন্ন করতে এল! রিপোর্ট পাঠ শেষ হ'ল, অফিসার দল তাড়াতাড়ি ফিরে চলল গাঁয়ের দিয়ে,—তবু সেই ঘোড়সওয়ার এল না তো······

হোক না, রাবুবেক নিশ্চয়ই গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে শিগগির খবর পাবে যে আমরা এখানেই রয়েছি—তখন লোক পাঠাবে।

ঘরে ফিরে এসে রায়বোভিচ্ ভাবছিল ব'সে। সে যেন বুঝতেই পারছিল না সঙ্গীরা আলো জ্বালিয়েছে কেন, চাকর-খানসামারাই বা কেন রান্নার আয়োজন করছে!

সে কেমন মনমরা হয়ে উঠল। শুয়ে পড়ল, উঠে বসল, জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল—ঘোড়সওয়ার আসছে কিনা। না, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। আবার শুয়ে পড়ল, কিন্তু এমনি-ধারা উদ্বিগ্নতার মধ্যে থাকতে না পেরে কিছুক্ষণ বাদে সে রাস্তায় এসে রওনা হ'ল গির্জার দিকেই।

লাল হয়ে উঠেছে নদীপারের আকাশ। চাঁদ উঠল। দু'জন মেয়েলোক

কথা বলতে বলতে শাকসবজি তুলছিল বাগানে। পেছনেই কয়েকটি কুটির... এদিকটায় বসন্ত যেন সবে পা বাড়িয়েছে বনপথের ঝোপেঝাড়ে আর অবনত উইলোর শাখায় শাখায়! কিন্তু আজ নেই শুধু নাইটিঙ্গেলের গান, আর নেই পপলারের ও নবীন ঘাসের গন্ধ!

রায়বোভিচ বাগানের দিকে এসে তাকায় ফটকের ভিতর দিয়ে। চারদিক অন্ধকার, নিঃঝুম নীরব। অন্ধকার পটে দেখা যায় শুধু বার্চশ্রেণীর শাদা গুঁড়িগুলি, দেখা যায় বীথিপথের একটা দিক, আর সবি হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। রায়বোভিচ কান খাড়া করে রইল, তার দৃষ্টি চলে গেল অন্ধকার চিরে। কিন্তু আধ ঘণ্টাকাল প্রতীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পরেও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে বা কোনো আলো দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে দাঁড়াল নদীর পাড়ে সামনেই। অন্ধকারে ঝলমল করছে রাবুবেকদের স্নান-ঘর। রায়বোভিচ চেয়ে রইল নদীর জলের দিকে, তারপর কেন যেন স্নান-ঘরটা ছুঁয়ে দিল একটুখানি। নদী বয়ে চলেছে দ্রুতবেগে, স্নানঘরের খুঁটিতে ঘা খেয়ে স্রোতের বুকে উঠছে কলকল ধ্বনি। মস্ত বড় লাল চাঁদটার ছায়া পড়েছে নদীর বাঁ-কূলে। ছোট ছোট ঢেউ দল বেঁধে ছুটে আসছে তার উপর,—আর ছায়াটি অমনি ছড়িয়ে পড়ছে, টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে ভেঙে ভেঙে! ঢেউয়েরা যেন তাদের বয়ে নিয়ে যেতেই এসেছে...এক-একটি ক'রে...

এসবের কোনো অর্থ হয় না, কোনোই অর্থ হয় না!—রায়বোভিচ ধাবন্ত জলস্রোতের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল।

এখন সে আর কোনো কিছুরি প্রত্যাশা করে না। চুম্বনের ব্যাপারে তার সেই অধীর আকুলতা সেই অস্পষ্ট আশা সেই মোহ—সবকিছুই এখন তার কাছে দেখা দিল সত্যমূর্তিতে। রাবুবেকের কাছ থেকে কোনো লোক যে ঘোড়ায় চেপে আসেনি এবং যে-মেয়েটি ভুলে তাকে চুমো খেয়েছে তার সঙ্গে জীবনেও আর যে দেখা হবে না...সেটা তো সম্পূর্ণই স্বাভাবিক, বরং তার সঙ্গে দেখা হ'লে সেটাই হ'ত আশ্চর্য কিছু......

পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে নদীস্রোত...কোথায় কে জানে! গত বসন্তকালেও বয়ে চলেছিল একটানা। ক্ষীণ জলধারা গিয়ে মিশেছে চওড়া নদীর বুকে...তারপর সাগরে; সাগর থেকে বাষ্প হয়ে উঠছে আকাশে, তারপর নিচে নেমে আসছে অজস্র বৃষ্টিধারায়। এখন, এই যে স্রোত

বয়ে চলেছে এটাই হয়ত গত বসন্তে দেখা সেই একই জলধারা কেন, কী এর লক্ষ্য ?

রায়বোভিচের কাছে সারা দুনিয়াটা সারাটা জীবনই মনে হ'ল একটা কঠিন পরিহাস, অর্থহীন একটা ব্যঙ্গ-বিশেষ। নদীর দিক থেকে চোখ তুলে তাকাল সে আকাশের দিকে। আবার মনে পড়ল, তার ভাগ্যদেবী কি করে একদিন তাকে আদর করেছিল নারী বেশে দেখা দিয়ে। মনে পড়ল তার স্বপ্নের কথা, সেই বসন্তদিনের ছবির কথা···আর নিজের জীবনটা মনে হ'ল একান্তই দীন ও অসহায়, নিঃসঙ্গ···একঘেয়ে···

সেনাবাসে ফিরে এসে সে দেখল সঙ্গীরা সবাই অনুপস্থিত। চাকরটা জানাল—অফিসার-বাবুরা গেছেন সেনাপতি ফ্রন্তাব্রকিনের বাড়ীতে··· ক্ষণেকের জন্যে রায়বোভিচের প্রাণ ভরে উঠল পরম খুশিতে, কিন্তু সংগে সংগেই সামলে নিল; নিমন্ত্রণ বাড়ী না গিয়ে শুয়ে পড়ল তখনি। ঠিক এমনি করেই যেন সে তার দুর্ভাগ্যকে উপেক্ষা করবে······

হতভাগ্য প্রেমিক

প্রভাঁসের প্রান্তে বাস করত এক ভদ্র যুবক। তার শিক্ষা-দীক্ষা ও স্বভাব-চরিত্র ছিল অনিন্দ্য-সুন্দর, কিন্তু সেই অনুপাতে ধন-সম্পত্তি ছিল না। একবার একটি মেয়েকে সে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলল। মেয়েটির নাম বলব না, কারণ নামজাদা এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের আত্মীয়া সে। তা, আপনারা ঘটনার যাথার্থ্যে সম্পূর্ণই বিশ্বাস রাখতে পারেন।

মেয়েটির মতো উঁচুবংশের লোক নয় বলে ছেলেটি তার নির্মল ভালোবাসা বাইরে প্রকাশ করতে সাহস পেল না। কোনোদিনই সে তাকে বিয়ে করতে পারবে না—এই হতাশায় তার সমস্ত মনপ্রাণ ছেয়ে গেল। কিন্তু প্রিয়ার সম্মানে কোনোরকম আঘাত দেওয়ার চেয়ে বরং আপন দুঃখে মরে যাবে—তাও সে ভালো মনে করে। তাকে তো সে ভালোবেসেছে প্রাণের টানেই, ভালোবেসেছে যেহেতু ভালোবাসার মতোই নারী সে। তার দীর্ঘদিনের এই আকুল প্রতীক্ষার কথা শেষপর্যন্ত জানতে পেল মেয়েটি। ব্যাকুল ভালোবাসা নির্মল প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত দেখে, এবং এমন একটি সুন্দর ও সৎ ছেলের ভালোবাসা পেয়ে নিজেকে সে ভাগ্যবতী মনে করতে লাগল, তাই তার সঙ্গে সে এমন মিষ্টি ব্যবহার করতে লাগল যে ছেলেটি আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠল। এর চেয়ে বেশীকিছু সে আশাও করেনি।

কিন্তু ঈর্ষা হ'ল সবার শত্রু! নির্মল দুটি প্রাণের এমন শুভ্র-সুন্দর সম্পর্ক লোকে কিছুতেই আর সহ্য করে থাকতে পারল না। কে এক দুষ্টলোক এসে মেয়েটির মাকে বলল, তাঁদের বাড়ীতে এই যুবকটির এত ঘন ঘন যাতায়াতে সে খুবি বিস্মিত হয়েছে—এবং সবারি নজর পড়েছে সেই দিকে। সবাই বলছে, এতটা মাখামাখি মেয়েটির রূপের মোহেই! আর তা ছাড়া, দুজনকে নাকি অনেক সময়েই একসাথে দেখেছে তারা। মেয়ের মা এই ভদ্রছেলেটির সততায় বিশ্বাস করতেন গভীরভাবেই, কিন্তু এই দেখাশোনার একটা কদর্য অর্থ হয়েছে দেখে তিনি একটু চিন্তিতই হয়ে পড়লেন, এবং শেষ পর্যন্ত কুৎসা বা ঈর্ষা-প্রণোদিত কুসমালোচনার ভয়ে ভদ্রছেলেটিকে তিনি অনুরোধ করলেন—কিছুদিনের জন্যে সে যেন

এ বাড়ীতে না আসে। ভদ্র যুবকটি খুবি মর্মাহত হ'ল। কারণ, মেয়েটির সঙ্গে যেরকম সংযত ও সম্মানজনক ব্যবহার সে করে এসেছে তাতে অন্যরকম প্রতিদান পাওয়াই সমীচীন ছিল। যা হ'ক, এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত কাহিনী আর যাতে না রটে তাই সে সরে দাঁড়াল দূরে, একে একে বন্ধ হয়ে গেল দেখাশোনা। এই ব্যবধানে কিন্তু মোটেই নিভে গেল না তার বুকের ভালোবাসা। একদিন মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে সে কাদের কথাবার্তা শুনতে পেল। মেয়েটির নাকি বিয়ে হওয়ার কথা চলছে এবং সেই পাত্রও তার চেয়ে ধনী বা উঁচুবংশের নয়। তাই সেই পাত্রের দাবী সে কোনোরকমেই অগ্রগণ্য মনে করল না। আবার আশায় বুক বাঁধল সে, বন্ধুদের সে নিযুক্ত করল তার পক্ষে কথা বলবার জন্যে। মনে আশা, মেয়েটি নিজে বর নির্বাচন করলে নিশ্চয়ই অন্যের চেয়ে তাকেই প্রাধান্য দেবে। কিন্তু সত্যিসত্যিই দ্বিতীয় প্রার্থীটি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী ধনী, তাই মেয়ের মা এবং তার আত্মীয়স্বজন পছন্দ করলেন তাকেই।

যুবকটি বুঝল—এই ব্যবস্থা শুধু তার নয়, তার প্রিয়ার পক্ষেও দুর্ভাগ্যের এবং দুঃখের! প্রত্যাখ্যানে মর্মাহত হয়ে দিন দিন সে ক্ষয়ে যেতে লাগল, শেষে মনে হ'ল যেন মৃত্যুর কালো ছায়াই নেমে এসেছে তার মুখে,—তবু হাসিমুখেই ক্রমশ সে এগিয়ে চলল নিশ্চিত মরণের মুখে। তবু তার বুকের মানিককে না দেখে কিছুতেই সে সুস্থ থাকতে পারল না। শেষে তার সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে এলে সে গ্রহণ করল মৃত্যুশয্যা, তবু তো তার প্রিয়াকে এই সংবাদ জানাতে সে কিছুতেই রাজী নয়। মেয়েটি তা হ'লে অযথা ব্যথা পাবে।...গভীর হতাশায় কিছুই আর সে মুখে তোলে না, চোখে ঘুম নেই—দিনরাতই সে তার প্রিয়ার চিন্তায় বিভোর। সে এতটা শীর্ণ ও মলিন হয়ে পড়ল যে তাকে এখন আর চেনাই যায় না!

তার এই করুণ অবস্থার কথা কে যেন মেয়েটির মাকে জানাল। মহিলাটি ছিলেন সহৃদয় মানুষ, তা ছাড়া ভদ্রযুবকটির উপরে তাঁর এতটা শ্রদ্ধা ছিল যে তার আত্মীয়েরা সম্মত হ'লে এই রুগ্ন ছেলেটিই পাত্র হিসেবে এখনো বরণীয় হ'ত—অন্যের ধনৈশ্বর্যের চেয়ে বড় বলে শ্রদ্ধা পেত তার অপূর্ব গুণরাশি! কিন্তু আত্মীয়েরা তা মানতে রাজী নয়।

যা হ'ক, মা এবারে তার মেয়েকে নিয়ে হতভাগ্য যুবকটিকে দেখতে

এলেন। রোগীর দেহে প্রাণের সাড়া নেই যেন। মৃত্যু এগিয়ে এসেছে তার সামনে—ঠিকই জানে সে! তাই কারো সাথেই দেখা করতে সে নারাজ—একথা সবাইকেই জানিয়ে রেখেছে। কিন্তু যে তার জীবন—আর মরণও—তাকেই আবার কাছে পেয়ে সে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। বিছানার ওপরে উঠে বসে বলল সে—'আপনারা আর এখানে এসেছেন কেন? যে পা বাড়িয়েছে কবরের দিকে, আর যার মৃত্যুর কারণও আপনারই—তাকে—তাকে কেন আর দেখতে এলেন?'

'সেকি! আমরা যাকে এত ভালোবাসি, তার মৃত্যুর কারণ হব আমরাই—এ কি সম্ভব? বলো, তোমাকে অনুরোধ করছি—কেন এমন করে কথা বলছ তুমি!'

'দেখুন, যতদিন পেরেছি বুকেই চাপা রেখেছি আমার এ দুঃসহ ব্যথা। আত্মীয়েরা আমার জন্যে আপনার মেয়েকে প্রার্থনা করেছে, তারা আমার কথার চেয়ে বরং বেশী করেই বলেছে। আজ আমার দুর্ভাগ্য আমি মর্মে মর্মে সহ্য করছি। দুর্ভাগ্য বলছি আমার ব্যক্তিগত সুখের জন্যে নয়,—আমি জানি যে আমার মতো এমন প্রাণভরে আর কেউই তাকে ভালোবাসতে পারবে না! এমন মিষ্টি ব্যবহার আর কারো কাছ থেকে পাবে না সে। এই দুনিয়ায় তার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুকে—তার সবচেয়ে অনুগত সেবককে সে যে চিরদিনের মতো হারাল—তাই আমাকে বারবার করে আমার মৃত্যুর চেয়েও বেশী দুঃখ দিচ্ছে। আমার প্রাণ, তাও একমাত্র তারি জন্যে আমি সযত্নে রক্ষা করে এসেছিলাম। আর, আজ তা কোনো কাজেই আর লাগল না, তাই সে প্রাণ এখন চলে গেলেই ভালো।'

মা ও মেয়ে দুজনেই তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। 'এমন ভেঙে পড়ো না।'—মা বলছিলেন—'বেঁচে ওঠো, আমার মেয়ে তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই স্বামী বলে বরণ করবে না। এই পাশেই তো রয়েছে সে, আমিও তাকে প্রতিজ্ঞা করতে বলছি।'

মেয়েটি উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কথায়ই সায় দিল। কিন্তু ছেলেটি বুঝল, ভগবান তাকে সারিয়ে তুললেও তার প্রিয়াকে পাবে না সে কোনোদিনই,—তাকে শুধু সান্ত্বনা দিয়ে খুশি করার জন্যেই এই সব আশার কথা বলা হচ্ছে।

'তিন মাস আগেও যদি আপনারা এমনভাবে কথা বলতেন, তবে

এই সমস্ত ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে সুস্থ ও সবচেয়ে সুখী মানুষ হতাম আমিই। কিন্তু আপনাদের এই আশার বাণী এত দেরীতেই এল যে আজ তা বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না, বা এই আশাতে ভর করেও থাকতে পারছি না।'

তখন তারা এই অবিশ্বাস ভেঙে দেবার চেষ্টায় কথা বলতে লাগল।

'যে সুখ আপনারা দিতে চাইলেও আমার ভাগ্যে আর ফলবে না,—তাই যখন আমাকে দিতে রাজী হচ্ছেন, তখন ওর তুলনায় অনেক ছোট একটি কামনা আছে আমার। সে কথা বলতে আগে কোনোদিনই সাহস পাইনি।'

মেয়ে ও মা দুজনেই প্রতিজ্ঞা করল, তার প্রার্থনা সাগ্রহে পূরণ করবেন তাঁরা, তার মনের কথা খুলেই বলতে পারে সে।

'আমার একটিমাত্র সাধ,—যে আমার স্ত্রী হবে বলে কথা দিচ্ছেন তাকেই এখন আমার দুই বাহুর মাঝে এনে দিন ; আমাকে সে আলিঙ্গন করে জড়িয়ে ধরবে, আমাকে চুমো খাবে সে। আপনি ওকে অনুমতি দিন।'

মেয়েটি অবিশ্যি এমনভাবে আলিঙ্গন করতে অভ্যস্ত নয়। সে আপত্তিই তুলতে যাচ্ছিল ; কিন্তু তার মা তাকে যুবকটির অন্তিম অনুরোধটি রাখতে বললেন। কারণ, তিনি দেখলেন ছেলেটির মধ্যে জীবন্ত মানুষের আবেগ বা শক্তি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, সে যে মুমূর্ষু! মা'র আদেশ পেয়ে মেয়েটি আর দ্বিধা করল না, বিছানার পাশে এসে বসল—

'তুমি ভালো হয়ে ওঠো বন্ধু, আমি বলছি তুমি ভালো হয়ে উঠবে।'

মুমূর্ষু এই হতভাগ্য যুবকটি তার দুর্বল শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে দিল এবং গভীর আবেগে তাকে আলিঙ্গন করে ধরল। যার জন্যে সে মরতে বসেছে তাকেই সারা বুকে জড়িয়ে ধরল,—নিজের হিমেল ঠোঁট দুটি তার ঠোঁটের উপর রেখে বিভোর হয়ে রইল।

'তোমাকে আমি ভালোবেসেছি।'—সে আবার বলতে লাগল—'সে ভালোবাসা এত নিবিড়, এত গভীর, এত পবিত্র যে তোমাকে পরিণয়-সূত্রে পাওয়ার কথা বাদ দিলে, এর চেয়ে বেশী কিছু কখনোই আমি আশা করিনি। কিন্তু ভগবান যখন আমাদের মিলিত হতে দিলেন না, আজ আমাকে তুলে দিচ্ছ তাঁর হাতেই যিনি প্রেমময়, যিনি করুণার প্রতিমা—তাঁর হাতেই। আর সেই অন্তর্যামীই জানেন, তোমাকে আমি কত ভালোবেসেছি, কত পবিত্র আমার প্রাণের কামনা! আজ বুকে-

ফিরে পেয়েছি আমার সেই কামনার ধনকে, আমার বুকের মানিককে, তাই আমার প্রাণও আনন্দদোলায় পেঁছিবে গিয়ে তাঁরি কাছে!'—এই বলেই আবার সে তাকে প্রাণপণ আ বেগে এমন নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল যে, তার দুর্বল ক্ষীণ-প্রাণ সেই কঠিন চেষ্টার বেগ সহ্য করতে না পেরে চলে গেল তার দেহ ছেড়ে! জীবনের এই পরম নিবিড় আনন্দে টলে উঠল প্রাণের আসন, তার আত্মাও মিলিত হ'ল গিয়ে আনন্দময় ভগবানের সাথে।

হতভাগ্য যুবকটি মরে গেল, শিথিল হয়ে পড়ল তার বাহুর বাঁধন। কিন্তু এদিকে—মেয়েটির এতদিনের বুকচাপা ভালোবাসা বুক ভেঙে বেরিয়ে এল এমন অজস্র কান্নায়, এমন করুণ শোকোচ্ছ্বাসে যে মৃতপ্রায় প্রণয়িনী মেয়েটিকেই তার প্রণয়ীর নিষ্প্রাণ বুক থেকে ছাড়িয়ে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল।

হতভাগ্য যুবকটিকে সসম্মানে কবর দেওয়া হ'ল। সেই শোকযাত্রায় অভাগিনী মেয়েটির অবাধ অশ্রু ও অসহ কান্নার দৃশ্যটিই হয়েছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক! তার জীবিতকালে নিজের ভালোবাসা যেমন সে আড়ালে চাপা রেখেছিল, আজ তেমনি বাঁধ-ভাঙা আবেগে বেরিয়ে পড়ল সবার সামনেই। তার প্রেমিকটি যে অন্যায় সহ্য করে গেছে, যে দুঃখ পেয়ে গেছে একান্ত প্রিয়জনের হাতে—আজ সে যেন তার সমস্ত প্রতিশোধ নিচ্ছে নিজেরি উপরে।

সান্ত্বনা দেবার জন্যে আত্মীয়েরা এর পরে তাকে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে দিলেন, কিন্তু সারা জীবনেও কোনোদিন সে আর সুখের মুখ দেখেনি।

কুমারীর স্বামী

॥ ১ ॥

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আমাকে আর বেশীদিন বেঁচে থাকতে হবে ব'লে মনে হয় না। আমার দশাটা হয়েছে আইবুড়ো মেয়ের মতো··· কালস্রোতের মুখে বসে আছি হাল ছেড়ে দিয়ে। তবু একদিন···তা যে কারণেই হ'ক···যথেষ্ট বয়েস হ'লেও আমার এই নিঃসংগ নিরালা জীবনে সুখেই তো ছিলাম। কিন্তু আজ সে সুখও ভেঙে গেছে···কোনো-দিন বুঝি ছিলও না! সে যেন একটা বিরাট ভুল! তাই দেখি, আজ আমার বলতে রয়েছে শুধু 'বুলি' কুকুরটা, হারমোনিয়ামটা, আর আমার অনন্ত পথযাত্রার আয়োজন। আমি যদি প্রেমে-পড়া তরুণী হতাম তো সুন্দর একটি চামড়া-বাঁধানো খাতায় মনের গোপন ব্যথার কথা লিখে লিখে রাখতাম। কিন্তু এখন এই চল্লিশ বছর বয়সে তো আর সে-সব নতুন অভ্যাস চালু করা সম্ভব নয়।

চৌদ্দ থেকে চল্লিশ···এবং গতকাল এই দুপুর আড়াইটা অবধি··· ভালোবেসেছি, ভালোবাসা পেয়েছি! দুনিয়ার কোনো সুন্দরী প্রণয়িণীও কি এতটা পেয়েছে বলে গর্ব করতে পারে? আর, একটি দিনের জন্যেও আমার জীবনে মনোমালিন্যের বা অবিশ্বাসের কোনোও কারণ ঘটেনি। হ্যাঁ···ছাব্বিশ বছরের কানায় কানায় ভরা ভালোবাসা!

শুরু হয়েছিল এইভাবে:

আমার বাবা ছিলেন আবগারী বিভাগের কেরাণী। উচ্চপদ লাভ করা এহেন চাকুরেদের কাছে চিরদিনের দুরাশা! কারণ, তেমন কোনো পদ খালি হ'লেই ধামাধরা বা মামার-জোরওয়ালা কেউ এসে তা বাগিয়ে নিয়ে থাকে। তাই, সারা জীবনটাই বাবা একঠাঁয়ে একই চাকুরীতে কাটিয়েছেন···অথচ চাকুরীতে ঢুকেছিলেন সেই তাঁর বিয়ের ঠিক পরেই! আমি সেই চাকুরী-স্থলেই জন্মেছি, বড়ো হয়ে উঠেছি।

আমার স্বামীর সংগে দেখা হ'ত এবং তার বাবা-মা'র সংগেও···তার অর্থ আমারো! আমরা ডাকতাম তাকে 'ছোট্ট লুসিঅঁ'। ছুটির দিনগুলি সে এসে কাটিয়ে যেত বাবা-মা'র সঙ্গে। তারা ছিল আমাদেরি প্রতিবেশী। তার বাবা কাজ করতেন শুল্ক-বিভাগে। পরিবারে বহু পোষ্য। যৎসামান্য আয়ের দ্বারা স্ত্রী ও পাঁচটি সন্তানকে লালন-পালন

করা সহজ কথাটি নয়। তাদের তুলনায় আমরাই ছিলাম বরং ভালো। আয় কম হলেও আমি বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান ছিলাম ব'লে আমাদের অবস্থা স্বচ্ছলই মনে হ'ত। কাজেই, লুসিআঁ-র সংগে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার পেছনে আমার আর কোনোরকম উদ্দেশ্যই ছিল না। তাছাড়া, আমাদের দু'জনের বয়সও তখন চৌদ্দ,—সে ছিল আমার চেয়ে মাত্র ছ-মাসের বড়। এ বয়সে টাকা পয়সাটা মোটেই বড়-কিছু ব'লে মনে হয় না।

প্রণয়-নীড়ে দুটি কপোত-কপোতী—লুসিআঁ আর আমি······সে ছিল খুবি শান্তশিষ্ট, খুবি ভদ্র। তার উপর আমি যেমন খুশি আবদার অত্যাচার চালাতাম। আমিই তার মনে এই ধারণা গড়ে তুললাম যে সে আমার স্বামী! সেও তা মেনে নিল।

চৌদ্দ থেকে আঠের বছরে স্বামী হওয়ার অর্থ—ছুটির আমেজে ছোট্ট ভাইটির মতোই ঠিক যেন দিদির পিছু-পিছু ঘুরে ফেরা! আমরা এ-ওর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতাম, আবার চড়টা-কিলটা বসিয়ে দিতেও ছাড়তাম না। (আজ ছাব্বিশ বছর পরে মনে হচ্ছে, আমি একটু নিষ্ঠুরই ছিলাম হয়তো!)—কিন্তু লুসিআঁ চলে যাবার আগ পর্যন্ত সে ছিল ছোট্ট একটি মেয়ের মতোই—আমার চেয়ে ঢের বেশী সরল।

॥ ২ ॥

আঠেরতে ছাড়াছাড়ি হ'ল। লুসিআঁর বাবা লুসিআঁর জন্যে আশাতীত রকমের একটা ভালো চাকুরী জুটিয়ে দিলেন—অব্যর্থ কোনো মামার-জোরেই অবিশ্যি! এক ধনী ইংরেজের ভ্রমণ-সঙ্গী হয়ে সে চলে গেল। ইংরেজ ভদ্রলোক ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সারা দুনিয়া ঘুরে ঘুরে এবারে বেড়ানোর জন্যেই নতুন করে বেড়ানো শুরু করছিলেন। সঙ্গী হিসেবে তিনি একজন ফরসী যুবক চাইছিলেন, কারণ ফরাসীদের ভাষা ও ব্যবহার বড়ই মধুর। এই বিদায়-ব্যাপারে লুসিআঁ সত্যিই খুব ব্যথিত হ'ল, কিন্তু অধীর হয়ে রইল নতুন পৃথিবী ঘুরে দেখার আনন্দেও। অবিশ্যি বাতিল হয়ে গেল না আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। 'স্বনামধন্য সাবান-ব্যবসায়ীটির, তার অর্থ সেই ইংরেজ ভদ্রলোকটির,—তার অর্থ "রবিনসন সাবান"-এর কাছ থেকে একটা মোটা টাকা পেলেই কাজে ইস্তফা দিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসছি।'—যাবার বেলায় বলল সে। মোটা

টাকা পেতে কতদিন লাগবে সে বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছুই বুঝলাম না ; তা, নিশ্চিতই বেশীদিন লাগবে না। কাজেই, আমাদের বিয়ে—সে তো কয়েক মাসের ব্যাপার। লুসিআঁ-র উল্লাসে আমিও মেতে রইলাম। বিদায়-বেলায় আমাদের হাসির সাথে সাথে নেমে এল অশ্রুধারা।

॥ ৩ ॥

এ সব তো প'চিশ বছর আগের কথা। প'চিশ বছর ! মেয়েলোকদের পারিবারিক জীবন শুরু করবার পক্ষে এ সময়টা যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে নিজের পুত্রকন্যার ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের মুখও দেখবার কথা। পরিণয়ের এবং পারিবারিক জীবনের প্রতীক্ষায় কাটিয়েছি আমি এই সুদীর্ঘ প'চিশ বছর ! শুধু একটি কথা আমার জীবনকে মধুর করে রেখেছে : একজনকে ভালোবাসি আমি, আর সেও আমাকে ভালোবাসে। আমার ভাগ্য আমার উপরে একেবারে প্রসন্ন ছিল না কোনোদিনই। বাবাকে হারালাম, তারপর মাকে। এক উকীলের পাল্লায় পড়ে হারালাম সঞ্চিত টাকার প্রায় আধাআধি। যেদিক থেকেই হ'ক, তবু কখনোই আশা হারাইনি। আমার একান্ত বিশ্বাস ছিল আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে···সুখের ভবিষ্যৎ। তবুও, অত বছর ধরে লুসিআঁ-কে একটিবার দেখতে না পেয়েও !

হ'্যা, আর একটিবারো দেখতে না পেয়ে। তার চিঠিগুলি আগাগোড়াই আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম এবং প'চিশ বছর ধরে নিয়মিত সে আমাকে চিঠি লিখেছে। কোনো চিঠিতেই ভবিষ্যতের আশা-ভরসাকে মিথ্যে বলে মনে হয়নি। আমার চিঠির মতো তার চিঠিতেও ফুটে উঠেছে নিবিড় দরদ। এই সময় সে তার 'দুনিয়া' দেখে বেড়াচ্ছিল, —আমার সেই 'ছোট্ট-লুসিআঁ' ! মিশর উত্তর-আফ্রিকা রাশিয়া ভারতবর্ষ আমেরিকা—'রবিনসনের সাবান'-এর সঙ্গে কত দেশেই না বেড়িয়েছে······ মাঝে মাঝে এই ফ্রান্সের মধ্য দিয়েই যাতায়াত করেছে, কিন্তু এত জলদি এত ব্যস্তসমস্ত যে একটিবার নেমে তার 'ছোট্ট বৌটি'-কে দেখে যাবার মতো সময় হয়ে ওঠেনি। 'ছোট্ট বৌটি'—সব চিঠির সম্বোধনেই লিখত সে। আর আমিও জবাবে লিখতাম—'প্রিয়তম, স্বামী !'

॥ ৪ ॥

কাল দুপুর বেলা হারমোনিয়মে একটা গান বাজাচ্ছিলাম—সামনের রোববারে সেই গানটাই গাইবার কথা। তখন আমার ঝি এসে খবর

দিল, এক মহিলা দেখা করতে এসেছেন। আমার বাবা-মার পুরানো বন্ধু, লেখাপড়া-জানা মহলে ভদ্র-মহিলা বেশ কিছুটা প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন—প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সাধারণ-পরিদর্শিকার পদই অলংকৃত করছেন বোধ হয়। তাই ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধবদের কাছে আজ দেখাতে এসেছেন নিজের উন্নতির বহরটা। আধঘণ্টা খানেক ধরে কথাবার্তা বললাম, পুরানো দিনের পরিচিতদের কথা উঠল। জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি কি এখনো লেতারেতদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন ?'

'লুসিআঁ লেতারেতদের ?'

'হ্যাঁ, যিনি ইংলণ্ডে বিয়ে করেছেন—ডার্বিশায়ারে······'

আমি কোনোরকমে এইটুকু বলতে পারলাম—'না, তার সঙ্গে দেখা হয়নি বহুদিন···' আরো খুঁটিনাটি খবর জানতে চাইলাম এবং সবকথাই শুনলাম।

বোর্ডস্কুল-পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার জন্যে ভদ্রমহিলাটি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, শিল্পাঞ্চলেই ছিলেন কিছুদিন। 'রবিনসন সাবান'-এর কারখানায় যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তিনিই আমার স্বামী··· লুসিআঁ লেতারেত···রবিনসনের উত্তরাধিকারী এবং জামাতা, এবং তিন-তিনটি সন্তানের বাবা······

॥ ৫ ॥

নিরালায় এসে কিছুক্ষণ চোখের জল ফেললাম। তারপর হাসলাম। কী বোকামি ! পঁচিশ বছর ধরে একটি স্মৃতির মুখ চেয়ে কেউ কি বসে থাকতে পারে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ? অবিশ্যি, আমার দিক থেকে একথা সত্যি যে এই স্মৃতিটুকুর জন্যেই আমি বিসর্জন দিয়েছি আমার যৌবন, আমার সুখস্বপ্নের দুনিয়া···এবং এই দানের বিনিময়ে আমার একটি স্বামী জুটে যেতে পারত, হয়ত পারত !···ঠিক এই সুরেই আমি লুসিআঁর কাছে লিখতে শুরু করলাম···বিশেষ করে তার চিঠির অযথা প্রতারণার কথা লক্ষ্য ক'রে। কিন্তু তারপরেই ভাবতে লাগলাম···ঐ প্রতারণার কল্যাণেই তো আমি একটি একটি করে পঁচিশটি বছর একরকম সুখেই কাটিয়েছি ! এতগুলি বছর ! এই পঁচিশটি বছর ধরেই আমি বিবাহিতা···লুসিআঁর কাছ থেকে এই স্বপ্নাঞ্জনটুকুও না পেলে বছরগুলি কী ভাবে কাটত ? বোধ হয়, সে নিজেও তা বুঝেছে। এই জন্যেই ন-বছর আগে তার

বিয়ের সময় সে এই কথাটুকু বলতে দ্বিধা করেছে···'হায়রে হতভাগী, আমার কথা ভেবো না আর······'

কাজেই, ধৈর্য ধরো। হতাশার কারণ নেই···এবং চোখের জল আর নয়! এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে নিজেকে মনে করেছি বিবাহিতা। আজ হয়েছি আমি বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা! ব্যস্, এই তো আমার ইতিহাস।

আর তারপর···যখন মনে পড়ে তিনটি সন্তান আছে তার! আচ্ছা, আমি যদি সুন্দর করে দরদ দিয়ে চিঠি লিখে তাদের একটিকে পাঠিয়ে দিতে বলি? ইংলণ্ডের মতো অমন চমৎকার ভাবে হয়ত পারব না, কিন্তু একটি ফরাসী সন্তানের মতো পালন করতে পারব তো, শেখাব তার বাবার মুখের ভাষা···যে ভাষায় একদিন সে আমায় ভালোবাসত। লুসিআঁ নিশ্চয়ই নারাজ হবে না। আর, এই সন্তানকে পালন করতে করতেই বোধ হয় পেরিয়ে যেতে পারব আমার ঘর থেকে কবরের পথটুকু······

বেশ, ভালো কথাই মনে হয়েছে তো! হ্যাঁ, বোকা মেয়ে! বোকা বুড়ী মেয়ে, এবারে চশমাটা পরে কলমটা নিয়ে 'রবিনসনের সাবান'-এর উত্তরাধিকারীর কাছে সোজা লিখে ফেলো।

একটুখানি সাহস ও সদিচ্ছা বজায় রাখতে পারলেই নির্মম ভাগ্যকে জয় করতে পারবে। বৌ তো হয়েছই, এবারে মা-ও হবে।

সত্যিই বড় দুঃখের

ট্রেণটা স্টেশন থেকে বেরিয়ে যেতেই চিত্রশিল্পী এস্‌প্রিত্‌ ক্যাপ্‌দেনেভ্‌ দেখল…সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার সমস্ত যাত্রীই নেমে গেছে…একটি মেয়ে শুধু বসে আছে এককোণে, ঠিক তার বিপরীত দিকেই। শিল্পী এস্‌প্রিত্‌ ভোরবেলা পেতুই স্টেশনে গাড়ীতে উঠে এককোণে গুটিয়ে শুয়ে লম্বা এক ঘুম দিয়ে নিয়েছে। এবারে সে আড়মোড়া দিয়ে জেগে উঠল চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে, এবং রোদে চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল চারিদিকটা। উল্টোদিকের মেয়েটিও ঠিক তারি মতো সবেমাত্র খুলেছে ঘুমভরা চোখ দুটি! কালো ঝালর-ফিতে লাগানো শালটা গা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসল সে, এলোমেলো সুন্দর সোনালি চুলগুলি বেঁধে নিল এবং পকেট-আরসীটা হাতে নিয়ে নিজেকে যথাসাধ্য ফিটফাট করে করে তুলতে চেষ্টা করল।

বছর চব্বিশেক বয়স তার, বেশ সুন্দর গোলগাল চেহারা। চমৎকার দেখতে। নীল চোখ দুটি ফুলের মতো হাসছে, অধরের উপরকার কালো তিলটি মানিয়েছে ভারী সুন্দর। শিল্পীটি বেশ একটু লুব্ধ চোখেই লক্ষ্য করছিল তার সরু কোমরটি, নিটোল লোভনীয় বুকখানি, দস্তানা-পরা হাত দুটির সুন্দর সুগোল গড়নটুকু। দুষ্টু ছেলেটির মতো লুকিয়ে লুকিয়ে শিল্পী এস্‌প্রিত্‌ তাকে লক্ষ্য করছিল। মেয়েটি তার 'ট্রাভেলিং-ব্যাগ' খুঁজে খুঁজে একটা মোড়ক বার করল, কিন্তু পেল শুধু শুকনো একখানা রুটি! মেয়েটি এর চেয়ে ভালো আর-একটা-কিছু পাবার আশাই করছিল যেন। ব্যাগের সমস্ত কিছু উলটে-পালটে খোঁজাখুঁজির শেষে সে ঠোঁট ফুলিয়ে হতাশা ও বিরক্তির ভাব দেখাল।

তা দেখে এস্‌প্রিত্‌ কেমন একটা করুণা বা দরদবশেই নিজের বাক্সটা খুলে রুপালি কাগজে মোড়া এক প্যাকেট চকোলেট বার করল, এবং এক প্রেমিক-বীরের মতোই সেটা এগিয়ে দিল তরুণীটির হাতে…

'মাদাম…মাদ্‌মায়েজল…'

'হ্যাঁ, মাদ্‌মায়েজল।'—মেয়েটি একটু বিস্মিত ভাবেই শুধরে দেয়। শিল্পীর অধরে সরল একটি হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে যায় তার কোঁকড়ানো নবীন গোঁফের ভিতরে।

'দেখুন মাদ্‌মায়েজল'—এস্‌প্রিত্‌ বলতে থাকে—'ভুল করে যা ফেলে এসেছেন তার বদলে অনুগ্রহ করে এই চকোলেট-প্যাকেটটাই নিন।'

মেয়েটি এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করে, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের রুটির আধখানাও বিনিময় করতে চায়। খেতে লাগল দুজনে—ট্রেণ এদিকে বাষ্প ছেড়ে ছুটে চলেছে প্রান্তরের উপর দিয়ে। রুটি চিবোতে চিবোতে তারা জানলা-পথে দেখছিল কত রকমের দৃশ্য। পাহাড়ের পর পাহাড় জড়াজড়ি করে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে-দূরান্তে ; ফলের বাগানগুলি প্লাম ও চেরীফুলে শাদা হয়ে আছে তুষারের মতো। মাঝে মাঝে বয়ে চলেছে ঝিকিমিকি স্রোতধারা···দুপাশে কচি কচি ঘাস দুলে দুলে উঠছে···দুলে দুলে উঠছে নার্সিসাস ফুলগুলি।

একসাথে এই খাওয়াটুকুতেই দুজনের মাঝখানের নীরবতার কঠিন প্রাচীরটা সরে গেল এবারে···আলাপ করতে লাগল সহজ হ'য়ে। এস্‌প্রিত্‌ তার সঙ্গিনীর বিশ্বাস অর্জ্জন করবার জন্যে নিজের বয়স পেশা ও কাজের কথা উল্লেখ করল। সেইণ্ট রাফেল থেকে আসছে সে, যাচ্ছে গ্রেনোবলে। সেখান এক কারিগরের সমস্ত পরিবারের ছবি আঁকবার কাজ আছে। কারিগরটি দেখতে জঘন্য কুৎসিত, তবে টাকা আছে যথেষ্টই এবং পারিশ্রমিকও দেয় মন্দ না। শিল্পীটি কেমন হাত নেড়ে নেড়ে পরমোৎসাহে সেই প্রতিকৃতিগুলির হাস্যকর একটা নমুনা দেখাচ্ছিল। মেয়েটি হাসতে লাগল প্রাণ খুলে···ক্রমেই সে সহজ হয়ে আসছিল বন্ধুর মতো।

'তাহ'লে আপনি ছবি আঁকেন ?'—মেয়েটি বলে।

'হ্যাঁ মাদ্‌মায়েজল, কি আর করি···তা, আপনার নামটা ?'

'লুসি !'

'আচ্ছা মাদ্‌মায়েজল লুসি, আপনি যদি গ্রেনোবলে দুটো দিনের জন্যে একটু নেমে যান তো আপনার একখানা ছবি এঁকে একটুখানি আনন্দ লাভ করি। সত্যিই, কথা দিচ্ছি আমি···সেই কারিগরের কুৎসিত পারিবারিক রাজ্য থেকে সে হবে আমার মুক্তি !'

'সত্যিই, দুঃখিত আমি !'—মেয়েটি লজ্জিত হয়ে ওঠে—'আমি তো অতটা দূরে যাব না। এই ক্লেরম'তেই নামব।'

মেয়েটি এবার তার জীবনের সবকথা বলতে লাগল। এইক্স-এ এক ম্যাজিস্ট্রেট-পরিবারে পরিচারিকার কাজ করে সে। বাবা-মাকে হারিয়েছে ছেলেবেলায়। আত্মীয় বলতে কাকা ও কাকীমা। তাঁরা থাকেন ক্লেরম'তে।

সেখানকার এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁরা লুসির বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছেন, ছেলেপিলে নেই। নাম লেচুদেল। এই ইস্টারের ছুটিতে কাকার ওখানে গিয়ে ভালোই হ'ল। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গেও দেখা হবে ; এখন পর্যন্ত লুসি দেখেছে শুধু তার ফোটোটাই।

প্রাণখোলা সরলতায় সে বলতে লাগল—'আমার কাছে একটু বুড়োই সে। আর যা মনে হচ্ছে, দেখতেও তেমন একটা-কিছু নয়। কিন্তু আমিও যে অন্যের অধীনে আর দিন কাটাতে পারছি না। একা একা থাকা যে কী দুঃখের, কারোও কাছ থেকে একটুও স্নেহ না পাওয়া যে কী ব্যথার! তাই, ভদ্রলোককে দেখে যদি খুব বিরক্তি না লাগে তো—মনে হচ্ছে তাকেই বিয়ে করব।'

একান্ত ব্যথিতভাবে এইসব কথা বলতে বলতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার টুকটুকে ওষ্ঠ দুখানি মেলে রইল আধোখোলা পাপড়ির মতো, মাঝখান দিয়ে উঁকি মারতে লাগল মুক্তোর মতো দাঁতগুলি। আর, শিল্পী এস্প্রিত্ এদিকে লক্ষ্য করছিল মেয়েটির নীল দুটি চোখে জ্বলে উঠছে প্রণয়-তৃষিত নারী-প্রাণের কোমল কামনা ; মায়ায় ভিজা তার নরম চাহনি একটি চুমোর জন্য বিহ্বল! তার উন্মুক্ত ওষ্ঠাধর, তার ক্লান্ত-করুণ নিঃসঙ্গ জীবনের ওই সরল কাহিনী—সবকিছুই শিল্পীটির মনে জাগিয়ে তুলেছে মেয়েটিকে একটু আস্বাদ করার বাসনা। হঠাৎ সে একটা সঙ্কল্প করে বসল—অচেনা যে ভণ্ড ভদ্রলোকটির কাছে এই সুন্দরী মেয়েটি তার লোভনীয় যৌবন সমর্পণ করতে যাচ্ছে—সেই ভদ্রলোকটির আগেই সে একবার গ্রহণ করে দেখবে তাঁর ভূমিকা।

আবেগভরেই সে বলে উঠল—'সে কি! এক বুড়ো দোকানদারকে বিয়ে করে মরবেন আপনি? জীবনটা বিসর্জন দেবেন একটা পচা ডোবার মধ্যে? না, না, সে হবে না। কোনো সুন্দরী মেয়েরি এমনটা করবার অধিকার নেই। যেখানে-সেখানে এমন অবিবেচকের মতো নিজেকে দিয়ে দেবেন? এমন পাগলামি করবেন না, আমার একান্ত অনুরোধ!'

এবং অনুরোধটাকে আরো জোরালো করবার জন্যে সে মেয়েটির হাত দুখানি ধরল। মেয়েটি প্রথমে হেসে হেসে তাকে আমলই দিচ্ছিল, কিন্তু শিল্পীটি যে হাত আর ছাড়ে না! তাই ক্রমেই সে ভয় খেয়ে গেল, অথচ আঙুলগুলি তার হাতের মুঠো থেকে মুক্ত করে নিতেও পারছিল না। ট্রেনটা তখন যাচ্ছিল একটা উঁচু মালভূমির উপর দিয়ে। চারদিকেই

উড়ন্ত কুয়াশা! তারপরেই আবার ঢালু প্রান্তর, উজ্জ্বল আলো আর গরুর গল-ঘণ্টার মিঠে আওয়াজ। এক ঝলক চঞ্চল হাওয়া গাড়ীর ভিতর উড়িয়ে নিয়ে এল চেরীফুলের কতকগুলি শাদা পাপড়ি। এই ফুল-বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এল বসন্তের মিষ্টি উন্মাদনা! হঠাৎ ট্রেণটা ডুবে গেল একটা সুরঙ্গের গভীর অন্ধকারে। শিল্পীটি এবার পেয়ে গেল বেশ একটু আদর করবার স্বর্ণ সুযোগ। অন্ধকারের ভিতর মেয়েটি কেমন বিব্রত হয়ে পড়ল—নিজেকে সে আর সামলে রাখতে পারল না। এস্‌প্রিত্‌ তার পাশে এসে বসল, হাতখানা দিয়ে জড়িয়ে ধরল তার সরু কোমরটি। হঠাৎ গাড়ীটা আবার বেরিয়ে এল মুক্ত আলোর রাজ্যে।

'আমাদের কেউ যদি দেখে ফেলে!'

'কে দেখবে?···আকাশের পাখীরা! ও নিয়ে ভেবো না, তোমাকে ভালোবাসতে দাও!'

ট্রেণটা আবার সুরঙ্গে ঢুকল এসে। লুসি বিহ্বলের মতো তার চোখে মুখে অনুভব করল সঙ্গীর অদৃশ্য চুম্বন, একটা ত্রস্ত সুখের আবেগে ভরে উঠল সমস্ত দেহমন। একেবারেই আত্মহারা হয়ে পড়ল সে, মাথাটি এলিয়ে পড়ল একপাশে—সে যেন আর বাধা দিতেও পারছে না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আবারো ফুটে উঠল উজ্জ্বল আলো। ট্রেণ এসে থামল ছোট্ট একটি ষ্টেশনে! চারদিকেই চীৎকার—'চা, সরবৎ!'

'ভগবান!'—মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, লজ্জায় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সংকুচিত হয়ে আসে—ক্লেরম'তে তো এসে পড়লাম ব'লে। দিন, আমাকে এবার ছেড়ে দিন, আপনার দুটি হাত ধরে বলছি—ছেড়ে দিন।'

কাঁপতে কাঁপতে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, টুপিটা পরল, তাড়াতাড়ি চুল গোছাতে থাকে।

'ক্লেরম' দিয়ে কি হবে?'—এস্‌প্রিত্‌ আবারো তাকে দু-বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে, কামোচ্ছ্বাসে বলতে থাকে—'তোমাকে ভালোবাসি আমি, তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না, আমার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে যাবই।'

মেয়েটি থতমত খেয়ে যায়, বলে—'চুপ করে বসুন।'

বনঘেরা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে বাষ্প-নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ছুটে চলেছে ট্রেণ! লুসি নিজেকে আলিঙ্গন থেকে আধখানা মুক্ত করে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে জানলায়। দূর থেকে সে দেখতে পাচ্ছে রৌদ্রোজ্জ্বল একটি গ্রাম, প্রান্তরের মধ্যে পাইন-বনের বুকে একটি দীর্ঘ পথ সোজাসুজি চলে

গেছে প্রান্তরটির মধ্য দিয়ে। এবারে সে দেখতে পাচ্ছে, গ্রাম-প্রান্তের স্টেশনটি। প্লাটফর্মের উপরকার তিনটি মানুষের আবছা চেহারাও স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমেই—তারা একত্র হয়ে যেন কারো প্রতীক্ষা করছে।

'কাকা ও কাকীকে ঠিকই চিনতে পারছি আমি!'—লুসি বলে—'সঙ্গী ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই সেই মঁশিয়ে লেচ্‌দেল্‌।'

এসপ্রিত্‌ দুষ্টু ছেলের মতো চট্‌ করে মেয়েটি ও দরজাটির মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—'এমনভাবে স্টেশনে আসাটা ভদ্রলোকের পক্ষে সত্যিই অন্যায়।'

হঠাৎ সে জানলাটি বন্ধ করেই দোরে পিঠ রেখে দাঁড়াল একটি দৃঢ় সঙ্কল্পের মতোই!

'না,'—এসপ্রিত্‌ জোর দিয়েই বলতে থাকে—'তোমাকে আমি একটা জঘণ্য লোকের কাছে বলি হতে দেব না। তোমাকে ভালোবাসি আমি, তোমাকে নিজের কাছেই রাখব।'

ট্রেনের গতি মন্থর হতে হতে থমকে দাঁড়াল। গার্ডের গলা শোনা যায়—'মনেস্তিয়ার, স্টেশন মনেস্তিয়ার!'

লুসি ভাবে আমার সঙ্গে একটু মজাই হচ্ছে শুধু। ব্যাগ ও ছাতা নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়—'ঠাট্টা নয়, সত্যি দোরটা খুলুন, যেতে দিন আমাকে।'

'কক্ষনো না, প্রাণ থাকতে নয়!'—শিল্পীটি শপথ করে, এবং লুসিকে বুকে টেনে নিয়ে তার সব আপত্তি ঢেকে দেয় অজস্র চুমোয় চুমোয়।

বাইরে শোনা যাচ্ছে কাকা ও কাকীমার কণ্ঠস্বর। তাঁরা নাম ধরে ডেকে ফিরছেন,—'লুসি, লুসি!' কিন্তু সব ডাকাডাকিই বৃথা। শিল্পীটির বিরাট পৃষ্ঠদেশ ঢাকা দিয়ে রেখেছে তাঁদের ভাইঝিটিকে।

'ওঁরা খুঁজছেন আমাকে, আমাকে ডাকাডাকি করছেন!' লুসি ছলছল চোখে বলতে থাকে—'এটা আপনার অন্যায়, আপনার পায়ে পড়ি—দোরটা একটু খুলুন।'

বেজে উঠল বাঁশী, চলতে লাগল ট্রেন। মনেস্তিয়ার স্টেশন মিলিয়ে যেতে লাগল স্বপ্নের মতো! সব চেষ্টায়ই ব্যর্থ হয়ে লুসি ক্লান্তিতে ধপ্‌ করে বসে পড়ল তার জায়গায়। এসপ্রিত্‌ আবারো তাকে দু-বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু লুসি রাগে ঠেলে দিল তাকে এবং নিজেও

সরে বসল কামরার একপ্রান্তে। দুহাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বুকফাটা কান্না। 'না, না এ অন্যায়, এ বাড়াবাড়ি। চলে যান আপনি। আপনাকে দেখলেও রাগ হয়।'

এস্‌প্রিত্‌ মেয়েটির সামনে বসে তাকে আদরের কথা বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু মেয়েটি বসে থাকে অপ্রসন্ন ভঙ্গীতে। যেন এক পাষাণ-প্রতিমা! এইভাবেই তারা পেঁছিল এসে ভিজিল্‌ স্টেশনে। দোরটা খুলে গেল, কামরাটা ভরে গেল বহু যাত্রীতে। গ্রেনোবল্‌-এ ছুটি কাটাতে যাচ্ছে সবাই। চুপ করে বসে রইল শিল্পী এস্‌প্রিত্‌। লুসি এককোণ থেকে এস্‌প্রিতের দিকে আধাআধি পিঠ ফিরিয়ে বিরস মুখে তাকিয়ে আছে দোরের দিকে। এস্‌প্রিত্‌ নিরুপায় বসে আছে একা। লুসি এবার শান্তভাবে অনেক কথাই ভাবছে—ভাবছে তার এই পালিয়ে-চলা, তার পরিণাম এবং এইসঙ্গে জড়িত তার ইচ্ছাকৃত দায়িত্বের কথা। কেউ কথা বলছে না। গ্রেনোবল্‌ পেঁছে শিল্পীটি মেয়েটিকে নীরবে হাত ধরে নামাল এবং নিজেই হাতে করে নিল তার ব্যাগটা।

লুসি শিল্পীটিকে লক্ষ্য করছিল, শান্তভাবে তাঁকে অনুসরণ করছিল—একটি ভয়-পাওয়া জীবের মতো। স্টেশন থেকে বাইরে এসে শিল্পীটি মেয়েটির হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে চলে এল একটা হোটেলে। একজন হোটেল-কর্মী তাদের নিয়ে এল একটা কামরায়। এবারে তারা আবার একা। লুসি হতাশ-ভাবে বসে পড়ল একটা চেয়ারে এবং হঠাৎ কেঁদে উঠল উচ্ছ্বসিত আবেগে। প্রবল ফোঁপানিতে দুলে দুলে উঠতে লাগল তার বুক।

শিল্পী এস্‌প্রিতের এবার ভয় পাবার পালা। মেয়েটি যে এমনভাবে ভেঙে পড়বে একথা সে ভাবতেই পারেনি। লুসির পায়ের কাছে নতজানু হয়ে মিষ্টি ভাষা ও সহৃদয় ব্যবহারে সে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু সমস্তই বৃথা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে কান্না আরো বেড়ে উঠল, সভয়ে সে সরিয়ে দিল এস্‌প্রিত্‌কে।

'চলে যান আপনি!'—তার গলার স্বর শোনায় ঠিক ব্যথার গোঙানির মতো। 'আপনার মধ্যে প্রাণ ব'লে যদি কোনো পদার্থ থাকে তো আর কিছু করবেন না আমার। ওঃ ভগবান, ওঃ ভগবান! একী হ'ল আমার! আমার আত্মীয়েরা লিখবে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে, তখন সবাই কিরকম ভাববে আমাকে! চাকরী থেকে-বরখাস্ত করে দেবে, অপমান

করবে—বেকার হব আমি। সব তো আপনার জন্যে। আমাকে বদ-মেয়ে ভেবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন আপনি, তাই তো আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।'

আবার চোখের জল ঝরতে লাগল তার দুটি গাল বেয়ে। এস্প্রিত্ তো হতভম্ব। ঠিকই বলেছে মেয়েটি, আমিই আচরণ করেছি বদলোকের মতো। নিজে সে লোক খারাপ নয়, তবে সংযত আচরণ বা সংযম-গুণের জন্যে বিখ্যাত হবার মতোও নয়,—কোনো মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুযোগ নেবার মতোও নয়। কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েছে এই সুন্দরী মেয়েটি। এর উপর অন্যায় ব্যবহার করাতে এস্প্রিত্ এখন আহতই হ'ল, বুঝল—মেয়েটি আসলে খুব সরল এবং ভালোমানুষ। আর, এই বোধের সঙ্গেসঙ্গেই কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা হ'ল তার। হঠাৎ সে লুসির হাত দুখানি ধ'রে বিনীতভাবে বলতে লাগল—'আমাকে ক্ষমা করুন। এতটা ভেঙে পড়বেন না, মাদ্মায়েজল লুসি! আপনাকে আবার স্টেশনে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। মর্নেস্তিয়ারের প্রথম ট্রেণটাতেই তুলে দেব আপনাকে। আত্মীয়দের কাছে বললেই হবে—গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ঘুম থেকে জেগে দেখেন যে চলে এসেছেন একেবারে গ্রোনোবুল। তাহ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। চোখটা একটু মুছে নিন। সত্যিই আমি বোকার মতো ব্যবহার করেছি, তবে আমিও অভদ্র নই।'

আবার সে লুসিকে নিয়ে এল স্টেশনে। একটা ট্রেণ তখন যাচ্ছিল মর্নেস্তিয়ারের দিকে। এস্প্রিত্ চট্ করে একটা টিকেট কেটে লুসিকে তুলে দিল গাড়ীতে, সঙ্গে দিয়ে দিল কিছু মিষ্টি, কিছু চকোলেট ও ফল। এবারে নিজেকে নিরাপদ মনে করে লুসি আবার সুস্থ হয়ে উঠল। নীলফুলের মতো তার সুন্দর চোখ দুটি আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেমন এক মোলায়েম আলোয়, তার কোমল লাল ওষ্ঠে ফুটে উঠল দুষ্টুমি-ভরা একটি হাসি! শিল্পী এস্প্রিত্কে সে ধন্যবাদ জানাল। মেয়েটি নেমে পড়ল গাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে।

শিল্পী এস্প্রিত্ চেয়ে রইল ট্রেণের দিকে। ধুঁয়োর কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে গড়িয়ে চলল ট্রেণ।

'সত্যিই কী-দুঃখের!'—ব্যথাভরে শিল্পীটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'এমন সুন্দরী একটি মেয়ে বিয়ে করবে কিনা লেচ্দেল্কে,—একটা ব্যবসায়ীকে! সত্যিই বড় দুঃখের!'

অজ্ঞাত শিশুর আদর

॥ এক ॥

অফিসের একটা ঘরে বসে কয়েকজন লেডি-টাইপিস্ট পট্‌পট্‌ টাইপ করে যাচ্ছিল। আঁটসাট জামা-পরা ছোট্ট একটি ফিটফাট ছেলে দরজার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বলল—'নাদেঝদা আলেক্সেভানা-কে ফোনে ডাকছেন তাঁর দিদি।'

সাতাশ বছর বয়সের দীর্ঘাঙ্গী একটি সুগঠিত মেয়ে নিচুতলায় নেমে এসে ফোন ধরল। হেঁটে আসছিল সে শান্ত-সংযত ভাবে। তার মধ্যে জেগে আছে যেন এক দূর-দৃষ্টি; গভীর দুঃখ পেয়ে পেয়ে যারা বুক বেঁধে থাকে একমাত্র তাদেরি মধ্যে এমনটা মেলা সম্ভব। সে আপন মনেই ভাবছিল—'কি হল আবার?'

আগে থাকতেই জানে সে, তার বোন যদি তাকে কিছু বলতে চায় তো নিশ্চিতই অবাঞ্ছিত কিছু ঘটে থাকবে: বাচ্চাদের অসুখ করেছে, অথবা তার স্বামী ভেঙে পড়েছেন কর্মভারে, নয়তো টাকার টানাটানি, বা অমনি আর-কিছু। নিজেকেই তখন সেখানে গিয়ে সব-কিছু করতে হবে: তাদের সাহায্য করা, ব্যথার অংশীদার হওয়া, সব ঠিক-ঠাক করে দেওয়া—সব। তার বোন তার চেয়ে দশ বছরের বড়, শহরতলীতে দূর অঞ্চলে থাকে, তাই বড় একটা দেখাশোনা হয় না।

ছোট্ট টেলিফোন বাক্সটির কাছে এল নাদিয়া, সেখানটায় যেন তামাক মদ ও তেলাপোকার মিশ্রগন্ধ! টেলিফোনের হাতলটা তুলে বলল—'হ্যাঁ তানিয়াদি, তুমি?'

ঠিক যেমনটা ভেবেছে সে, উত্তরে তার বোনের সেই গলা, অশ্রুভাঙা, অস্থির, উদ্বিগ্ন—'নাদিয়া, যেমন করেই হ'ক, শিগগির আয়। ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেছে। সিরেজা নেই, গুলি করে আত্মহত্যা করেছে!'

নাদিয়া খবরটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তার ছোট্ট বোনপোটি মরে গেছে—সেই ছোট্ট সুন্দর সিরেজা, শুধু পনের যার বয়স! নাদিয়া ব্যাকুল ব্যস্ততায় এলোমেলো ভাবে বলতে লাগল—

'এ কি হ'ল, তানিয়াদি? কী সাংঘাতিক! কেন করল এমন?

কখন হ'ল ?'—এবং আর কিছু না শুনে বা শুনবার জন্য দেরী না করে তাড়াতাড়ি বলে চলল—'এক্ষুনি আসছি আমি, এক্ষুনি।'

টেলিফোনটা রাখল সে, এমন কি ঠিক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখতে পর্যন্ত খেয়াল রইল না, দ্রুতপায়ে সে ছুটি চাইতে গেল মনিবের কাছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও ছুটি দেওয়া হ'ল। 'তুমি জানো, ছুটির আগটা এখন বিশেষ ব্যস্ততার সময়।'—ম্যানেজার একটু রাগের সুরেই বললেন,—'সবচেয়ে অসুবিধের সময়ই তোমার যেন ছুটির দরকার হয়ে পড়ে। সত্যিই যদি দরকার হয় তো যেতে পারো, কিন্তু মনে রেখো—হাতের কাজটা সেরে রাখবে।'

॥ দুই ॥

কয়েক মিনিট পরেই নাদিয়া উঠে বসল ট্রামে—বিশ মিনিটের পথ। তখন তার বিমর্ষ অবস্থাটা হয়ে উঠল অস্থির অনিশ্চিত। তার বোনের জন্যে মর্মান্তিক করুণা, আর মৃত ছেলেটির জন্যে দুঃখ ও আক্ষেপ যেন একটা বাঁধ দিয়ে চেপে ধরেছে তার বুকের মধ্যটা। এই কথাটা ভাবতেই তার ভয়ানক লাগছিল, এই পনের বছরের ছেলেটা—দুদিন আগেও ছিল যে হাসিখুশীতে হালকা, ছোট্ট একটি স্কুলের ছাত্র—আজ সে কিনা হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসল! উঃ, মায়ের কী অসহ্য দুঃখ! কী কান্নাই না কাঁদছে সে, তার জীবনটা আগাগোড়াই যে বিষম ব্যথায় বিকল হয়ে গেল।

নাদিয়া তবু এমন-ধারা ভাবনার মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে ডুবে থাকতে পারছিল না, তার মন যেন ঘুরে ফিরে কেন্দ্রীভূত হয়ে আসছিল আর-কিছুর উপরে। সব সময়েই তার এমনটা হয়, অভাবিত ঘটনা-ভরা এই জীবনে, দৈনন্দিনের ধরাবাঁধা দিনগুলির মধ্যে যখনি হঠাৎ কিছু-একটা এসে পড়ে। তার জীবনের পেছনেও রয়েছে একটা ঘটনা—এবং সেই ব্যথা নিত্য-নিয়তই কামড় মারছে, বুকের মধ্যে দুঃসহ ভারে ভেঙে ফেলছে তাকে। চোখের জলেরও কোনো সান্ত্বনা নেই তার। কবে তা প্রাণের উৎস-মূলেই বাধা পেয়ে জমে গেছে। কখনো-বা ভুলে দু-একটি নিরালা অশ্রু বাঁধ ভেঙে চোখের কাছে ভ'রে আসে মাত্র! সাধারণত দুনিয়াটাকে দেখে সে নিষ্প্রভ উদাসীন চোখে।

সুখ-বসন্তের সেই দিনগুলিতে চলে গেছে যেন এক উৎসব! তার খুশিতে প্রসন্ন হয়ে পাখা মেলে দিয়েছিল সমস্ত নীল আকাশ—তার আনন্দের জন্যে শ্রাবণ-বর্ষণের সে কী রিমিঝিমি! দিকে দিকে মাতাল সুরভি ছড়িয়ে-দেওয়া পাইন গাছগুলি তার কাছে ছিল গোলাপের চেয়েও সুন্দর! এখানে গোলাপ ফোটে না, তবু তার সমস্ত প্রাণ এই জায়গাটিকে আলিঙ্গন করে আছে। আলোছায়া-ভরা গভীর বনের মধ্যে সবুজ-ধূসর শ্যাওলার নরম বিছানা, আহা কী আদরের মতো। বনদেশের ঝর্ণাগুলি উল্টে-পড়া পাথর ও নুড়ির উপর দিয়ে আধো-আধো ভাঙা-ভাঙা কথায় ছুটে চলেছে ফেনিল হাসিতে—আকেঁডির নদীর মতো! তাদের শীতল স্পর্শ কী আনন্দের, কী যে শান্তির!

ভালোবাসায় ভরা জোয়ারে সেই দিনগুলি ভেসে চলে গেল কত যে দ্রুত! এল শেষের দিন, সে তো জানত না সেই যে শেষদিন। নির্মল নীল আকাশ, স্বর্গের হাসি ফুটে আছে যেন! চারদিকেই শুধু আনন্দ! সুরভিত পাইন বন ও ছায়া-ঢাকা প্রশস্ত বনপথ শান্তি ও স্বপ্নে ভরা; পায়ের তলায় নরম শ্যাওলার আদর-করা আতপ্ত স্পর্শ। চারদিকের সমস্ত কিছুই কিন্তু ঠিক আগের মতোই। পাখীরা শুধু গান গাইছে না, নীড় বেঁধে কচি শিশুদের নিয়ে উড়ে চলে গেছে কোথায়।

কিন্তু তার প্রিয়তমের মুখের উপর কেমন একটা কালো ছায়া! সেদিন ভোরেই একটা অশুভ চিঠি পেয়েছে সে। নিজেই যা বলেছে:

'একটা খারাপ খবর, যেমন করেই হ'ক আমাকে যেতে হবেই। কাজেই, অনেকদিন পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।'

'বুঝিয়ে বলো আমায়!'—নাদিয়া বলেছিল। তখনো তার মনে হঠাৎ উল্টো আঘাত লাগেনি!

'বাবা লিখেছেন, মা রোগশয্যায় এবং এখনি আমার বাড়ী যাওয়া উচিত।'

তার বাবা একেবারেই স্বতন্ত্র কিছু লিখেছেন—নাদিয়া তো জানে না তা। তখনো সে বোঝেনি যে তার ভালোবাসায় প্রতারণা থাকা সম্ভব—যে অধর দিয়ে সে চুমো খেয়েছে, সেখানে সত্য ছাড়া অন্য কিছুও থাকতে পারে! নাদিয়াকে সে দুই-বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে অধরে ওষ্ঠ রেখে বলেছিল—

'আমাকে যেতেই হবে, এছাড়া অন্য আর কোনো পথ নেই। কী

একাই লাগবে আমার! একটা খুব সাংঘাতিক কিছু যে হয়েছে তা আমি মনে করি না—কিন্তু বাধ্য হয়েই আমাকে যেতে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'—নাদিয়া বলেছিল—'মা যদি অসুখে পড়ে থাকেন, কী করে দেরী করবে তুমি। রোজ একটি করে চিঠি দিও কিন্তু; তুমি যাওয়ার পরের দিনগুলি আমার কী করেই যে কাটবে!'

বরাবরের মতোই সে তার সঙ্গেসঙ্গে বড়-রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেল; তারপরে বনের পথ দিয়ে বাড়ী ফিরে এল—বুকভরা বিদায়ের ব্যথা। তবে, ঠিকই জানে নাদিয়া—সে ফিরে আসবে। এবং সে আর ফিরে এল না।

তার কাছ থেকে দুটো কি তিনটে চিঠি সে পেয়েছিল—বিচিত্র রকমের, অদ্ভুত চিঠি, জড়ানো-প্যাঁচালো তার ভাষা, অর্ধস্বচ্ছ অনুভূতিতে অস্পষ্ট, কিছু-কিছু ইঙ্গিত যার কিছুই সে বুঝে উঠতে পারেনি। তারপর, আর নয়। নাদিয়া এবার বুঝতে আরম্ভ করল—সে তাকে আর ভালোবাসে না। গরমের শেষে একদিন হঠাৎ পথের এক কথাবার্তা থেকে শুনল—সে বিয়ে করেছে।

'কেন, শোনোনি তুমি? এই তো গেল হপ্তায়। তারা নিছ-এ গিয়ে ফুলশয্যা করে এল।'

'হ্যাঁ, আচ্ছা ভাগ্য ভদ্রলোকের! খুব ধনী এক সুন্দরীকেই বিয়ে করেছে।'

'মেয়েটি অনেক যৌতুক পেয়েছে নিশ্চয়ই!'

'তা তো বটেই, তার বাবা······'

তার বাবা কি দিয়েছে তা শুনবার জন্যে নাদিয়া আর অপেক্ষা করল না, চলে গেল অন্যদিকে।

অনেক সময়েই সবকিছু মনে পড়ে তার। সে যে মনে করতে চেয়েছে তা নয়, স্মৃতিকে চাপা দিয়ে আড়াল করতেই চেষ্টা করেছে—অতীতকে একেবারেই ভুলে যেতে চেয়েছে। সেই সমস্তকিছুই এত শোকের ও এত অপমানের,—এবং তা থেকে তার যেন কোনোদিনই আর মুক্তি নেই! আর তখন, আর কাউকে সে বিয়ে করেছে একথা জানার পরের দুর্ভর দিনগুলিতে—তার অজস্র চুমোর স্মৃতিতে আপন-হওয়া বনের এই মধুর জায়গাগুলিতে বসেই—সে একদিন নিজের মধ্যে অনুভব করল তার শিশুর স্পন্দন। এবং নতুন একটি জীবনের চেতনার সঙ্গে

সঙ্গেই এল মৃত্যুর সঙ্কেত! না, কখনো তার সন্তান হতে পারবে না!

বাড়ীর কেউ কোনো কথা জানে না, পালিয়ে যাওয়ার কোনো একটা অছিলা খুঁজে নিল সে। নানাসূত্রে থেকে যে করেই হ'ক পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা সে জোগাড় করে নিল এবং সব বন্দোবস্তও হয়ে গেল। কেমন ক'রে সে আর ভাবতে চায় না। তারপর একদিন বাড়ী ফিরে এল—দুর্বল, রোগা, ফ্যাকাশে-মুখ, ক্লান্ত-দেহ! তবু তার ব্যথা ও ভয়কে ঢেকে রাখার চেষ্টায় যেন জাগ্রত হয়ে আছে মনের একটা শক্তি।

স্মৃতি যে কতবার করে সবকিছু তার সামনে এনে ধরতে চেষ্টা করেছে, কিছু না দিয়া কিছুতেই আর তাদের কোনো শক্তি স্বীকার করবে না। যখন একটি ঝলকের মতো সমস্ত মনে পড়ত—ভয়ে শিউরে উঠতে সে, জোর করে মুখ ফিরিয়ে রাখত—তৎক্ষণাৎ সে দৃশ্য থেকে অন্যদিকে মনোনিয়োগ করত দৃঢ়-কঠিন হ'য়ে।

কিন্তু তার প্রাণের মধ্যে একটি স্মৃতির টুকরো সে লুকিয়ে রেখেছে মানিকের মতো। একটি শিশু ছিল তার, তার নিজের—যদিও কোনোদিন সে এসে দেখা দেয়নি মাটির বুকে! কিন্তু প্রায়ই তো সে তার সামনে দেখতে পায়—একটি শিশুর মুখঃ কী সুন্দর, অথচ কী ভয়ঙ্কর!

যখনি সে একলাটি থাকে, নিজেকে নিয়ে নিরালার একটু বসে, আর চোখ দুটি বুঁজে আসে—শিশুটি অমনি চলে আসে তার কাছে। সে যেন বেশ অনুভব করে—দিনে দিনে সে বড় হচ্ছে চাঁদের মতো। কী সুস্পষ্ট করেই না সে দেখতে পায় তাকে! সময় সময় মনে হয়েছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তার শিশুকে সে নিজের কোলের কাছে নিয়েই তো জীবন কাটিয়ে এসেছে! তার জন্যে দুটি স্তন ভরে ওঠে দুধে! হঠাৎ কোনো শব্দ শুনলে সে কেঁপে ওঠে,—খোকন বুঝি পড়ে গিয়ে ব্যথা পেল!

সময় সময় সে হাত দুটি বাড়িয়ে দেয়, খোকনের সোনালী রঙের কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো নরম চুলে হাত বুলোবে ব'লে, তার হাতের একটু স্পর্শ পাবে ব'লে—তাকে আরো বুকের কাছে টেনে আনবে ব'লে। কিন্তু সব সময়েই সে তার স্পর্শ এড়িয়ে যায়, মায়ের হাতখানিতে লাগে শুধু বাতাসের স্পর্শ। অথচ তখনো তো ঠিকই সে শুনতে পাচ্ছে তার কচি গলার হাসি। যেন এখনো সে রয়েছে কাছে কাছে, চেয়ারটার

পেছনেই বুঝি-বা লুকিয়ে আছে কোথাও!

তার মুখখানা সে দেখতে পাচ্ছে—যে কখনো আলোতেই আসেনি তার সেই সন্তানের মুখ। স্পষ্টই চিনতে পারে সে, এ যে তার সেই অঙ্গ, সেই গঠন—যে তার ভালোবাসা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে পথের ধুলায়, তার প্রাণ কেড়ে নিয়ে নিঃশেষে তার সমস্ত রস পান করে এখন ভুলে গেছে সব, সেই তার অঙ্গগঠন—যে এতসব সত্ত্বেও তার নিজের অঙ্গে অঙ্গে হয়ে আছে এত আপনার!

বড় বড় ধূসর চোখ, ঢেউ-খেলানো সোনালী চুল, কচি কচি ওষ্ঠাধর—মুখের আদল সবি তার বাবার। ঝিনুকের মতো ছোট্ট কান দুটি, নিটোল বাহু, গালের টোলটুকু ফুটন্ত গোলাপ—এসব তার নিজেরি মায়ের। তার ছোট্ট দেহটির সবটুকুই তার জানা—সবটুকু!

আর, তার ছেলেমানুষি ভাব-ভঙ্গী! কী করে সে হাতটুকু তোলে, কেমন করে একটির পর একটি পা ফেলে বাবার হাত ধ'রে ধ'রে—যাকে সে কখনো দেখেনি! তার হাসিটি ঠিক তার নিজেরি, ঠিক তার নিজেরি মতো ভঙ্গীতেই মাথাটা একপাশে হেলিয়ে রেখে ফুটফুটে মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে কী সুন্দর!

কী ব্যথাভরা সেই মধুর স্মৃতি! তার শিশুর নরম গোলাপী আঙুলগুলি যেন স্পর্শ করে বুকের গভীর ক্ষতের উপর। সে এত আদরের, তবু কী নিষ্ঠুর—এত নিবিড় যন্ত্রণার, তবু কখনো তাকে ভুলেও তো সে সরিয়ে দিতে চায় না।

'খোকন আমার, আমার না-হওয়া খোকন! তোকে ছাড়া পারি নে আমি, আর যে পারি নে! শুধু যদি তুই বেঁচে থাকতিস! তোকে যদি আমি প্রাণ দিতে পারতাম?'

কারণ, এসমস্তই স্বপ্ন-জীবন শুধু। এ যে একান্তভাবেই তার নিজেরি শুধু! না-হওয়া খোকন তো হাসতে পারে না, কাঁদতেও পারে না। সে আছে, তবে তার মায়ের নিজের কাছে নয়। জীবন্ত জগতের লোকজনের আর পৃথিবীর সমস্ত কিছুরি মাঝখানে—সে নেই, তার কোনো অস্তিত্বই নেই! এত প্রাণময়, এত আদরের, এত সুন্দর,—তবুও সে নেই!

নাদিয়া নিজের কাছে বলতে থাকত—'এমনটা হয়েছে তো আমারি জন্যে! এখন সে ছোট্টটি, বোকা—বোঝে না কিছুই! কিন্তু যখন বড়

হবে সবই জানবে, জীবন্ত সব খোকাখুকুর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে দেখবে, সত্যিকার জীবনে বেড়ে উঠতে চাইবে। তখন সে আমাকে দোষ দেবে, মন্দ বলবে, আর আমি মরতে চাইব।'

বাস্তব চোখে এই সব কী যে বোকামি—একটিবারও ভাবে না সে। একথা কল্পনাই করতে পারে না যে তার পরিত্যক্ত অজাত শিশুটির মধ্যে স্থান নেই কোনোরকমের জীবন্ত আত্মার! না, না,—নাদিয়ার কাছে তার অজাত সন্তান বেঁচে আছে এবং সীমাহীন নিদারুণ দুঃখে তার প্রাণে ঘা দিয়ে দিয়ে ফিরছে নিত্য নিয়ত।

তার কাছে সে একটি জ্বলন্ত প্রদীপের মতো: ঝলমলে পোশাক এঁটে-পরা, ছোট্ট দুটি শুভ্র হাত, ছোট্ট দুটি পদ্মের মতো পা, নির্মল-সরল চোখ, পবিত্র হাসিটুকু! কী খুশীভরা সেই হাসি, গানের মতো মিষ্টি!

নাদিয়া যখনি বুকে জড়িয়ে ধরতে চায় খোকন পালিয়ে ফেরে, তা সত্যি। কিন্তু বেশী দূরে তো সে চলে যায় না, প্রত্যেক বারেই কাছেই লুকিয়ে পড়ে কোথাও! তার আলিঙ্গন থেকে সে ছুটে পালিয়ে যায়, কিন্তু তা হ'লে কি হবে? যখনি সে চুপ করে নিরালায় চোখ বুঁজে বসে থাকে—খোকন এসে যেন তার কচি হাত দুটি দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে, তার পাপড়ির মতো ওষ্ঠ দুটি চেপে ধরে তার গালে। কিন্তু একবারটিও তো সে চুমো খায়নি মায়ের ওষ্ঠে।

'বড় হ'লে বুঝবে! তখন দুঃখ পাবে এবং কোথায় চলে যাবে, আর ফিরে আসবে না কখনো। তারপর, মরে যাব আমি!'

তখনো নাদিয়া কিন্তু কোলাহলময় ভিড়-ঠাসা ট্রামগাড়ীতেই ব'সে। চারপাশে অজানা লোকজন, একে অন্যকে ঠেলে-ঠুলে যাচ্ছে আসছে। নাদিয়া দুই চোখ বুঁজে বসে আছে, ভাবছে তার শিশুকে। সে আবারো তাকিয়ে রইল তার নির্মল নীল চোখ, আবারো শুনতে লাগল খোকনের সেই ভাঙা-ভাঙা আধো-আধো কথা…পথের শেষ পর্যন্ত সমস্তক্ষণ। তারপর নাদিয়া গাড়ী থেকে নামল।

॥ তিন ॥

ট্রাম থামলে নাদিয়া বরাবর চলতে লাগল, তুষার-ঢাকা রাস্তা ধ'রে—কাঠের নিচু বাড়ি, পাথরের বাড়ি পেরিয়ে, সামনের বাগান-ক্ষেত ও শহরতলীর বেড়া-দেওয়া জায়গাগুলি ছাড়িয়ে। নিঃসঙ্গ সে, একেলা।

আরো অনেক পথিকের সংগে দেখা হয়েছে, কিন্তু কেউই তার সঙ্গী নয়! হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের মনেই ভাবছিল—'আমার পাপ চিরদিনই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ; কখনো আর তা থেকে দূরে যেতে পারব না। আমি সেই থেকে যে বেঁচে আছি,—কিন্তু কেন? এমন কি ছোট্ট সিরেজাও তো মরে গেল!'

একটা স্তব্ধ ব্যথা যেন থাবা দিয়ে চেপে ধরেছে তার বুকের মধ্যটা।

'কেন যে আমি দিনের পর দিন বেঁচে চলেছি? তবুও মরে যাব কেন?'—সে তার এই আত্মজিজ্ঞাসার কোনোই জবাব দিতে পারল না।

আবার একথাও তার মনে এল—'আমার প্রাণের খোকন, সব সময়েই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। কিন্তু এখন সে দিন দিন বড় হচ্ছে ; আট বছর হ'ল তার, এবং এখন তো তার সবি বোঝার সময়। আমার উপর রাগ করছে না কেন খোকন? কেন সে রাগ করছে না? তার কি বাইরে যেতে ইচ্ছে হয় না, ইচ্ছে হয় না সেখানে গিয়ে সব শিশুদের সঙ্গে খেলবে ; ছোট্ট শ্লেজ গাড়ীটিতে চড়ে জমাট তুষারের উপর দিয়ে চলে যাবে কেমন সুন্দর! শীতের এতসব সুন্দর দৃশ্যে তার কি মন ভোলে না? আমার তো এই সবি এত ভালো লাগে! এত ছায়া-মায়া থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীটা কী সুন্দর! কী আকর্ষণে ভরা! এও কি সম্ভব যে এমনটি বাস্তবের মধ্যে সে এসে বাঁচতে চায় না?'

তারপর নিঃসংগ একেলা সে বরাবর একটানা পথে যেতে যেতে ভাবতে লাগল তাদের কথা—এখন যাদের সে দেখতে যাচ্ছে। অতিরিক্ত শ্রমভারে ভেঙে পড়েছে তার ভগ্নীপতি ; কর্মক্লান্ত তার বোন ; একঘর খিট্‌-খিটে ছেলে-মেয়ে,—এটা-নয়-সেটা সব সময়েই বেঁধে আছে কোঁদল। দারিদ্র্যে ভাঙন-ধরা পাঁজর বের-করা ঘর, টাকা পয়সার টানাটানি! নাদিয়া এরি মধ্যে মনে করল তার আদরের বোন-পো ও বোন-ঝিদের, এবং সিরেজাকে—যে গুলি করে মরেছে।

কে ভাবতে পেরেছে সে গুলি করে মরবে? ওঃ, এত হাসিখুশী এত প্রাণচঞ্চল ছিল ছেলেটা!

নাদিয়ার এবার মনে পড়ল গত সপ্তাহে তার সংগে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল। সেদিন কেমন বিষণ্ণ ও বিপর্যস্ত হয়ে ছিল সিরেজা। পত্রিকা থেকে সে কয়েকটা ঘটনা পড়ে শুনিয়ে তারপর বলেছিল :

'বাড়ীতে যেদিকে তাকাও সব খারাপ যাচ্ছে, সব দিকেই অন্ধকার!

আর, পত্রিকায়ও দেখবে শুধু ভয়ানক লজ্জাকর সব ঘটনার পর ঘটনা !'

নাদিয়া তখন তাকে এমন কিছু বলেছিল যার সঙ্গে তার নিজের বিশ্বাসেরি বনিবনা নেই—বলেছিল শুধু ছেলেটির মন ফেরাবার জন্যেই। বিজ্ঞের মতোই হেসে সিরেজাও বলেছিল—

'কিন্তু মাসী, কি বিশ্রী কাণ্ডই যে হচ্ছে চারদিকে ! একবার ভাবো শুধু—আমাদের চারদিকের নিত্যকার দশা। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বৃদ্ধ, খুবি বৃদ্ধ—সোজা বাড়ী থেকে চলে গেল—মরবার মতো একটা ঠাঁই খুঁজতে। কী সাংঘাতিক, না ? কারণ, স্পষ্টতই সে আমাদের চেয়ে আরো ভালো করে চারপাশের ভয়াবহ অবস্থা দেখেছে এবং এ সমস্ত সহ্য করে কিছুতেই আর বাঁচতে চায়নি। কাজেই, সে গিয়ে মরল। ওঃ, কী ভয়ানক !'

কিছুকাল চুপ থেকে আবার সে বলতে লাগল—'মাসী ! ঠিক যা ভেবে রেখেছি, বলছি তোমাকে—তুমিই আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসো এবং তুমিই সব বুঝবে। পৃথিবীতে যেখানে এমন ব্যাপার ঘটে, সেখানে কখনো আমি বাঁচতেই চাই না। জানি আমি, আর দশজনের মতোই আমি দুর্বল ! তা, আর কী করবারই বা আছে, বলো ? কেবলমাত্র পলে পলে তিলে তিলে সমস্ত কিছুই সহ্য ক'রে যাওয়া ? মাসী ! নেক্রাসভ ঠিকই বলেছেন—ছোট থাকতেই মরে যাওয়া ভালো।'

নাদিয়ার মনে আছে, এই ছেলেটার জন্যে সে উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল এবং অনেকক্ষণ বসে তার সঙ্গে কথাও বলেছিল। মনে হ'ল শেষ পর্যন্ত সে যেন বুঝলও। সেই আগের মতোই মিষ্টি হেসে হাল্কা গলায় বলেছিল—

'ওঃ ! আচ্ছা বেশ, আমরা সবাই বেঁচে তো থাকি, তারপর দেখা যাবে। অগ্রগতি ঠিক এগিয়েই চলেছে, আমরা শুধু লক্ষ্যপথটিই ঠিক-ঠিক ধরতে পারি না।'

আর, সেই সিরেজা আজ বেঁচে নেই—আত্মহত্যা করেছে। কাজেই সে বেঁচে থাকতে চায়নি, দেখতে চায়নি সামনের দিকে প্রগতির সমা-রোহপূর্ণ অভিযান ! আর, তার মায়ের এখন কী অবস্থা ! হয়ত চুমো খাচ্ছে সিরেজার ছোট্ট মোমের মতো ফ্যাকাশে হাতটিতে ; অথবা, হয়ত ক্ষিদেয় কাঁদতে-থাকা শিশুদের জন্যে তৈরী করছে রাতের খাবার। শিশুরা নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে কাঁদছে, ছেঁড়া পুরোনো ময়লা পোশাকে

তাদের কী করুণই না দেখাচ্ছে ! হয়ত বা তাদের মা-ও বিছানায় পড়ে কাঁদছে—অবিশ্রান্ত অবিরল ধারায় কাঁদছে। নারী, ভাগ্যবতী নারী—যদি প্রাণ খুলে কাঁদতে পেরে থাকো। চোখের জলের সান্ত্বনার চেয়ে দুনিয়ায় কী আর এমন মধুর ?

॥ চার ॥

শেষ পর্যন্ত নাদিয়া তার বোনের বাড়ী এসে পেঁছিল এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল পাঁচতলায়। পাথরে-গড়া শুধু একটা সিঁড়ি, খুব খাড়া। সে এত তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এসেছে—ঠিক যেন দৌড়ে। তাই হাঁপাতে লাগল। ভিতরে যাবার আগে দম নেবার জন্যে দরজার বাইরে থামল। গভীরভাবে শ্বাস পড়ছিল, দস্তানা-পরা হাতখানা বাড়িয়ে সে কাছের একটা থাম ধরে দাঁড়াল।

দরজাটা মোটা চট দিয়ে ছাওয়া, তার উপরে অয়েলক্লথ ঝুলানো, এবং এই অয়েলক্লথেরি কালো কালো সরু সরু ফালি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে একটা ক্রুশ-চিহ্ন—কিছুটা সাজানোর ভঙ্গীতে, কিছুটা ধর্মবিশ্বাস-যোগে। একটা ফালির অর্ধেকটা ছিঁড়ে ঝুলে আছে নিচে এবং তার পিছনে অয়েলক্লথের একটা গর্তের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আছে ময়লা চটটা। কি জানি কী কারণে, এই দৃশ্যটা হঠাৎ নাদিয়ার কাছে বড় করুণ, বড়ই মর্মান্তিক মনে হ'ল। তার ঘাড়টি কুঁচকে উঠে কেবল উপরে-নিচে ওঠানামা করতে লাগল এবং দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল উচ্ছ্বসিত ভাবে। গায়ে যেন তার একটুও আর শক্তি নেই। দরজার পাশে উঁচু সিঁড়িটায় বসে পড়ে সে কাঁদতে লাগল অঝোরে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুহাতে মুখ ঢেকে সেখানে সে বসে রইল একঠাঁয়ে ; উষ্ণ অশ্রুস্রোত বয়ে চলল তার দস্তানার গা বেয়ে।

সিঁড়িটা তখন অন্ধকার, খুব ঠাণ্ডা, কোথাও টুঁ শব্দটি নেই। সামনের দরজা গম্ভীর, এক বোবার মতো দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণ ধরে কেবল কাঁদল সে······তখন হঠাৎ সে শুনতে পেল একটি পরিচিত পায়ের হাল্কা শব্দ এবং প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে এবার যেন অনুভব করল—তার খোকন কাছে এসে দুটি হাত দিয়ে ধীরে ধীরে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে, গালটুকু চেপে রেখেছে তার গালে, তার নরম নরম ছোট ছোট আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে মায়ের মুখখানি ঢেকে-রাখা হাত দুটি।

এবার সে তার দুটি ওষ্ঠ মায়ের গালের উপরে রেখে ধীরে ধীরে বলল—'কাঁদছ কেন? তুমি তো কোনো অন্যায় করোনি!'

নীরবে বসে বসে শুনতে লাগল নাদিয়া, একটু নড়তে বা চোখ খুলতে পর্যন্ত তার সাহস হ'ল না। কি জানি, তার খোকন যদি চলে যায়! নিজের ডান হাতটা সে হাঁটুর উপর এনে রাখল, কিন্তু তখনো বাঁ হাত দিয়ে চোখ ঢাকা। ক্রমে শান্ত হয়ে এল তার কান্না। তার—এই পাপিষ্ঠা নারীর কান্না দিয়ে সে তার খোকনকে ভয় লাগিয়ে দেবে না।

এবার খোকন তার গালে চুমো খেতে খেতে বলছিল—'কোনোই অন্যায় করোনি তুমি।'

তারপর আবারো সে বলতে লাগল, এখন তার গলায় যেন সেই সিরেজার কথা—'এ পৃথিবীতে বাঁচতে চাইনে আমি, মা! মাগো! সত্যি তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।'

আবারো—'সত্যিই মাগো, আমি একটুও বাঁচতে চাইনে।'

সিরেজা যখন এই কথাই বলেছে, তার কানে তা শুনিয়েছিল ভয়ানক—ভয়ানক, কারণ এমন একজনে তা বলেছিল—অদৃশ্য বিধাতার কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ একটি মানব-জীবন পাবার পর তাকে মহামূল্য রত্নের মতোই যার রক্ষা করা উচিত ছিল, স্বেচ্ছায় তা নষ্ট করা যার মোটেই উচিত হয়নি।

কিন্তু এখন, ওই কথাই এই পৃথিবীতে কোনোদিন-না-আসা শিশুর কাছ থেকে শুনে মায়ের বুক থেকে নেমে গেল ব্যাথার পাষাণ-ভার। ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে পৃথিবীর কণ্ঠস্বর শুনে সে যেন ভয় না পায়—এমনভাবে জিজ্ঞেস করল সে—'খোকন, আমাকে ক্ষমা করেছ, বলো?'

সে তখন উত্তর শুনতে পেল—'কোনোই অপরাধ করোনি। তবু যদি আমার কাছ থেকে শুনতে চাও তো বলছি—ক্ষমা করেছি তোমাকে।'

এবং হঠাৎ নাদিয়ার সমস্ত প্রাণ যেন ভরে উঠল এক নতুন সুখের শিহরণে। কোনো আশা করতেও সাহস হয় না, কী যে হবে কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না—এমন একটা বিমূঢ় অবস্থায় সে ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে বাড়িয়ে দিল দুখানি হাত, এবং অনুভব করল যে খোকন উঠে বসল তার হাঁটুর উপরে, তার ছোট্ট হাত দুটি রাখল তার কাঁধের উপরে,

দুটি ওষ্ঠ তার ওষ্ঠের উপরে এসে লেগে রইল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর একটি মধুর চুম্বনে।

নাদিয়ার চোখ তখনো নিবিড় ভাবে বোঁজা; কারণ, পৃথিবীর মানুষের ভাগ্যে যা দেখবার নয়—সেদিকে তাকাতে কেমন ভয় লাগছিল তার। তবু তখনো যেন মনে হচ্ছিল শিশুর চোখদুটি মায়ের দুটি চোখে তাকিয়ে আছে অপলক ভাবে, তার মৃদু নিশ্বাস মায়ের সমস্ত গায়ে লাগছে আশীর্বাদের মতো—এবং খোকন তার মায়ের উপরে আলো হয়ে রয়েছে পূর্ণচাঁদের মতো।

তারপর, ছোট্ট বাহু দুটি যেন তার গলা থেকে খুলে গেল, সিঁড়ি-পথে শুনতে পেল সে ছোট্ট দুটি পায়ের হাল্কা শব্দ। বুঝল, চলে গেছে তার খোকন।

এবার সে উঠে দাঁড়াল, চোখের জল মুছে নিয়ে কলিং-বেল্ টিপল। সে যখন ভিতরে তার বোনের কাছে এল,—তার মুখে তখন প্রশান্ত, মনে মনে সুখী সে। তার মধ্যে আবার যেন ফিরে এসেছে বল-ভরসা জোগাবার শক্তি।

প্রেম-সমস্যা

'বায়ু বহে অন্ধবেগে, সঙ্কট-পিচ্ছল সব পথ,
তুমি যে রয়েছ পাশে মনে আসে দূর স্বপ্নবৎ !
হাত রাখি হাতে,
দিকচক্র দ্বিধা হয় তীক্ষ্ণধার বিদ্যুতের ঘাতে ;
সে আলোতে চাহিয়া চমকি'
হেরি কার অসি-ফলা দুজনার মাঝে দোলে, সখি !"

প্রেম পরিণয় এবং

গাস্তাফ্ ফক্ তরুণ যুবক। তরুণী লুইর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে সে লুইর বাবার কাছে উপস্থিত। শুরুতেই বুড়ো তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার আয় কত?'

'আয় শ'খানেকের মতো হবে।'

'মাসে একশো টাকার বেশী নয়?'

'কিন্তু লুই যদি—'

লুইর কথায় বাধা দিয়ে ভাবী-শ্বশুর বলে উঠলেন—'ওর কথা ছেড়ে দাও, তোমার আয় যথেষ্ট নয়।'

'আমি আর লুই এ-ওকে প্রাণের মতো ভালোবাসি। আমরা এক হয়ে নিশ্চিন্তেই থাকতে পারব।'

'তা হতে পারে। তবে আরো কিছু তোমায় জিজ্ঞেস করব। বছরে বারো-শো টাকাই কি তোমার একমাত্র আয়?'

'আমাদের প্রথম দেখাশোনা হয় লিডিং-এ…'

লুইর বাবা বললেন—'সরকারী চাকরি ছাড়া অন্য কোনো আয়ের পথ আছে?'—সহজে ছাড়াবার পাত্র নন তিনি।

'হ্যাঁ, তা আশা করি আমরা একত্রে প্রচুর আয় করতে পারব। তাছাড়া, বুঝতেই তো পারছেন আমাদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট ভালোবাসা আছে।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু একটু বেশী আয়েরও তো দরকার।'

অধৈর্য যুবক বলল—'আমি উপরি-কাজ করেও বেশ-কিছু আয় করতে পারি।'

'কি কাজ ক'রে? কত আয় করতে পার?'

'আমি ফরাসী পড়াতে পারি। আর ঐ ভাষা থেকে অনুবাদ করতেও পারি। এ সব থেকে কিছু আয় হতে পারে।'

হাতে পেনসিল ঘোরাতে ঘোরাতে বুড়ো জিজ্ঞেস করলেন—'কি-কি অনুবাদ করেছ?'

'এখন আমি একটী ফরাসী বই অনুবাদ করছি, এক-এক পরিচ্ছেদ দশ টাকা ক'রে।'

'সব সমেত কয়টি পরিচ্ছেদ আছে ?'

'প্রায় চব্বিশটি আছে বলেই মনে হচ্ছে।'

'বেশ, এতে তো দুশো চল্লিশ টাকা পাবে। আর কিসে কত পেতে পারো ?'

'তা বলতে পারছি না, সবি কিছুটা অনিশ্চিত।'

'আয়েরি নিশ্চয়তা নেই, অথচ বিয়ে করতে চলেছ। ওহে তরুণ যুবক ! বিয়েটা অমন মজার জিনিষ নয়, ছেলেপিলে হবে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া সমস্তই তো লাগবে। একথা কি ভেবে দেখেছ একবারো ?'

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে ফক্ বলে উঠল—'ছেলেপুলে হতে সে আমাদের ঢের দেরী আছে, তাছাড়া আমাদের মধ্যে এত ভালোবাসা যে—'

লুইর বাবা বলে যেতে লাগলেন—'কবে ছেলেপুলে হবে আগে থেকেই বলে দিচ্ছ যে ! যাক্, তোমরা দুটিতেই দেখছি বিয়ের জন্যে প্রস্তুত। দুজনেই দুজনকে প্রাণের মতো ভালোবাসো। কাজেই এই বিয়েতে আমারো নিশ্চয়ই মত দেওয়া উচিত। শোনো, বিয়ের কথা মনে রেখে সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রো, আর আয় যাতে বাড়ে সেই চেষ্টা ক'রো।'

বিয়ের অনুমতি পেয়ে তরুণ ফক্ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রণাম করল বুড়োকে। লুই আর ফক্ দুজনের সে কি অপার আনন্দ ! হাত ধরাধরি করে তারা বেড়াতে বেরোলো।

সন্ধ্যেবেলা ফক্ তার প্রুফের কাগজপত্র নিয়ে হাজির হ'ল লুই-র বাড়ীতে, শ্বশুরমশাই দেখে হয়ত খুশী হতে পারেন। সত্যিই, শ্বশুর-মশাই দেখে খুশী হলেন। দুজনে একটু আমোদ আহ্লাদ করবার জন্যে থিয়েটারে গেল, এতে তাদের খরচ হয়ে গেল দশ-দশ টাকা। বাড়ী ফিরল গাড়ী ক'রে। আরো কয়েক দিন বিকেলে পড়াতে না গিয়ে লুইকে নিয়ে বেড়াতে গেল ফক্। ঘনিয়ে এল বিয়ের দিন, থাকার ঘরটি এখন ভালো করে সাজানো গোছানো দরকার। সুন্দর নরম দুটি বিছানা কিনল, স্প্রীং-এর গদি কিনল। নরম তোষক কিনল। লুইর জন্যে নীল রংএর একখানা শালও কেনা হ'ল—তার সোনালী চুলের পাশে মানাবে ভালো। ফক্ তাদের ঘরটি এবার নানারকম আসবাবপত্রে সাজাতে লাগল, লাল রং-এর একটা আলোও কিনল। রান্নাঘর সাজাবার

ব্যাপারে লুই পেল তার মায়ের সাহায্য। খাবারের টেবিল, নানারকম সরঞ্জাম, কাঁটা-চামচ, কাপ-প্লেট কেনা হ'ল, আরো কত কি। ফক্ সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে রইল—কখনো বাড়ী খোঁজে, কখনো মিস্ত্রী ডাকে, কখনো বা চেক কাটে, সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখাশোনা করে।

আসলে, ফক্ কিন্তু উপরি-আয় কিছুই করতে পারেনি। তবে, তার আশা বিয়ের পর সবি ঠিক হয়ে যাবে, বুঝেসুঝে চললেই হবে। দোতলায় তারা একটি ছোট দেখে ফ্লাট ভাড়া করল। দুটি ঘর, একটি শোবার আর একটি রান্নার। তা, ছোট ঘরই সাজানো যায় বেশ ভালো ক'রে। ফ্লাটটির ভাড়া মাসে পঞ্চাশ টাকা। লুই বলছিল—তেতলায় তিনটি ঘর হ'লেই ভাল হ'ত। থাকার ঘরটি সাজানো হ'ল বেশ ভালোভাবেই। পাশাপাশি দুটো খাটে বিছানা করা হ'ল দুজনের,—যেন সে নবজীবনের জোয়ার-জলে পাল-তোলা দুটি পানসি! গাঢ় নীল রং-এর চাদরের উপর পাতা হ'ল দুধের মত শাদা বালিশ, ঢাকনাটায় আবার নানারূপ লতাপাতা-আঁকা সূচীকাজ। শোবার ঘরের মাঝখানে টাঙানো হ'ল সুন্দর একটি পর্দা, আর তার পাশেই রাখা হ'ল বারো-শ' টাকা দামের লুই-র সাধের পিয়ানোটি। সাজানো হ'ল মস্ত বড় লেখার টেবিলটা, ফ্রেমে বাঁধানো আয়নাটা, বইয়ের শেল্ফ।

তারপর তাদের বিয়ে হয়ে গেল এক শনিবারের সন্ধ্যায়। এবং রবিবারের সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত এই সুখী-দম্পতি ঘুমে বিভোর হয়ে রইল। ফক-ই ঘুম থেকে উঠল প্রথম। জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে ভোরের আলো, তবু সে জানলা খুলল না। নববধূটি তখনো নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, মুখে ফুটে রয়েছে তৃপ্তির আভা: সোনালি আলোর কোমল ঝিলিক লেগেছে ভেনাসের মূর্তিটির উপর।

ঢং ঢং করে খুশীভরে বেজে চলেছে গির্জার ঘণ্টা—উদ্‌যাপিত হচ্ছে যেন নর-নারীর সৃষ্টি-উৎসব। লুই পাশ ফিরে শুলো। ফক্ পর্দার ওধারে গিয়ে ঠিকঠাক করে নিল জামাকাপড়। লুই এবার উঠে বসল। এরপর ফক্ রান্নাঘরে গেল খাবারের কথা বলতে। নতুন বাসন-কোশন ঝকঝক করছে চারদিকে; আর সে সবি তাদের—তার আর লুইর! চাকরকে পাঠাল সে রেস্তোরাঁ থেকে ভালো ভালো খাবার আনবার জন্যে, রেস্তোরাঁর মালিককে বিস্তারিত বিবরণটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগের দিনই। তক্ষুনি সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ফক্ শোবার ঘরের দোরে এসে ঠক্ ঠক্ করে টোকা মেরে বলল,—'ভেতরে আসি ?'

'না গো, একটুখানি দাঁড়াও।'

তারপর ফক্ নিজেই টেবিল সাজাতে লাগল। টেবিলের উপর সাজানো হ'ল রেস্তোরাঁ থেকে আনা নানারকম খাবার। লুই তার কারুকাজ-করা সুন্দর শালটি গায়ে জড়িয়ে ঢুকল এসে ঘরে। ভোরের সোনার আলো অমনি তাকে যেন জড়িয়ে ধরল। লুইর শরীর একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এক গেলাস ওভালটিন পান করার পর বেশ সুস্থই বোধ করতে লগল। আচ্ছা, মা এখন দেখতে পেলে কি বলত ? কিন্তু বিয়ে হওয়ার সেই তো মজা, করো না যা খুশী ! কোনোদিকেই লুইর যাতে একটুও অসুবিধা না হয় স্বামী তাই দেখাশোনা করতে লাগল সবসময়ই। আজ তার কি আনন্দ ! বিয়ের আগে কতদিনই তো রেঁস্তোরায় কত ভালো ভালো খাবার সে খেয়েছে। কিন্তু সেদিন কতটুকু আনন্দ পেয়েছে ? একটুও না !—খেতে খেতেই বলছিল ফক্। সত্যি, টাকাই শুধু মানুষকে সুখী করতে পারে না। যারা বিয়ে করে না তারা কিন্তু ভয়ানক স্বার্থপর, সত্যিই তাদের উপর শুল্ক ধার্য করা উচিত। গেলাসে আরো খানিকটা সুরা ঢেলে নিয়ে বলল—'জীবনের জোয়ার-জলে এমনি ভাবে ভেসে চলায় কী যে আনন্দ ! সুন্দর, কী সুন্দর এ জীবন !'

লুই ভাবছিল—বিয়ে করতে পেলে তো করবে ?

ফক্ ভাবছিল টাকার অঙ্ক দিয়ে কি সুখের হিসাব হয় ? তা হয় না। ভাবনা কি, শিগগিরি কতো কাজ হাতে আসবে। তখন সব জলের মতো সহজ হয়ে যাবে। এখন তো আরাম করে খাওয়া যাক। নববধূটি কিন্তু শঙ্কিত হয়ে উঠল। ভয়ে ভয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করল—'এমনি-ধারা কি চালাতে পারবে ?'

সন্ধ্যা ছ'টায় একটা ঘোড়ার গাড়ী এসে দাঁড়াল দরজায়, নব-দম্পতি বেরিয়ে পড়ল বেড়াতে। কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে আজ লুইকে ! বাগানে তারা বেড়াতে লাগল—কখনো পায়ে হেঁটে কখনো বা গাড়ীতে। পার্কের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ী। লুই হেলান দিয়ে বসে, দেখে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। পথে পথে পরিচত বন্ধু-বান্ধবেরা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। নিশ্চয়ই ঈর্ষা হচ্ছে তাদের, বেচারীরা হেঁটে যাচ্ছে ! সত্যিই নরম গদিতে হেলান দিয়ে বেড়ানো—সে কি আরাম ! সুখী দাম্পত্য

জীবনের এই তো স্বরূপ! বাড়ী ফিরল তারা অনেক রাতে। নিজেদের ঘরে এবার শুয়ে পড়ল আরাম ক'রে।

প্রথম মাসটা কেটে গেল অবিরাম আনন্দে—নাচ-গানে, খাওয়া-দাওয়ায়, থিয়েটার-জলসায়। তবু ঘরে থাকার সময়টুকুতেই সুখ যেন কানায় ভরে ওঠে!

মাস খানেক পরে লুইর শরীর কেমন যেন খারাপ লাগতে লাগল। তার কি সর্দি লেগেছে, না খাবারের সঙ্গে কোনো খারাপ জিনিষ পেটে গেছে? ডাক্তার ডাকা হ'ল। সব দেখে-শুনে ডাক্তার হেসে বললেন—'সবি ঠিক আছে!' ফকু ভাবল, এ কেমন ডাক্তার! বাসন-কোশনে নিশ্চয়ই কোনো বিষাক্ত ধাতু আছে। একজন রাসায়নিককে ডেকে সযত্নে সব পরীক্ষা করানো হ'ল। না, অমন-কিছু একেবারেই নেই। ফকু নিজেই হাতের কাছের ডাক্তারি বইগুলো উলটে পালটে স্ত্রীর রোগ ঠিক করতে লাগল। এবার লুই খুব সাবধান মতো চলতে লাগল—গরম জলে হাত পা ধোয়, স্নান করে গরম জলে।

মাসখানেকের ভিতর লুইর চেহারা ফিরে গেল। তারপর হঠাৎ তার রোগ ধরা পড়ল স্পষ্টভাবেই। অবিশ্যি এত তাড়াতাড়িই আশা করেনি,—লুই আর ফকু বুঝতে পারল যে তারা মা-বাপ হতে চলেছে। সত্যি কি মজার! তা, ছেলেই হবে। একটা নামও তো ভেবে রাখা দরকার। লুই এদিকে ফকুকে একপাশে ডেকে নিয়ে স্মরণ করিয়ে দিল—বিয়ের পর থেকে এক পয়সাও তার উপরি-আয় হয়নি এবং এভাবে টানাটানিতে চলা দায় হবে। অবশ্যি, তারা একটু ডান-হাতে বাঁ-হাতে খরচ করেছে ঠিকই। এবারে হাল ফেরানো দরকার, তাহ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরের দিন ফকু তার এক ব্যারিস্টার বন্ধুর কাছে গেল কিছু টাকা ধার চাইতে। সমস্ত কথাই সে খুলে বলল বন্ধুব কাছে। বন্ধু উত্তর দিল—'সবি বুঝলাম, বিয়ে করা আর একপাল কাচ্চা-বাচ্চার ঠেলা সামলানোর অর্থ—টাকার শ্রাদ্ধ! যত্তো সব!'

এ-কথার পরেও আবার টাকা চাইতে ফকু লজ্জায় মরে যেতে লাগল। সে বাড়ী ফিরল খালি হাতে। ঘরে পা দিতে না দিতেই শুনল দু'জন ভদ্রলোক তার খোঁজে এসেছিল। ফকের মনে হ'ল নিশ্চয় সৈন্যবিভাগের তার সেই লেফ্‌টেনেণ্ট বন্ধুরা। কিন্তু, সে শুনল যে তারা মোটেই লেফ্‌টেনেণ্টের মতো দেখতে নয়, বয়স্ক লোক। তা হ'লে, তারা নিশ্চয়ই

কোনো পরিচিত ভদ্রলোক, তার বিয়ের কথা শুনে বোধ হয় দেখতে এসেছে। চাকরটা বলল—'বন্ধু হবে না,—হাতে লাঠি ছিল!' তাহ'লে ব্যাপারটা তো সুবিধে মনে হচ্ছে না। যাক্, দরকার থাকলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

এরপর ফক্ বাজারে বেরোলো, ধার করে ডজন খানেক আপেল কিনে বাড়ী ফিরল—শস্তা দামেই অবিশ্যি! গিন্নিকে বিজয়-গর্বে এসে বলল—'দেখো, কি চমৎকার সব জিনিষ এনেছি! অকালের জিনিষ অথচ কি শস্তা, মাত্র আড়াই টাকা!'

'আড়াই টাকা! এমন করলে সামলানো যাবে কি ক'রে!'

'ভাবনা কি, উপরি-কাজও জুটে যাবে!'

'কিন্তু ধারের কি হবে?'

'ধার? বাঃ, একটা মোটা-রকম ধার করে সবটাই মিটিয়ে ফেলছি!'

লুই শুনে যেন আঁৎকে উঠল—'তার অর্থ, নতুন করে ধার করতে চলেছ?'

'হ'লই বা, নিশ্চিন্তে থাকা যাবে তো! তা, এ রকম অপ্রীতিকর কথা কেন আলোচনা করছ? কী চমৎকার বড় বড় আপেল, দেখোই না চেয়ে! আপেলের পরে এক গেলাস সুরা খেলে কেমন হবে বলো তো?' চাকরটাকে পাঠানো হ'ল এক বোতল সুরা আনতে,—অবিশ্যি সেরা দেখেই!

বিকেল বেলা ঘুম থেকে উঠে লুই নরম সুরেই ধারের কথাটা তুলল। সে ভাবল, এরকম কথা শুনে স্বামী কক্ষনো আর রাগ করবে না। লুই তো আর ঘর-সংসারের জন্যে টাকা চাইছে না। মুদীর দোকানের টাকাটা দেওয়া হয়নি, মাংসের দোকানের লোকটাও পাওনার জন্যে শাসিয়েছে, চাকরটাও তার মাইনের জন্যে তাগাদা দিচ্ছে বারবার।

ফক্ বলল—'ফর্দে আর কিছু নেই? তাদের টাকা তো এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি, এই কালকেই,—পাই পয়সাটি পর্যন্ত। তার চেয়ে অন্যকথা ভাবা যাক না! একটুখানি বেড়িয়ে আসবে পার্কে? গাড়ীতে যাবে না তো? বেশ, ট্রামেই চলো, সোজাই পার্ক পর্যন্ত যাওয়া যাবে।'

গেল তারা পার্কে, তারপর ঢুকল একটা রেস্তোরাঁয়। দুজনে নিরালা একটা ঘরে বসে খেতে লাগল পেট ভরে। বেশ মজা, কারণ খাবার হলঘরে সবাই ভাবছে—নিশ্চয়ই এরা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছে! ফকের

কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে, কি আরাম ! কিন্তু লুইকে কেমন একটু বিষণ্ন দেখাচ্ছে, বিশেষ করে টাকার বিলের চেহারা দেখার পর !

কয়েক মাস কেটে গেল। এবার আয়োজনের পালা—দোলনা চাই, খোকনের জামা-টুপি চাই, আরো কত কি চাই।

আয়টা বাড়ানো ফকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল, অথচ মুদী ও মাংসওয়ালা আর বাকী ফেলে রাখতে রাজি নয় ; তাদেরো তো ছেলে-বউকে খাওয়াতে পরাতে হয় ! বাস্তবতার কি নিষ্ঠুর রূপ !

দেখতে দেখতে হাজির হ'ল এসে সেই বিশেষ দিনটি। ফককে তাহ'লে একটা ধাই ডেকে আনতে হয়। তারপর নবজাত মেয়েকে কোলে নিয়েই ফককে ছুটে যেতে হয় পাওনাদারদের ঠাণ্ডা করতে ! এবার তার মাথায় চেপে বসল নতুন ধরণের দায়িত্ব এবং এর চাপে সে যেন গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। অনুবাদ করে সে কিছু টাকা পেয়েছে বটে ; কিন্তু ঘন্টায় ঘন্টায় যখন-তখন তাকে বাইরে যেতে হ'লে কি করেই বা সে কাজে হাত দিতে পারে !

এহেন মানসিক অবস্থায় সে বাধ্য হয়ে শ্বশুরের কাছেই কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। বুড়োর ব্যবহারে ফুটে উঠল নির্মম অবহেলা—

'এই শেষবার, আর নয় ! ঘরে তো টাকার পাহাড় জমিয়ে রাখিনি, তা ছাড়া তুমি তো আর একা নও !'

প্রসূতির জন্যে এটা সেটা নানারকম জিনিষ, মুরগীর ঝোল, দামী ব্রাণ্ডি, একটা টনিক খাবার—সব যোগাড় রাখা চাই। ধাইকেও তার পাওয়ানাটা নগদ নগদ দিতে হবে।

ফকের স্ত্রী কিন্তু শিগগির বেশ সুস্থ হয়ে উঠল—এখন একটি তন্বী কুমারীর মতোই সুন্দরী। গায়ের টুকটুকে রঙ যেন ফুটে বেরোতে লাগল। আগের পোশাকগুলো গায়ে বেশ এঁটে পড়ল !

লুইর বাবা বেশ গম্ভীরভাবেই জামাইকে বললেন—'যথেষ্ট হয়েছে বাপু, বাচ্চা-কাচ্চা আর নয়—যদি বাঁচতে চাও !'

এরপরে কিছুদিন ফকের পরিবারটি দিন কাটাতে লাগল ভরা-ভালো-বাসায় আর ভরা ঋণের মধ্যে। তারপর একদিন তাদের দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাবার জোগাড় হ'ল। বেদখল হতে চলল ঘরের সব জিনিষপত্র ; আসতে হ'ল আবার সেই বুড়োকেই। সে এসে নিজের মেয়েকে আর নাতনীটিকে গাড়ী করে নিয়ে চলল নিজের বাড়ী। যাবার সময় বুড়ো

মনে মনে একটু মন্তব্য করল—বছর খানেক আগে এক তরুণ যুবকের সঙ্গে মেয়েকে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন, আর আজ তিনি নিজেই কিনা তাকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন অপমানিত অনাদৃত অবস্থায়। লুইর একান্ত ইচ্ছা ছিল ফকের কাছেই থাকে—কিন্তু কোথায়ই বা থাকবে! কি খেয়েই বা বাঁচবে! তাই ফক্ পড়ে রইল একা! চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল লাঠি-হাতে সেই পাওনাদারের দল কেমন করে লুটে নিচ্ছে তার সুখের সংসারটি!

বাসন-কোশন, বিছানা-পত্র, নানা আসবাব, পিয়ানো—কিছুই বাদ পড়ল না। খাঁ খাঁ করতে লাগল ফকের সাধের সংসার!

এবার শুরু হ'ল ফকের সত্যিকার জীবন। সে কাজ নিল একটা পত্রিকা-অফিসে। খুব ভোরে বেরোয় সেই পত্রিকাটি, কাজেই সমস্ত রাত জেগে তাকে লেখাপড়ার কাজ করতে হয়। তার দেউলিয়া অবস্থার কথা অবিশ্যি প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হয়নি। কাজেই সরকারী চাকরিটি টি'কে গেল, তবে উচ্চপদ লাভের আশা আর রইল না। তবে শ্বশুর-মশাই একটু অনুগ্রহ দেখালেন—প্রত্যেক রোববার বউ আর মেয়ের সঙ্গে দেখা করার অনুমতিটা দিলেন ফককে। তারপর সন্ধ্যে হতেই ফক্ রওনা হ'ত পত্রিকা-অফিসে, লুইয়েরা তাকে এগিয়ে দিত সদর গেট পর্যন্ত। বিদায় নেবার সময় ফকের সমস্ত অন্তর যেন এতটুকু হয়ে যেত নিদারুণ লজ্জায়!

সমস্ত ধার পরিশোধ করতে ফকের হয়ত কুড়ি বছরই লেগে যাবে। আর তারপর? তারপর আর কি! স্ত্রীকে আর মেয়েকে সে ভরণ-পোষণ করতে পারবে? সম্ভবত পারবে না। ইতিমধ্যেই যদি শ্বশুর-মশাই মারা যান তো দাঁড়াবারো ঠাঁই থাকবে না।

এই দুনিয়ায় মানুষে যে খেয়ে-পরে আরামে থাকতে পায় না—এ কী লজ্জা, কী নিদারুণ লজ্জা!

একটি কথায়

গীতিকার জেনেত্‌কে কে না চেনে? নিজে সে গরীব বটে, তবে তার গান সমাদরে স্থান পেয়েছে ছোটখাট এক থিয়েটারে। জেনেতের গায়ের ও চুলের রঙ আজকাল ফ্যাকাশে হয়েছে বটে—ডাক্তারদের মতে সে রক্তহীনতায় ভুগছে বটে, তবুও একথা সত্যি যে এই জেনেত্‌ই একমাস আগে ছিল সুখী স্বাস্থ্যবান এক প্রেমিক পুরুষ। লোকের মুখে মুখে ছিল তার গান। আর, এই গানের চেয়েও দুর্লভ একটি রত্ন ছিল তার—ছিল একটি অনুগত স্ত্রী। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। কিভাবে যে তার জীবনে দুর্ভাগ্যের যবনিকা নেমে এল সেই ঘটনাটাই শুনুন তবে :

জেনেতের স্ত্রী কলেত্‌ ছিল সত্যিকারের গুণী মেয়ে। সে নিজে জানত যে তার স্বামীও একজন যথার্থ প্রতিভাবান ব্যক্তি। কলেতের ঝি-চাকর লাগত না, নিজের হাতেই ঘষামাজা করত ফিটফাট রাখত ঘর, যৎসামান্য আয় থেকেই বাঁচিয়ে রাখত কিছু-কিছু, নানা জাতের উদ্ভট উপাদান দিয়ে রান্না করত উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী। সব সময়েই সে যেন বিনয়ে মাটির সঙ্গে মিশে থাকত। মিষ্টি ছিল তার ব্যবহার। খুব হাসিখুশি। পিয়ানোতে বাজাত সে জেনেতের গান—স্বামীর যতবার খুশি। মাংস সুস্বাদু করবার জন্যে যেসব মাল-মশলা কলেত্‌ ব্যবহার করত—তা শুধু রাজ-রাজড়াদের রান্নাঘরেই শোভা পেতে পারে! তার স্বর্গীয় সুবাসে মাতোয়ারা হয়ে উঠত দিগ্‌বিদিক। অথচ, সবকিছুই কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের হাতেই তৈরী করা! মাথা-ফাটা রোদ মাথায় করেও সে দূরের বাজারে যেত—মধ্যে মধ্যে সেখানে জলের দরে গল্‌দা-চিংড়ি পাওয়া যে! এমন স্ত্রী-রত্ন পেয়ে জেনেতের সুখ আর ধরে না। বুকভরা ভালোবাসা আর পেটভরা খাবারের মহিমায় জেনেত্‌ হয়ে উঠল ছোটখাট এক রাজার মতোই সুখী!

তাহ'লে, ঠিক পাঁচ মিনিটের ভিতরেই কি উল্‌টে গেল সব? হ্যাঁ, তাই বলতে যাচ্ছি আপনাদের :

সেই ছোটখাট থিয়েটারটির প্রাধানা গায়িকা ছিল তরুণী তাতা।

সম্প্রতি সে জেনেতের একখানা গান গেয়ে বিশেষ সম্মান অর্জন করেছে। গানখানা হ'ল—

'ভাই আমার বাজায় বাঁশী,
পুঁ পুঁ পুঁ !'

তাই তাতা আজ আবার জেনেতকে অনুরোধ করতে এসেছে আর একখানা গান লিখে দিতে,—যেটা ঠিক 'ভাই আমার বাজায় বাঁশী পুঁ পুঁ পুঁ' হবে না, অথচ তাই হবে। আমাদের জেনেতের আবার এই ধরণের গান রচনার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তরকারী কুটতে কুটতে কলেত্ গিয়ে বাইরের দরজাটা খুলে দিল।

'ভিতরে নিয়ে চলো।'—তাতা তার ঝলমলানো পোশাকটায় একটা দোলা দিয়ে বলে। কলেত্ কোনোদিনই ঢং দেখাতে জানে না,—তাই নীরবেই ঘরে নিয়ে এল তাতাকে।

তাতা জেনেতের চোখ ঘুলিয়ে দিতে লাগল নানা ছলাকলা দেখিয়ে। হঠাৎ এদিকে ঝমঝম করে নেমে এল জল। আর সে কী মুশল-ধারা ! তার ফলে কারো হয় পৌষমাস, কারো সর্বনাশ !

'এখন উপায় ? বাব্বাঃ, যা ঝড়-বৃষ্টি, ভাসবে যে সৃষ্টি।'—বলে তাতা—'দেখুন, আপনাদের ঝিটিকে দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে এনে দেবেন ?'

এই সুযোগে জেনেত্ কিন্তু বেশ সাহসী—সাহসী না হ'লেও অন্তত সৎলোক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে পারত, বললেই পারত,—'ঝি তো নেই আমাদের, উনিই আমার স্ত্রী!' কিন্তু সে হ'ল কাপুরুষ, তাই উত্তর দিল—'হ্যাঁ, এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি !'

মাথা চুলকোতে চুলকাতে এল সে রান্নাঘরে। কলেত্ সেখানে বসে পাকা গৃহিণীর মতোই তরকারী কুটছিল একমনে। সত্যিই সে আদর্শ ঘরণী !

'তাতা দেবী পরে এসেছেন দামী সাটিনের গাউন, আর দামী চামড়ার জুতো ! এদিকে যা বৃষ্টি ! তুমি যদি একটিবার উঠে গিয়ে—'

'উঠে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনি ?'—কলেত্ স্বামীর উপরে এমন এক দৃষ্টিবাণ হানল যে ভদ্রলোকের তাতেই কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটা উচিত ছিল—'গাড়ী ডেকে আনব ? না, আমার দ্বারা তা হবে না !'

কলেতের জুতো ছিল একজোড়া মাত্র এবং তাই ভিজিয়ে ভিজিয়েই

সে অবিশ্যি বাইরে গেল। এই কষ্টটুকু স্বীকার করবার জন্যে তাতা একটা সিকি তার হাতে দিলে কলেত্‌ তাও নীরবেই নিল হাত পেতে। কিন্তু এরপর থেকেই জেনেত্‌ প্রতিদিন তাদের নিজেদের ঘরের ভিতরেই দর্শন করতে লাগল বিভিন্ন অঙ্কের অভিনয়। অবিশ্যি—মূক অভিনয়।

ঘরে-তৈরী ঘিয়ের বদলে আসে আজকাল দোকানের ঘি। দুপুরে খেতে বসলে টেবিলের উপরে থাকে কাবাবের নতুন মোড়ক। কলেত্‌ আগে ঘুম থেকে উঠত মোরগ-ডাকা ভোরে। আর, এখন তাকে বেলা দশটায়ও ঠেলে তোলা যায় না, তখনো সে বিড়বিড় করতে থাকে—'আগে ভোর হ'ক!' যে ঘর আগে এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, যে ঘরের মেঝেতে শত চেষ্টা করেও একটি ধূলিকণা খুঁজে বার করা যেত না—সেই ঘরই হয়ে উঠেছে আজ লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মতো। আলনায় আলমারীতে ঘড়িতে জমে উঠেছে ধুলো আর ঝুল। সার্টে-কোটে বোতামের পাত্তা নেই, মোজা ছেঁদায় ছেঁদায় ঝাঁঝরা। আর, কলেত্‌ আজকাল তার স্বামীর গানের বদলে বাজায় বাইরের গান।

কলেত্‌ আজকাল হয়ে উঠেছে বড্ড খিটখিটে। কাজ করতে গেলেই শব্দ হয় দুড়ুম্‌ দড়াম্‌। পিয়ানোতেও বাজে কেমন বেসুর! জেনেত্‌ হতাশায় মাথা নাড়ে আর বলে—'ওঃ, গানের চোটে মাথাই ধরে এল যে?' কলেত্‌ কিন্তু মিষ্টি সুরেই জবাব দেয়—'তবে ঘোড়ার গাড়ীটি ডেকে এনেছিলাম আমিই!' এবং এই শব্দ কয়টিই হয়ে ওঠে সমস্ত কথার একমাত্র ধুয়ো।

'কলেত্‌, ঝোলটা যে একেবারেই বরফ হয়ে আছে!'

'হ্যাঁ, তবে ঘোড়ার গাড়ীটি ডেকে এনেছিলাম আমিই।'

'সার্টে একটা বোতামও দেখছি না যে!'

'তবে ঘোড়ার গাড়ীটি ডেকে এনেছিলাম আমিই!'

'কলেত্‌, তুমি আমাকে ভালোবাসো না—তুমি তো আর আমাকে আদর করো না, চুমো খাও না!'

'না, তবে ঘোড়ার গাড়ীটি ডেকে এনেছিলাম আমিই!'

দাম্পত্য-কলহ

মাদাম প্রিসি তার স্বামীকে বলল—'ব্যাপার কি জানতে চাও? কয়েক মুহূর্ত আমার কথা মন দিয়ে শোনো আগে, এক্ষুনি বলছি সব।'

গম্ভীর কণ্ঠে স্বামী উত্তর দিলেন—'শুধু মন দিয়ে কেন, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই শুনছি।'

'তাহ'লে ব্যাপারটা হচ্ছে'—স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে ওঠে—'তোমার আমার মিলিত জীবন সত্যিই অসহ্য হয়ে উঠেছে, সত্যিই বলছি এ আর আমি বেশীদিন সইতে পারব না। অবিশ্যি, তোমাকে আমি ভদ্রলোক বলেই জানি, বিশ্বাসও করি বিশ্বস্ত স্বামী ব'লে; আমার দিক থেকেও ভুলিনি বিয়ের পবিত্র সম্বন্ধের কথা। এ বিষয়ে অবিশ্যি আমরা দুজনেই একমত। কিন্তু বিপদের কথা হ'ল আমাদের দুজনের মধ্যে রয়েছে বিষম অমিল। তুমি যা বলো বা করো তা আমি একদম সহ্য করতে পারি না; আর, আমার কথা শুনে তোমারো গা জ্বালা করে। আবার, তোমার হাসি দেখেও আমার রাগ হয়—এমনকি যখন মুখ বুঁজে থাকি তখনো আমরা দুজনে দুজনকে খোঁচাতে থাকি। একেবারে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বেঁধে যায় তুমুল কাণ্ড—এই যেমন টুপিটা জামাটা নিয়ে; ছড়ি নিয়ে বেড়াতে যাওয়া ভালো, না ছাতা নিয়ে; মাংসটা বেশী সেদ্ধ হয়েছে, না হয়নি—তা নিয়ে। এক কথায় সব কিছু নিয়েই! নির্বিচারে সর্ববিষয় নিয়েই আমাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাধে। তারপর, তুমি দিনরাত এত বকবক করো যে আমি একটা কথাও বলতে পারি না, নয়তো ভূতের মতো বসে থাকো। অথচ তুমি খুশী থাকলে আমারও খুশী হবার কথা, আমার দুঃখে তোমারো দুঃখিত হওয়া উচিত। মেজাজ তোমার সব সময়েই বদলাচ্ছে; রুক্ষ আর কড়া মেজাজের লোক তুমি, সামান্য একটু মতের অমিলও সইতে পারো না। তোমার ভালো লাগে না এমন কোনো কথা যদি আমি বলতে শুরু করি তো কখনো তা শেষ করতে দাও না। আমার মতের ঠিক বিপক্ষে তুমি কোমর বেঁধে লাগো। তুমি বলো গান তুমি খুব ভালোবাসো, আর আমি রাজনীতির 'র'-ও বুঝি না। অথচ ঠিক তার উল্টোটাই হ'ল সত্যি! তুমি আমার ঝিকে বকুনির চোটে কাঁদিয়ে ছাড়ো, অথচ তোমার অপদার্থ চাকরটা আমার

ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে সুরার বোতলগুলি নামিয়ে খেয়ে খেয়ে রাখো। হাঁটুর উপরে তুলে আমার গাউন পরাটাও তুমি দুচোখে দেখতে পারো না। তারপর, আমাদের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে একবার ঝগড়া বাধলে তো আর রক্ষে নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে তার জের : শেষপর্যন্ত আমরা এমন সব মর্মঘাতী কথা দুজনে দুজনকে বলতে থাকি যা জীবনে কখনো ভোলা যায় না। এককথায়, আমার সব তোমার কাছে অপ্রীতিকর বলে মনে হয়। আমি সব বুঝি, সব জানি! তুমি আমার গলার স্বর, পায়ের শব্দ, কেশবিন্যাস, আমার চলাফেরা,—এককথায় আমার সবকিছুই ঘৃণার চোখে দেখো। না, কিছুই অস্বীকার করতে পারবে না। এই এখনি তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি পারো তো আমায় জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলো!'

মঁশিয়ে প্রিসি বললেন—'অতএব ?'

'অতএব, আমি ঠিক করেছি, এমন বিবাহিত জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতার ফর্দ আর না বাড়ানোই ভালো। হয়তো আমাদের এই বিফলতার জন্যে তুমি বা আমি কেউই দায়ী নই, কিংবা আমরা উভয়েই দায়ী। সে যাই হ'ক, ব্যাপারটা তো নির্মম সত্য। যে পর্যন্ত না আমরা আমাদের স্বভাব বদলাতে পারি ততদিন একসঙ্গে থাকার কোনো অর্থই হয় না; কেউই তাতে সুখী হতে পারব না। কাজেই, এখন আমাদের এই আপোষমূলক বিচ্ছেদকে কেউই আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ভাগ্যিস, আমাদের কোনো ছেলেপিলে নেই এবং দুজনের হাতেই যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে! কাজেই, আমি তো এর কোনো অর্থই খুঁজে পাই না—এমন অবস্থায়ও একসঙ্গে থাকতে হবে কেন, মারামারি ক'রেও! আমার পক্ষেও আলাদা থাকা ভালো, তোমার পক্ষেও। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি তুমি এতে ভালোই থাকবে, এবং সকালবেলায় দাড়ি কামাতে বসে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে আমাকে মনে পড়বে! আমার দিক থেকে তোমাকেও সবসময় বেশ সম্মানিত ভদ্রলোক বলেই মনে করব, একটু রুক্ষ-প্রকৃতির লোক বলে জানব। তবে এজন্যে আমি তোমার উপর রাগ করব না। যাক্, এ ব্যাপার নিয়ে বেশীদূর আর ঘাঁটাঘাটি করতে চাই না। তাহ'লে এখন নিজের ঘরে যাচ্ছি, কাল সকাল পর্যন্ত ভাবব—শুধু ভাবব কি করে আমরা আলাদা থাকতে পারি।'

মঁশিয়ে প্রিসি এই নিন্দা-ভৎর্সনার ঝড়-ঝাপটা সয়ে গেলেন নীরবে।

শুকিয়ে গেল তাঁর ঠোঁট, বার-দুই দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন—গভীর দীর্ঘশ্বাস, কথার মাঝখানে উঠে পড়ে পায়চারি শুরু করে দিলেন। স্ত্রীর কথা-বলা শেষ হ'লে তিনি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, মুখে যথাসম্ভব মর্যাদার ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে আহত এক বিষণ্ণ সুরে বললেন—'তোমার শেষ হ'ল ?'

'হ্যাঁ, আমার শেষ হয়েছে, সর্বদিক থেকেই শেষ হয়েছে !'

'বেশ, তাই হবে। গ্রন্থের সব অধ্যায়ই শেষ হবে। আশা করি আর খুলেও দেখতে,হবে না। তোমার যদি একান্তই সাধ হয়ে থাকে তো কালই আমরা আলাদা হয়ে যাব, উভয়েই নিরালা থাকতে চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, তাই করো।'

'ধন্যবাদ ! তবে আমি তোমাকে নিষেধ করছি একটা বিষয়ে—বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই।'

'সেকথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আমি চলে যাচ্ছি নিজেই নিজের কর্ত্রী হতে, নতুন কর্তা আর বরণ করব না। তুমি বেশ স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারবে। এদিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আবার বিয়ে করাটা আমার পক্ষে বোকামি। তা, তোমার কি আরো কিছু বলবার আছে ?'

'না, তবে আমরা যদি না জেনে-শুনে এই পথ নিই তাহ'লে কোথায় গিয়ে···'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। প্রথম শাস্তি, তারপর বার্ধক্য, শেষ পর্যন্ত কবর !'

'না, এ ঠাট্টার কথা হচ্ছে না, আমার বলাটা শেষ করতে দাও। আমরা যা-ইচ্ছে করব, তবে—তবে আমাদের এই মত-বিরোধের জন্যে পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল হবারো কোনো কারণ দেখি না। এই হ'ল আমার ধারণা। আশা করি, তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তবে মানুষ বেশী দিন বোকা হয়ে থাকতে পারে না।'

'ঠিক বলেছ, কিছু সময়ের জন্যে পারে। কিছুদিন পরে এ সমস্ত বাধা-বিপত্তির কিছুই থাকবে না। সংক্ষেপে আমার কথা হচ্ছে, বিবাহ-বিচ্ছেদে হাত দেবার আগে আমরা কিছুদিন সম্পূর্ণভাবে আলাদা থাকি না কেন ? এ রকম বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে আমাদের আচরণে বাইরের বন্ধুরাও কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।'

'তাহ'লে তোমার মতলবটা কি '

'কালই যখন যেতে চাও, কোনো বন্ধুর সাথে গাঁয়ে বা বিদেশে পাড়ি না জমিয়ে—খুব সম্ভব তুমি তাই ভেবে রেখেছ—বরং মিলানে যাও, সেখানে আমার বড় একটা বাড়ী আছে। দু'মাস কিংবা তারো বেশী যদি থাকতে ভালো লাগে তো সেখানে গিয়েই থাকতে পারবে। যে আমাকে মানুষ করেছে, আমার মা-বাবার সেই পুরানো গৃহকর্ত্রী মাদাম বেনার-ই আমাদের বাড়ী দেখাশোনা করছে। সে তোমায় সাদরে অভ্যর্থনা করে নেবে, আর তোমার সুখ-সুবিধের দিকেও সবসময় নজর রাখবে। তুমি তাকে জানিয়ে দিতে পারো যে আমিও পরে আসছি।'

'কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই ঠিক কথা নয়।'

'না, তবে তোমার বলাটাই বরং ভালো। বাড়ীটা বেশ সুন্দর, জমকালো বড় বাড়ী। শহর থেকে চার মাইলের বেশী নয়। প্যারিস থেকে ইংলণ্ড অনেক দূর, শুধু এই অজুহাতে তুমি কখনো আমাদের বাড়ী যেতে চাওনি,—কিন্তু ওই পরিবারের ওই জায়গায়ই তো আমার বাল্যজীবন কেটেছে। আমাদের বিচিত্র জীবন-অভিযানে এগোবার আগে এ সমস্ত দেখে নেবার এই তো সুবর্ণ সুযোগ ! এখন যদি তুমি এ সুযোগ হারাও, তবে কখনো আর এসব ফিরে পাবে না। তাহ'লে তোমার উপর এ বিষয়ে আস্থা রাখতে পারি ? তোমার মত আছে তো ?'

'তুমি বেশ ভদ্রভাবেই আমায় অনুরোধ করেছ, আমার এতে সম্পূর্ণ মত আছে। আমি মিলানেই যাব এবং দু'মাস সেখানে থাকব। মাদাম বেনারের কাছে একটা টেলিগ্রাম করে দিতে পারো।'

তারপর নিরুদ্বেগে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল।

'বিদায়—বিদায় !'

'হ্যাঁ—বিদায় !'

একটুও কেঁপে উঠল না তাদের গলার স্বর। না, একটুও নয়। কিন্তু তাদের বুকের ভিতরটা গুমরে উঠল চাপা ব্যথায়। তারা দু'জনেই আপনমনে ভাবতে লাগল : 'একি সত্যি ? তাহ'লে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে,—আর তা চিরদিনের জন্যেই !' 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাহ'লে এই শেষ দেখা !…বলো প্রিসি, শেষ পর্যন্ত এই দেখতে হ'ল !' 'না স্বামী, আমি তা নিশ্চয় করে বলতে পারি না।'

কিন্তু তার পরের দিন সত্যসত্যই চলে গেল মাদাম প্রিসি।

রৌদ্রোজ্জ্বল সুন্দর এক বসন্ত-প্রভাতে এই তরুণী মহিলাটি পৌঁছল গিয়ে মিলানে। সমুদ্রের ধারে মনোরম জায়গা। বসন্তের রাণী সেখানে যেন ছোট্ট শিশুটির মতোই এদিক-সেদিক ঘুরছে ফিরছে চঞ্চল চরণে। জায়গাটা বেশ নির্জন। চারিদিকে নানারকম গাছপালা। আকাশ যেন নেয়ে উঠেছে গাঢ় নীলে। নোনা হাওয়ায় আমেজ লাগে, চাঙ্গা হয়ে উঠে শরীর, গালে ফুটিয়ে তোলে গোলাপ, আর মনে শান্তি !

মাদাম প্রিসির জন্যে মাদাম বেনার তেতলায় প্রকান্ড একটা ঘর ঠিক করে রেখেছিল। রঙীন গালিচা পাতা হ'ল মেঝেতে, দেয়ালে ছবি।

একদিকের জানলা দিয়ে দেখা যায় সমতল প্রান্তর—মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপঝাড়। অন্যদিকে পাইন বন, হাওয়ায় হাওয়ার অবিরাম মর্মর-ধ্বনি।

মাদাম প্রিসি নিজের ঘরে এসে ট্রাঙ্ক খুলে সব সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিকঠাক হয়ে বসল। এবারে ভালো করে ভাববার সময় পেয়েছে। ব্যথাতুর মানুষ শান্তির আশায় প্রকৃতির কোলে পালিয়ে এলে প্রকৃতি তাকে সান্ত্বনা দেয় নানাভাবে। কেমন করে যেন জুড়িয়ে যায় সব ব্যথা, মন ভরে ওঠে নতুন আলোয় আর আনন্দে। প্রকৃতির সামঞ্জস্য ও শৃংখলা রক্ষা করে আমাদের জীবনকে, ঘটিয়ে তোলে আমাদের মন ও প্রাণের মিলন।

মাদাম প্রিসি ভাবছে। অনেক দিন হয় সে এমন গভীরভাবে ভেবে দেখেনি। একে একে সে পর্যালোচনা করে দেখতে লাগল তার অতীত জীবন। একদিন ছিল সে দোলনায়-দোলানো ছোট্ট শিশুটি, তারপর পুতুল-খেলা, গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা, ফ্রক ছেড়ে গাউন, বলনাচ, এবং তারপরেই বিবাহিত জীবন। তার জীবনে ঘটেনি কোনো রোমাঞ্চকর ঘটনা, বিস্ময়কর কিছুই ঘটেনি। এমনকি গল্প করার মতো একটু কিছুও নয়। খুব বড় কোনো আনন্দ-উৎসব বা কোনো বিপদের ঘনঘটাও আসেনি তার জীবনে। তবে হয়তো তেমন কিছু একটা ঘটতে পারে—এমন গোপন আশা বুকে নিয়ে সে শুতে গেছে রোজ রাতেই। ন-বছর ধরে বহুবার সূর্য উঠেছে তার বিবাহিত জীবনে, কিন্তু তার জীবনে তো নতুন কিছুই ঘটল না। ক্রমে ক্রমে সে আর তার স্বামী ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে—বোধ হয় তার স্বামীও হয়েছে, তবে সে তা স্বীকার করতে চায়নি ! জীবনের একঘেয়েমির মধ্যে হয়ে উঠেছি খিটখিটে। একঘেয়েমি,

সব বিষয়েই একঘেয়েমি—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘটনার একটানা স্রোত, যেন কোন অন্তহীন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত! ঋতুর পর ঋতু—সেই গ্রীষ্ম সেই বর্ষা—সেই আশা সেই নিরাশা! স্বামী অযোগ্য লোক নন,—শিক্ষিত সম্মানিত নামজাদা (সময় সময় দরদীও)—সত্যিই চমৎকার লোক,—কিন্তু তার সঙ্গে থাকা যে অসম্ভব! নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে দুঃখ করলেও, তার এই প্রস্ফুটিত যৌবনে অসুবিধেজনক অবস্থায় এখন সে একা পড়লেও,—বিয়ে করাটা আদতে ভুল হয়েছে বলে সে মনে করে না। সুখ সে আর পাবে না, শান্তিও না পেতে পারে—সবি একসঙ্গে পাওয়া যায় না। তাই মাদাম বেনারের সঙ্গে সে সবসময়ই খাপ খাইয়ে চলল। প্রকৃতি নাকি সবাইকে সমান করে দেয়—ছোটকে বড় করে, বড়কে ছোট। মাদাম প্রিসি আর মাদাম বেনারও শিগগির হয়ে উঠল বন্ধুর মতো।

একদিন মাদাম বেনার একে একে ঘুরে ঘুরে সব ঘর দেখাতে লাগল মাদাম প্রিসিকে। প্রথমে সে প্রকাণ্ড একটা হলঘরে গিয়ে ঢুকল তেতলায়।

'ম'শিয়ের বাল্যজীবনের সবকিছুই আমি তোমাকে এক এক করে দেখাতে চাই। ছেলেবেলায় ম'শিয়ে এই ঘরে খেলা করত, আমোদ-আহ্লাদ করত।'

তারপর সে একটি সিন্দুক খুলল: ঢোল ঢাক টিনের সৈনিক কত রকমের খেলনা! আঙুল দিয়ে সে একে একে দেখিয়ে দিতে লাগল—'ম'শিয়ের ছেলেবেলার খেলনা ছিল এইসব।'

তারপর হঠাৎ সে নাকভাঙা একটা পুতুল বা'র করল। বলল—'ম'শিয়ে এটাকে 'খেদী' বলে ডাকত আর আদর করতে করতে বলত, "এ আমার বউ হবে!" বেশ হাসির কথা কিন্তু! কিন্তু এখন সে আর নিশ্চয়ই একথা বলবে না। ভালো বউ-ই তো পেয়েছে।'

মাদাম প্রিসি জবাব দিল না। বেনার বলল—'এসব দেখে নিশ্চয়ই তোমার মন কেমন করে উঠছে, না?'

'সত্যি!'

তারপর তাকে নিয়ে ম'শিয়ে যে ঘরে ঘুমোত সে ঘরে গেল সেই বুড়ী ধাত্রী। মাঝে মাঝে সে ভুলে যেতে লাগল ম'শিয়ের কথা হচ্ছে, সে বলছিল 'লুই'! যে নাম ধরে মাদাম প্রিসি প্রায়ই স্বামীকে ডাকত, সেই নাম শুনে মাদাম প্রিসি যেন চমকে উঠল! হয়তো কখনো সে

আর এ নামে তাকে ডাকবে না ! তার পরের ঘরটাই ছিল তার স্বামীর পড়বার ঘর, আলমারিতে এখনো বোঝাই রয়েছে ইস্কুলের বই, কপি করার বই। শেষের একখানা বই মাদাম বেনার বার করে আনল এবং বেশ স্নেহভরে সেটা মাদাম প্রিসির হাতে দিয়ে বলল উঠল—'দেখো, ছেলেবেলাতেই মঁশিয়ে লিখত কী সুন্দর !' বড় বড় অক্ষরের একটা লেখা পড়ল—'এসো, আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি !'

তখন মাদাম প্রিসি বলে উঠল—'আমি এখন একটু খোলা হাওয়ায় যাব, শরীরটা কেমন যেন খারাপ লাগছে।'

তারা দরজা দিয়ে বাইরে এসে কিছুক্ষণ ধরে নীরবে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ালো। এল তারা প্রকাণ্ড একটা পুকুরের ধারে, জলে সাঁতার কাটছিল সুন্দর দুটি হাঁস। বেনার বলে উঠল—'মঁশিয়ে যখন ছোট ছিল, এই পুকুরে তার নৌকো থাকত। একদিন সন্ধ্যায় সে জলে ডুবে গিয়েছিল আর কি, সেদিনের কথা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না।'

কয়েক পা এগিয়ে তারা শেওলা-ধরা একটা বেঞ্চি দেখতে পেল তার দুদিকে প্রকাণ্ড দুটো মাটির পাত্র। সে বলল—'এই বেঞ্চিতে মঁশিয়ে বসে থাকত, কখনো বা পড়ত।'

তারপর তারা শাক-সব্জির বাগানে গিয়ে ঢুকল, কাঁটাতারে ঘেরা ছোট্ট একটা জায়গায় গিয়ে বেনার বলল—'ছেলেবেলায় এটা ছিল মঁশিয়ের বাগান।'

···বেনার এত স্পষ্ট করে মাদাম প্রিসির কাছে মঁশিয়ের ছেলেবেলার সব ছবি এক এক করে খুলে দেখাল—সে যেন স্পষ্টই দেখতে পেল ঃ ছোট্ট-লুই হাসছে, খেলা করছে, বই নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, সার্টপ্যান্ট পরে খালি-মাথায় ছুটোছুটি করছে বাগানে।

একদিন বিকেলে দুজনে খেতে বসেছে, বড় জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র, বেনার তখন খুব সহজভাবে মঁশিয়ের বাল্যজীবনের কথা বলতে শুরু করে দিল।

ধাত্রী বেনার বলছিল—'দেখো মাদাম, মঁশিয়ের মা-বাবা কেমন একটু অদ্ভুত ধরণের ছিলেন। তুমি তাঁদের কখনো দেখোনি, আমি কিন্তু তাদের বেশ ভালোভাবেই জানি।

'হ্যাঁ, কথাটা ভেবে দেখো, সত্যি করে তাঁরা কেউ কারুকে ভালোবাসতেন না, অথচ তেমন কোনো কারণও ছিল না। একসঙ্গে বেশীদিন

থাকতে পারতেন না, সামান্য কারণেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। ভেবে দেখো কি দুঃখের! লুইয়ের বাবা যদি প্যারীতে থাকতেন তো মা বেড়াতে চলে যেতেন অন্য জায়গায়, আবার মা ফিরে এলে বেরিয়ে পড়তেন বাবা। তাঁরা দুজনেই লুইকে ভালোবাসতেন, কিন্তু তাকে ঘিরে না থেকে বরং থাকতেন দূরে দূরেই। কাজেই তাকে এখানে আমার কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, মা-বাবা দুইয়ের অভাবই পূরণ করতে হ'ল আমাকে। এইভাবে আমার আপ্রাণ চেষ্টায় আমি তাকে মানুষ করে তুলি। ওর বাবা-মা কিছুদিন পর মারা যান, তাঁদের কোলেই যেন সে চিরদিন মানুষ হয়ে এসেছে—এইভাবেই সে কী কান্নাটাই না কাঁদল! কিন্তু এ কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমি মারা গেলে সে বোধহয় এত করুণভাবে কাঁদবে না।

'মাদাম, আমি তোমায় সবকথাই বললাম। কারণ আমার বিশ্বাস, সে বোধ হয় তোমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করে না। আর যদি কখনো বা গম্ভীর রুক্ষ বা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে তো তুমি ক্ষমা করতে পারবে। সেটা তার নিজের দোষ নয়, তার ছেলেবেলার সেইসব দিনের দোষ। একেলা অমন পরিত্যক্ত অবস্থায় না থাকলে বুঝি সে আলাদাভাবেই বড় হয়ে উঠত!'

আরো কত কথা কত কাহিনী বলতে বলতে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। দুজনের একজনেরও আলো জ্বালবার কথা মনে পড়ল না। ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক। তাই মাদাম বেনারের লক্ষ্য হ'ল না যে মাদাম প্রিসি তার অলক্ষ্যেই রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে নিচ্ছে বারবার। তারপর উঠবার সময় মাদাম প্রিসি বলল—'বেনার, আমার স্বামীর সম্বন্ধে তুমি যা-যা বললে সবি আমার খুব ভালো লাগছিল।' তারপর সে একান্ত আবেগ ভরে বৃদ্ধা ধাত্রীকে জড়িয়ে ধরল। বৃদ্ধা ধাত্রীটি কিন্তু মোটেই অবাক হ'ল না। মাদাম প্রিসি প্যারীতে ম'শিয়ের অফিসের ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে দিতে বললেও সে বিস্মিত হ'ল না। টেলিগ্রামে কি লেখা হয়েছিল জানি না, তবে সেই রাতেই টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল এবং পরের দিনই পেঁছিল এসে ম'শিয়ে প্রিসি।

জেনানা-মহল

আমি যা বলতে যাচ্ছি তা পুরুষদের উদ্দেশে চাটুবাক্য নিবেদন বলে মনে হবে। তবে আমার মনে হয় এর মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্য নারীদের সমস্যার কথাটা আপনারা নিশ্চয়ই ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। মেয়েলোক হ'লেও আমি লোক খারাপ নই, তাই আপনারা আমার গল্পটি আগাগোড়া মন দিয়ে শুনুন ঃ

আমার স্বামী সমরখন্দের একটি প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, আমি তখন খানের পাঁচজন বৈধ পত্নীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবার জন্যে আমন্ত্রিত হই। সেই খানের নামটি কিন্তু এখন আর আমার মনেই পড়ছে না। এমন কি আমি এটাও স্পষ্ট কি করে বলতে পারছি না—তিনি খান ছিলেন কিংবা অলঙ্কৃত করছিলেন অন্যকোনো পদ ; তিনি তুর্কীয় না কিরঘিজ, উজবেক না সংকর-জাতীয়···তাও মনে নেই। কত দূরদেশে ভ্রমণ করেছি, মানবজাতির কত বিভিন্ন শাখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, ছায়াছবির মতোই কত না দৃশ্য চলে গেছে দু' চোখের সামনে দিয়ে—আমার বুকে তার সবকিছুই জড়াজড়ি করে আছে কিনা !

খানের বয়স ছিল খুব কমপক্ষেও সত্তর বছর, চেহারাটি ছিল বেশ জাঁকাল, সুদীর্ঘ ছিল শুভ্র শ্মশ্রুরাজি, প্রকৃতি ছিল শান্ত-মধুর। তাঁর চেহারা দেখলে মনে পড়ত আরব্য-উপন্যাস বা অনুরূপ কোনো গ্রন্থের উজির-বাদশার কথা।

দস্যুবৃত্তির সাহায্যে এবং শান্তিপ্রিয় তুর্কী চাষীদের উপর জোর জবরদস্তি করে এই মর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তিটি সঞ্চয় করেছিলেন প্রচুর ধন-সম্পদ। পাহাড়ের খাড়ির ধারে শাদা রং-এর জমকালো তাঁবু খাটানো থাকত তাঁর জন্যে। শত শত ঘোড়া হাজার হাজার মেষ চরে বেড়াত আশেপাশে। সারাটা গ্রীষ্মকালই তিনি এখানে কাটাতেন, কিন্তু শীতটা কাটাতেন সমরখন্দের বাসভবনে, এবং সেখানেই তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে দেখা হয় আমার।

তাদের সংগে দেখা করবার অনুমতি দিতে অনেকদিন থেকেই খান সাহেব ইতস্তত করছিলেন। আমার স্বামী যদি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি না হতেন তো কিছুতেই অনুমতি পাওয়া যেত না। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল য়ুরোপীয় আধুনিকাদের সঙ্গে মিশলে তাঁর বেগমেরা নষ্ট হয়ে যাবে,

তাঁরা এদের মাথায় ঢুকিয়ে দেবে দুষ্টবুদ্ধি।

খানের বাসভবনটি ছিল খুব উঁচু এবং জমকালো। ঠিক দুর্গের মতোই। এটাই আগে ছিল উচ্চ-জাতীয় একটি শিক্ষাকেন্দ্র। লোকে তখন বলত—'মক্কা যদি ইসলামের প্রাণ হয় তো, সমরখন্দ তার শির!' প্রকৃতপক্ষে কয়েক শতাব্দী আগেও সমরখন্দ ছিল বিজ্ঞব্যক্তিদের বিখ্যাত মিলন-তীর্থ। কাব্য জ্যোতির্বিদ্যা অঙ্কশাস্ত্র সমস্তই এখানে শেখানো হ'ত, বিশ্ব সম্পর্কে নানা বাদানুবাদও চলত এখানে, এবং সম্ভবত অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী সন্তোষজনক বলেই সম্মান পেত এইস্থানের মতামত।

পেরিয়ে চললাম একটি মনোরম বিচারভবন। মুর-নৃপতিদের দ্বারা নির্মিত রাজভবনের মতোই তা সুন্দর, তবে নানা আভরণে অলঙ্করণে আরো সমুজ্জ্বল, সুউচ্চ তোরণ-দ্বার আরো সুসজ্জিত এবং বিচিত্র রং-বাহারে সুরঞ্জিত! এবারে অন্দর-মহলে।

এটা ঠিক অন্তঃপুরের মতোই। এই প্রাচ্য দেশীয় অন্তঃপুরের শুভ্র দেয়ালের অন্তরালে লুকানো আছে কত না রত্ন-ভাণ্ডার! এবং তা দেখলে পৃথিবীর যে কোনো লোক ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত হয়ে পড়বে নব নব বিস্ময়ে। কোথাও গুপ্ত প্রমোদ-কক্ষ—পাতা রয়েছে গালিচা, আলনায় স্বর্ণখচিত মসলিন, সাজানো রয়েছে দুর্লভ সামগ্রী, বিচিত্র দর্পণ, সূক্ষ্ম কারুকাজ-করা রুপালী পোশাক, আরো কত না রত্নরাজি! সবকিছু থেকেই স্নিগ্ধ আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে রচনা করে রেখেছে যেন এক রহস্যপুরী। এখানকার ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার এত গুপ্ত এত অফুরন্ত এত অপ্রত্যাশিত,—মনে হয় যেন স্বপ্ন, সবি যেন অবাস্তব! এ যেন রূপকথায়-পড়া কাঠের সিন্দুকের মধ্যে সহসা আবিষ্কৃত হীরা-পান্না-জহরতের মেলা!

জেনানা-মহলে বিরাজ করছিলেন এই মহানুভব খান বাহাদুরের পঞ্চপত্নী। কেউ বসে ছিলেন দেয়ালে হেলান দিয়ে, কেউ বা গা এলিয়ে দিয়েছেন আলস্যে। এদের মধ্যে প্রধানা পত্নীটি এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন, আমরা তাঁকে অভিহিত করব জেতুলুবি নামে। তাঁর বয়স বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি, বিপুলাঙ্গী তিনি। প্রশস্ত মুখমণ্ডলের উপর তার চোখদুটি জ্বলছে মণির মতো। সে চোখের চাহনি বড় করুণ, বড় শান্ত! তিনি কিছু কিছু রুশভাষা জানতেন, আমিও তুর্কী বলতে পারতাম চলনসই।

অন্য মহিলা দুটি ছিল সুদৃশ্য কাগজে-মোড়া দুটি মোড়ক বিশেষ। সর্বকনিষ্ঠ দুটির বয়স বারো থেকে পনের। তারা ছিল অপরূপ সুন্দরী—হরিণের চোখের মতো চোখ, ঠোঁট দুটি ফুলের পাপড়ি, তন্বী তনুলতা! গায়ে লাল রঙের পোশাক, কোমরে জড়ানো লাল রঙের ওড়না। তাদের দেহের গতি-গঙ্গিমা সাপের গতির মতো চঞ্চল ও রমণীয়, নিটোল বাহু দুটি মৃণালের মতো।

জেতুলাবি আমাকে খুলে দেখালেন বিদেশ থেকে সংগ্রহ-করা রত্নভাণ্ডার। কতকগুলি মনে হ'ল চিঙ্গিসখানের আমলের···

ছোট মেয়ে দুটি প্রথমে আমাকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলেও শিগ্‌গিরি সহজ হয়ে এল, শুরু করে দিল নানাভাবের ছেলেমানুষি। আমার পোশাক খুলতে খুলেত কলকণ্ঠের উচ্চ হাসিতে আর বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গীতে তারা জমিয়ে রাখল সারাটা অন্দর-মহল। আমার বডিস্ ও গাউন দেখে খুবি মজা পেল তারা। সত্যিই, মেয়ে দুটি একটু আলাদা জাতের জীব, তাই নয় কি?

প্রাচ্য দেশীয় মেয়েদের পোশাক রক্ষা করে দেহের বাহির-দিকের সম্ভ্রম —তা আবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক বলতে গেলে এইসব রমণীরা সব সময়েই রমণী মাত্র! এরা লেস-কাঁটা-ফিতে বা এই জাতীয় জটিল সাজ-সরঞ্জামের ধারও ধারে না, প্রাচ্য-দেশের মেয়েরা সাজসজ্জা করে একমাত্র পুরুষদের জন্যেই। আমরা য়ুরোপের মেয়েরা করি আমাদের জন্যে—এমন কি পুরুষদের রুচি বা মতের বিরুদ্ধে হ'লেও। আমাদের বেশবাস আমাদের প্রতিটি তনুরেখাকে প্রকাশ্যে খুলে ধরে, প্রকৃতির দানকে করে তোলে স্পষ্টতর অথচ রক্ষা করে দেহের বাঁধনকেও! আমাদের পোশাক কিন্তু আমাদের দুর্লভ দেহকেই করে তোলে আরো সুন্দর আরো গৌরবান্বিত। আমাদের পোশাক তো দৈহিক প্রলোভনের ইশারার মতোই। আমাদের কাছে তা শিকারের শর এবং আত্মরক্ষার বর্ম—দুটোই! কিশোরী মেয়ে দুটি এ-সবের বুঝবে কী?

নারী-সুলভ স্বাভাবিক বুদ্ধির গুণে শিগগিরি আমি জেতুলাবির সঙ্গে শুরু করলাম অন্তরঙ্গের মতো কথাবার্তা এবং কালক্রমে জানতে পেলাম—খান-সাহেব গার্হস্থ্য ধর্মবিধি ও রাজবিধি রক্ষা করে থাকেন সমভাবেই। মুসলমান-রাজ্যে এই দুটোই মূলত সমধর্মী। সপ্তাহে দুবার করে তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি তাঁর বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করেন। যদি

কোনো প্রেমিকা-পত্নী একটানা একসপ্তাহ ধরে উপেক্ষিতা থাকে তো সে বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করতে পারে।

খান তাঁর বিবাহকালীন শপথের সম্মান কতদূর রক্ষা করেন—একথাও আমি জেতুন্নবিকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি এই প্রশ্নের জবাব জেনে নিতে বললেন তার সপত্নীদের কাছ থেকে।

বোঁচকা-রূপিণী সপত্নীটির মুখে বড় একটা হাসি দেখা যেত না—বোঁচকার মতোই পড়ে থাকত শুধু। কিন্তু ছোট মেয়ে দুটি ঘর ফাটিয়ে ফেলতে লাগল অট্টহাসিতে। বুদ্ধিমতী জেতুন্নবি তখন গম্ভীরকণ্ঠে আমার কথার জবাব দিতে লাগলেন—'আমাদের স্বামীর বিরুদ্ধে আমরা কখনো কোনোরকম অভিযোগ তুলি না।'

এই পত্নীবৃন্দের অদ্ভুত বিচারবুদ্ধিকে ধন্যবাদ জানাব, না এদের উপর আমার কৃপাদৃষ্টিকেই তারিফ করব—কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি বসে ভাবছিলাম তাই। ইতিমধ্যে একজন পরিচারিকা এসে খেজুর মধু সুরভিত শরাব এবং কাফি পরিবেশন করল।

দেখুন, রূপ বর্ণনায় পটু নই আমি, তবে এটুকু আপনাদের বলতে পারি—সেই পরিচারিকাটিকে দেখলে চোখ আর ফেরানো যায় না। বোঁচকা-রূপিণী ও চটুলা তরুণী কয়টির মধ্যে একটুখানি ছোঁয়াও নেই সেইরূপের। সে দু-হাতে চায়ের ট্রে তুলে এগিয়ে দিল আমাদের সামনে। মনে হ'ল, সে যেন গ্রীসদেশীয় পান-পাত্রের গায়ে আঁকা এক ছবি! আর, সেই তনুলতার সৌন্দর্যে ফুটে উঠেছে পারসিক শিল্প-মাধুর্যও! তার গ্রীবা থেকে পা পর্যন্ত রেশমী বোরখায় ঢাকা, সেই বোরখার তলে তলে ফুটে উঠেছে নিটোল যৌবনের কোমল তনুরেখা। গায়ের রঙ তাম্রাভ, চোখ দুটি অপূর্ব সুন্দর! গোলাপী ওষ্ঠে মৃদু হাসি খেলছে কী মধুর! যেন এক আত্মবিস্মৃতা সরলা মহিষী!

আমি বলে উঠলাম—'বাঃ, মেয়েটি কী সুন্দর!'

জেতুন্নবি আমাকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে এলেন। তারপর এলাম কাচের জানলা-ঘেরা একটা দালানে—শিসমহলে। সেখানকার শয্যাগুলি কোমল আস্তরণে ঢাকা, বোধহয় কাশ্মীরী শাল।

পরিচারিকাটি তুলে ধরল সেই ঘরের পর্দা, আমরা এগিয়ে চললাম ভিতর দিকে। সেই পরিচারিকাটির গতিভঙ্গীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হলাম।

'মনে হয়, মেয়েটিকে দেখে আপনি খুব খুশি হয়েছেন।'

'খুবি।'

'আশা করি আপনি একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না।'

প্রথমে ভাবলাম ভদ্রতা করা হচ্ছে শুধু, সত্যিই তো তা আর হতে পারে না। কিন্তু জেতুলুবি বললেন—'মেয়েটি আমার জিম্মায় আছে, আমার নিজের টাকা দিয়েই কিনেছি ওকে। আমি যখন তরুণী ছিলাম আমার স্বামী দুহাতে আমায় টাকা দিতেন। সত্যিই, আপনি একে নিয়ে যেতে পারেন। স্বেচ্ছায়ই দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এ আপনার কাছে থাকলেয় আমাকে ভুলে যাবেন না। আমার স্বামীও কিছু মনে করবেন না, কারণ তিনি আপনাকে খুবি শ্রদ্ধা করেন। শিগ্‌গিরি আমি জোবার মতো সুন্দরী আর একটি মেয়ে খুঁজে নেব। তা, আমাদের বাড়ীতেই এমন আরো অনেক মেয়ে রয়েছে।'

'আপনার বদান্যতায় সত্যিই আমি মুগ্ধ। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে—অর্থাৎ কিনা—আমার পক্ষে···'

আমি যে ইতস্তত করছি জেতুলুবি তা বুঝতে পারলেন। কিন্তু তিনি আমায় রাজি করাবার জন্যে বলতে লাগলেন—

'মেয়েটি খুব ভালো কেক তৈরী করতে পারে, রাঁধতে পারে চমৎকার, ঘরদোর দেখাশোনা করায় খুবি চতুর, গানও গাইতে পারে খুব সুন্দর। এক তুর্কীদেশীয় অশ্বারোহীর কাছ থেকে পেয়েছি একে। মেয়েটি খুবই ভদ্র, খুবই বাধ্য।'

আমি হেসে বললাম—'সত্যিই এমন একটি পরিচারিকা পাওয়া দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু কথাটা হচ্ছে—এ যে অসামান্যা রূপসী! তা, আমার স্বামীর হয়ত একে মনে ধরতে পারে।'

'তার অর্থ?'

'আর, এমন বিপদের মুখে নিজেকে আমি ছেড়ে দিতে চাই না।'

জেতুলুবি কয়েক মুহূর্ত কী চিন্তা করে গম্ভীরভাবে বললেন—'আমি বুঝতে পারছি না, আপনি যা বললেন তার কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আপনারা য়ুরোপীয় নারীরা তাহ'লে স্বামীকে কিরূপ ভালোবাসেন? আপনাদের স্বামীরা যে অন্য নারীতে আসক্ত হন···এটা আপনারা মোটেই চান না! তার অর্থ আপনারা তাদের ভালোবাসেন না! তা না হ'লে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তবে

আমি কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রে, অনেক পরিশ্রম স্বীকার ক'রে সুন্দরী তরুণীদের এখানে আনিয়েছি—যাতে আমার স্বামী জীবনটাকে আরো নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে পারেন, যাতে তার বার্ধক্যের গ্লানি ভুলে থাকতে পারেন।'—তারপর বোচকা-রূপিণী সপত্নী দুটিকে দেখিয়ে বললেন —'আমিও ঐ একভাবেই চলে আসছি। আসল কথা, আমরা আমাদের স্বামীকেই ভালোবাসি।'

*

—ভদ্রমহিলা থামলেন। চা এল। যাঁরা এতক্ষণ গল্প শুনছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—'ঠিকই বলছেন। তা, আপনি জোরাকে কি সঙ্গে এনেছিলেন ?'

'আনিনি বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'তাহ'লে, আপনার স্বামীকে আপনি ভালোবাসেন না—জেতুলবির এ সিদ্ধান্ত আপনি কি অংশত মেনে নিচ্ছেন না' ?

'তা বলতে রাজি নই।'

'তাহ'লে আপনি তাকে ভালোবাসেন ?'

'তা বলতেও রাজি নই।'

'তাহ'লে ?'

'তাহ'লে এই পর্যন্তই থাক।'

চাঁদের আলো

হেনরিয়েত সবেমাত্র বেড়িয়ে ফিরে এসেছে স্থইজারল্যাণ্ড থেকে. জুলি রুবারি প্রতীক্ষা করছিল এই দিদি হেনরিয়েতের জন্যেই। হেনরিয়েত ও তার স্বামী বাইরে কাটিয়ে এসেছে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ। এখন জমিদারীর কাজে একটু নজর দেওয়া দরকার ব'লে হেনরিয়েত তার স্বামীকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছে, নিজে প্যারীতে তার বোনের বাড়ীতে কিছুদিন কাটিয়ে যাবে স্থির করেছে। রাত হয়ে এল। গোধূলির ছায়া জমেছে বারান্দার নির্জন কোণে। মাদাম রুবারি সেখানে বসে আনমনা ভাবে বই পড়ছিল এবং একটুখানি শব্দ শুনলেই চোখ তুলে দেখছিল।

দোরে কড়া-নাড়ার শব্দ হ'ল, আর তার দিদিও এসে ঘরে ঢুকল। নিয়ম-মাফিক অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রেখেই এ-ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল প্রাণভরে ; একটু থামল আবার আলিঙ্গন করে ধরবার জন্যেই। তারপর চলতে লাগল নানা ধরণের আলাপ-আলোচনা—দুজনের স্বাস্থ্যের খবর, পারিবারিক কথা, আরো কত কী। ভাঙা ভাঙা কথার কল-কাকলিতে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে।

তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। চাকরটা আলো নিয়ে এলে জুলি তার দিদির মুখখানি ভালো করে দেখতে দেখতে আবারো তাকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ থমকে গেল ভয়ে আর বিস্ময়ে। একি হয়েছে তার দিদির! দীর্ঘ দুটি শাদা চুলের গোছা নেমে এসেছে গালের দুপাশ দিয়ে, অথচ অন্যসব দিকের চুলই চিকণ-কালো। শুধু মাথার দুপাশ দিয়ে দুটি রুপালী ধারা নেমে এসে হারিয়ে গেছে চার-পাশের কালো চুলের মাঝে। অথচ তার বয়স এই চব্বিশ মাত্র! এবং স্থইজারল্যাণ্ডে চলে যাওয়া পরেই এই আকস্মিক পরিবর্তন!

জুলি নড়ল না একটুও, অপলক চোখে চেয়ে রইল শুধু, দুচোখ ছলছলিয়ে উঠল। নিশ্চয়ই তার দিদির জীবনে ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ ঘটে থাকবে। সে জিজ্ঞেস করল—'দিদি, কী হয়েছে তোর?'

দিদির মলিন মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি—সে হাসি বুকের ব্যথার মতো। 'না, কিছুই না তো! কি আর হবে? ও, তুই বুঝি আমার

শাদা চুল দেখছিলি?'

জুলি আগ্রহ ভরে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলতে লাগল,—'কি হয়েছে তোর? বল্ না, কি হয়েছে? ফাঁকি দিলে ঠিক বুঝব কিন্তু।'

দুজনেই বসে রইল মুখোমুখী। হেনরিয়েতের মুখখানি একেবারেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে,—যেন এক্ষুনি অচেতন হয়ে পড়ে যাবে। তার আনত চোখের কোলে কোলে নেমে এসেছে দু-ফোঁটা অশ্রু।

তার বোন তখনো জিজ্ঞেস করছে বারবার,—'কি হয়েছে বল্ না, সত্যিই তোর কি হয়েছে বল্, কথা বল্।'

দিদি তখন ভাঙা-গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল—'আমি—আমি একজনকে ভালোবাসি!'

আর তার ছোট বোনের কাঁধে মাথা রেখে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ক্রমে শান্ত হয়ে এল সে। বুকের দোলানি থেমে এলে হেনরিয়েত্ একে একে খুলে বলতে লাগল বুকের তলাকার সবকথা। যেন তার গভীর গোপনটুকু বাইরে মেলে দেবে সে, কারো দরদী প্রাণের কাছে খালি করে দেবে তার ব্যথাভার।

এ-ওর হাত ধরে ঘরের অন্ধকার কোণে বসল গিয়ে একটা শোফায় ছোটবোন তার দিদির গলা জড়িয়ে ধরে তাকে বুকের কাছে আরো ঘনিয়ে এনে শুনতে লাগল:

হ্যাঁ, আমি বুঝি যে এর কোনো প্রতিকার নেই আর! আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। সাবধান হয়ো বোনটি আমার, খুব সাবধান। শুধু যদি একবার বুঝত মেয়েরা—তারা কত দুর্বল! কত তাড়াতাড়ি আমরা নিজেদের দিয়ে বসি আর তলিয়ে যাই কোথায়! অথচ এজন্যে দরকার হয় কি? কিছুই না। শুধু একটুখানি ইশারা, স্বপ্নময় একটি মুহূর্ত। হঠাৎ একটা ধূসর ব্যথা—ছায়ার মতো নেমে আসে প্রাণের গভীরে, আকুলতা জেগে ওঠে দুটি বাহু বাড়িয়ে দেবার জন্যে, ভালোবাসব ব'লে, জড়িয়ে ধরব ব'লে—যে ইচ্ছা কখনো কখনো আমাদের সকলের মনেই মোচড় দিয়ে ওঠে।

তুমি আমার স্বামীকে জানো, তাকে আমি কত দরদের চোখে দেখি তাও জানো। কিন্তু সে হ'ল স্বয়ং-সম্পূর্ণ এক বিচক্ষণ ব্যক্তি, সে ধরতেই পারে না নারীর বুকের কোমল অনুভূতির কাঁপনটুকু। সে সব সময়ে —হ্যাঁ, সব সময়েই একরকম, সব সময়েই ভালো, সব সময়েই আত্মতৃপ্ত,

সব সময়েই দয়ালু,—সব সময়েই পূর্ণাঙ্গ। ওঃ, কত সময়ে সাধ হয়েচে—সে আমাকে তার দুই বাহু দিয়ে হঠাৎ জড়িয়ে ধরবে প্রবল ভাবে, আলিঙ্গন করে ধরবে নিবিড় চুম্বনের মধুর মহিমায়, আর নিভৃত বিশ্বাসে এক হয়ে যাব দুটিতে মিলে। কতবার মনে হয়েছে সে যদি আত্মভোলা পুরুষ এমন কি এক দুর্বল পুরুষও হ'ত—বারবার আমাকে না হ'লে যার চলে না, আমার আদর আমার অশ্রু না হ'লে যার চলে না! এসব কথা কেমন যেন ছেলেমানুষি শোনায়, কিন্তু আমরা মেয়েরা তো অমন করেই তৈরী হয়েছি। এর উপর আমাদের কোনোই হাত নেই।

তাহ'লেও তাকে প্রতারণা করার মতো দুর্বুদ্ধি আমার মনের কোণেও স্থান পায়নি,—কিন্তু আজ তো তাই হ'ল! অথচ এর আড়ালে কোনো প্রণয়কাহিনী নেই, নেই যুক্তি, নেই—কোনো কিছুই নেই। কেবলমাত্র লুসার্নের লেকের উপরে একদিন রাতে চাঁদ উঠেছিল!

সেই মাসে আমরা একসঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম। আমার স্বামী তার প্রশান্ত নির্বিকার ভাবখানা দিয়ে কুঁকড়ে ফেলছিল আমার সমস্ত উৎসাহ, নিভিয়ে দিচ্ছিল আমার মনের কবিতার আলো। তখন সবেমাত্র সূর্য উঠেছে। আমরা পাহাড়ী পথে বেয়ে নামছি, আমাদের চারঘোড়ার গাড়ী এগিয়ে চলছে বেগে, ভোরের স্বচ্ছ কুয়াশার মধ্য দিয়ে বন-প্রান্তর গ্রাম-নদী চোখের উপরে মিলিয়ে যাচ্ছে একে একে। আনন্দে রবার্টের হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বলে উঠলাম—'আঃ কী সুন্দর! প্রিয়তম, এখন তুমি আমাকে একটা চুমো দাও!' মৃদু হেসে স্বামী শুধু জবাব দিল—'একটা প্রান্তর ভালো লেগেছে বলেই যে আমরা চুমো খাব—এর কোনো অর্থই হয় না।' তার হাসিতে আমার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে গেল, তার কথায় আমার প্রাণের তলা পর্যন্ত পাথর হয়ে গেল। আমার মনে হয়, কেউ কাউকে ভালোবাসলে কোনো সুন্দর দৃশ্যের সামনে তাদের সারাবুক ভরে ওঠে আরো গভীর আরো নিবিড় অনুভবে।

সত্যিই, সে আমার প্রাণের মধ্য থেকে উছলে-ওঠা কবিতার উচ্ছল আবেগের উৎস-মুখেই একটা পাথর চাপা দিয়ে রাখল। কী করে যে বোঝাব আমি?

একদিন সন্ধ্যেবেলা (মাত্র চারদিন হয় আমরা হোটেলে এসে উঠেছি) রবার্টের খুব মাথা ধরে, খাওয়া-দাওয়া করেই সে শুতে যায়। আমি একলাই বেরিয়ে পড়লাম শহরের প্রান্তে একটু বেড়াব ব'লে। সেদিন

রূপকথায়-পড়া মধু-রজনীই যেন নেমে এসেছিল এই মাটির পৃথিবীতে! আকাশের বুকে পূর্ণচাঁদ। তুষার-শুভ্র পাহাড়গুলি দাঁড়িয়ে আছে রূপালি মুকুট প'রে। হাওয়া বইছে—শিহর-লাগা মৃদু হাওয়া। অকারণেই সে হাওয়া দেহে মনে নেশা লাগায়, আনে নানারকম মূর্ছনা, আকুলতা জাগায়। এমন সময় প্রাণে যে কী রকম অধীর কাঁপন জাগে, কত চাঁকিতে যে শুরু হয় প্রাণের পাগলামি! ধৈরজ মানে না সেই পাগল-করা অনুভূতি।

ঘাসের উপরে বসে আমি বিস্তীর্ণ লেকের দিকে চেয়ে আছি একমনে। কী ব্যথাভরা তার কালো জল, প্রাণ কেড়ে নেয়। তখন আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল এক নতুন ধরণের অনুভূতি। প্রেমের অতৃপ্ত তৃষ্ণায় হাহাকার করে উঠল আমার সমস্ত মনপ্রাণ। জীবনের এই ধূসর একঘেয়েমি থেকে মুক্তি চাই, আমি মুক্তি চাই। তবে কি এমনি উজ্জ্বল চাঁদের আলোর চাদোয়ার তলায় বসে আমার প্রিয়তম কারো বুকভরা আলিঙ্গন পাওয়া আমার ভাগ্যে আর হয়ে উঠবে না। কামনা-ব্যাকুল আলিঙ্গনের জন্যেই তো ভগবান যেন সৃষ্টি করে রেখেছেন এমন মধুর জ্যোৎস্না রাত। এমন রাতে প্রেমিকেরা নিবিড় চুম্বনে যেমন বিভোর হয়ে থাকে, সেই রকম নিবিড়-মধুর পাগল-করা চুম্বন আমার অধরে কি কখনোই পাব না? বসন্তের মধুরাতে আলোছায়া-তলে কখনো কি অমন ব্যাকুল নেশার মতো ভালোবাসা আমি আর পাব না?—দিশেহারার মতোই আমি কেঁদে উঠলাম। তারপরে শুনতে পেলাম, আমার পিছনে কে যেন চলাফেরা করছে। হ্যাঁ, এক ভদ্রলোক আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন অপলক চোখে। আমি মাথা ঘুরিয়ে তাঁকে দেখতেই তিনি আমাকে চিনতে পেরে কাছে এসে বললেন—'আপনি কাঁদছেন?' যুবক ব্যারিস্টার তিনি, বেড়াতে এসেছেন তাঁর মাকে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আমাদের দেখা হয়েছে। প্রায় সময়েই দেখেছি, আমাকে অনুসরণ করে ফিরছে তাঁর চোখ দুটি।

আমি তখন এত বিব্রত হয়ে পড়লাম যে বুঝে উঠতে পারলাম না তাকে কি বলব, এ অবস্থায় তাঁকে কী বা বলা যায়? তাঁকে বললাম—'আমার মনটা ভালো নেই।'

তিনি আমার পাশাপাশি বেড়াতে লাগলেন, বেশ ভদ্র ও সহজ ভঙ্গীতে। আমাদের ভ্রমণের পথে যা-কিছু দেখেছি সব তিনি আমার

কাছে বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন, আমার প্রাণের সমস্ত অনুভূতি নিঙরে নিঙরেই যেন প্রকাশ করে যেতে লাগলেন তারি ভাষায়। যা-কিছুই আমার বুকে দোলা দিয়ে গেছে, তার সবি তিনি প্রাণভরে অনুভব করেছেন, এমন কি আমার চেয়ে আরও নিবিড় ক'রে। আব হঠাৎ তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন মুসেত্-এর কবিতা। তখন আমার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে এল, আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল একটা অবর্ণনীয় আবেগ; মনে হ'ল পাহাড়ের পর পাহাড়, ঝর্ণা-সরোবর, চাঁদের আলো—সবকিছু মিলে আমার কাছে গেয়ে উঠছে কোন্ এক অজানা-মধুর দেশের কথা!

কেমন করে এবং কেন যে এমনটা হ'ল কিছুই জানি নে আমি। ভুলে ছিলাম যেন মায়াময় কোন্ স্বপনে!

আর, তাঁর কথা জিজ্ঞেস করছ? সেদিন ভোরবেলায় বিদায় নেবার পরে আমি আর তাঁকে দেখতে পাইনি,—তিনি অবশ্যি আমাকে তার ঠিকানাটা দিয়েছিলেন।

ছোটবোনের বাহুতে এলিয়ে পড়ে হেনরিয়েত্ চাপা ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে একেবারে হু হু করে কেঁদে উঠল।

ছোটবোন তখন ধীর ও গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বলল—'জানিস দিদি, প্রায়ই আমরা মানুষকে ভালোবাসি না, ভালোবাসাকেই ভালোবাসি। আর, সেদিন রাতে তোমাব প্রণয়ী ছিল চাঁদেব আলো!'

রোমান্সের রঙ

নিজের রোমান্সই যে সব সময়ে ভালো লাগে তা নয়। অনেক সময় নিজের রোমান্সকে মনে হয় যেন একটা ধূসর দৃশ্যপট,—জায়গা জায়গা ফ্যাকাশে, এক একটা প্রান্ত ছেঁড়া ছেঁড়া! আর তখনি,—আর কারো রোমান্স খুঁজে নেওয়া ভালো।

মানুষের জীবনে এমন কিছু-না-কিছু থাকেই—যা মনে হবে খুবি রমণীয়। কেমন করে তা খুঁজে নিতে হবে যদি শিখে নাও তো দেখবে সবখানেই রঙ আর রঙ! এবং একেই বলে রোমান্সের রঙ! দূরান্তের গিরিশ্রেণীতে যখন দেখবে নীল রঙ আর লাল আভা, বনের ছায়ায় ছায়ায় দেখবে গাঢ় বেগুনী—জানবে সেও তো রোমান্স।

রোমান্স—কারণ দূর পাহাড়ের কাছে এলে দেখবে সবি সবুজ। বনের ছায়ায় ঘুরে দেখবে সেখানেও সেই সবুজ। জীবনেও রঙ আছে—নানা রঙ; এখন তোমার জীবনে না থাকে তো আর-কারো জীবনে রয়েছে ঠিকই। প্রথমে যা মনে হয় ধূসর, ভিতরে উঁকি মারলে দেখবে তা নয়!

আমার নিজের কথা বললে আমি ভালোবাসি 'আর-কারুকে'। আর কারুর জন্যে না হ'লে তো আমার চলতই না। কারণ আমার সবকিছুই যখন ঘোলাটে মনে হয়, দিন যখন ঢাকা পড়ে, কুয়াশায় আবছা হয়ে যায়,—সামনের দিকটায় যখন পড়ে থাকে বন্ধ্যা-বন্ধুর ভূমি, আর দূরান্তের গিরিশ্রেণী যখন হারিয়ে যায় ধূসর ধোঁয়ায়,—আমি শরণ নেই 'আর-কারু'-র।

কিন্তু এসব কলা-ক্রিয়ায় নিপুণ নই আমি। খুব কম লোকই থাকে অবিশ্যি। নিজেকে বেমালুম ভুলে থাকাটা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ কাজ যে কঠিন তা সবাই স্বীকার করে থাকেন।

একদিন ভারী সুন্দর ছোট্ট একটি রোমান্স এসেছিল আমার জীবনে, কিন্তু আমি তা ধরে রাখতে পারিনি। রাখতে পারিনি—কারণ শেষপর্যন্ত নিজের উপরে নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছি।

কোনো এক রেস্তোরাঁয় সে বসে ছিল। ছোট্ট একটি পুতুলের মতো।

ফুটফুটে মুখখানি ; ভারী সুন্দর ঠোঁট দুটি ! ছোঁয়া লাগলেই যেন সর্বাঙ্গ শিউরে উঠবে ! মেয়েদের অধর হ'ল গোলাপের পাপড়ি। কথাটা নতুন না হ'লেও সত্যি !

সব মেয়েদের ঠোঁটই গোলাপের পাপড়ি। কোনোটা বা শেষ-বসন্তের পাপড়ির মতো শুকিয়ে-ওঠা,—আমি এই শেষেরটার কথা ভাবতেই পারি না।

তা, আমি বলছিলাম—খুব ভোরবেলার পাপড়ির কথা, এত ভোরের যে তখনো তা শিশিরে শিশিরে স্নিগ্ধ শীতল। সে যেন ফিসফিস করে আমাকে আহ্বান করছিল স্বপনের সুরে। কী ভাবেই বা বোঝাব—বুঝে উঠতে পারছি না। ফিসফিস করে কথা কয়ে উঠছিল তার পা-ফেলে-চলা, কথা কয়ে উঠছিল তার এলানো আঁচল !

স্বপনের সুরে বলছিল সে—'কী চাও বলো !' সত্যিই, অস্ফুট কথার সোনালি সুরে সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

কখনো বা তার সঙ্গে আমি কথা বলে যেতাম, জানতে চাইতাম সে ভালো আছে কিনা, ছুটির আমোজে বেড়াতে যাচ্ছে কবে। নানা ধরণের ছেলেমানুষি প্রশ্ন—যার অর্থ শুধু তার সঙ্গে বসে দুদণ্ড আলাপ করা এবং তার রোমান্সের অধ্যায় খুলে দেখা। তার বেশী কিছু নয়।

একদিন আমি বেশ সাহসভরেই বললাম—'তুমি আমাকে তোমার একটা ফোটো দিও !'

শুনেই তার হাতের কাপ পড়েই যাচ্ছিল আর কি ! এমন বেহুঁশের মতো কখনো আমি কোনো উক্তি করিনি। এ জন্যে সে যেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

সে হঠাৎ টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একান্ত বিশ্বস্ত সুরে আমার কানের কাছে বলতে লাগল—'সাঁঝের বেলার পোশাকে উঠেছিলাম একবার। কিন্তু আমার কাছে একটিও কপি নেই। কাকা মারা গেলে শেষ ফোটোটি পাঠিয়ে দিলাম কাকীমার কাছে।'

'তা পেয়ে কি তার শোকের ভার কিছুটা লাঘব হয়েছিল ?'—এই হাস্যকর প্রশ্নই করে বসলাম। আসল ব্যাপার হ'ল—আমি নিজের কথাই ভাবছিলাম। আমাকে বেশ হাসিখুসি দেখুক, সেটাই চাইছিলাম।

কিন্তু সেদিক থেকে হার মানলাম। তারুণ্যনীল চোখ দুটি আমার

দিকে চেয়েই রইল শুধু। তারপর সে ফিসফিস করে বলল—'হ্যাঁ, কাকীমা দিন পনের পরেই মারা যান।'

দেখলে তো মেয়েটি আমার চেয়েও বিচিত্র। সারা দিনরাত গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকলেও তো অমন জবাবের কথা মনে উঠত না!

আমি বেশ চাপ দিয়েই বললাম—'আচ্ছা, একটা তুলে নিলে হয় না? আমি-ই তুলিয়ে নিচ্ছি।'

বিস্ময়-সুখে তার ঠোঁট দুটি যেন একটুখানি খুলে গেল। ঈষৎ-খোলা ঠোঁট দুটির মাঝখানটা দিয়ে সে যেন একটুখানি হাওয়া টেনে নিল; তারপর হাতের আঙুল খুঁটতে লাগল।

'সত্যিই কী মজা হবে, না?'—এবারে তার গলা যেন উছলে পড়ল উচ্ছ্বাসে। টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে তাকে বলতে হয়নি, স্পষ্টই শুনতে পেয়েছি সে কথা।

'তাহ'লে একটা দেবে আমাকে।'—আমি বললাম 'আর একটা দেবে তোমার—তাকে!' বিশেষ ইঙ্গিত দেবার জন্য চুপ করে রইলাম।

তার ভুরু দুটি এবারে বেঁকে উঠল রামধনুর মতো। 'কি করে জানলে?'—সেই স্বপ্নের সুরে সে জিজ্ঞেস করল।

'তোমার দুটি চোখে দেখেছি তারি ছবি! আমি কিন্তু তার সবকথা শুনতে চাইব।'

সে কেমন ভীরু চোখে তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে তাকিয়ে থেকে বলল,—'এখন তা বলতে পারব না।' তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল—একটা লোভনীয় খাবার থেকে সে যেন সরে যাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। সবকথা বলবার জন্যে সে যেন লুব্ধ হয়ে ছিল।

'তাহ'লে, কখন বলবে?'—আমিও লেগে রইলাম।

'বলতে পারছি না।'

'সামনের রোববার কী করবে?'

'আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি বাইরে।'

'ও, তাহ'লে তারপরের রোববার?'

'সে এক রোববারে পর আর এক রোববার কাজ করে।'

'তাহ'লে, সেই রোববারের পরের রোববারে ছাড়া আছে বলো।'

'হ্যাঁ।'

'কিউ-পার্কে তাহ'ল বেড়াতে যাচ্ছি তো আমরা? আজকাল সকলের

কাছেই পার্কের দোর খোলা থাকে। তোমার চোখ দুটি যখন ফুলে ফুলে রঙীন হয়ে উঠবে, তার কথা বলবে আমাকে। ভুলে যেও না—চেরিং-ক্রসে, তিনটেয়,—এই রোববারের পরের রোববার। তুমি যে আসছ সে কথা বলেই এসো, লুকোবে না। আমি কেমন মানুষ জানতে চায় তো আমার একটা ফোটো পাঠিয়ে দিচ্ছি তাকে। এই রোববারের পরের রোববার—তিনটায়—চেরিং-ক্রসে।'

বাঃ, এই তো রঙ! তা তো, কিন্তু বড্ড যে বেশী রঙ! এত রঙ এখন সামলাই কেমন ক'রে? তাই সবি হারালাম,—এবং হারালাম যেহেতু আমি নিজের উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম।

সেই রোববারটির প্রতীক্ষায় রইলাম। এমন করে আর কোনো রোববারের প্রতীক্ষায় থেকেছি বলে জানি না। আর, কোনো রোববারের দিকেই এমন লজ্জা ও আফশোশের সঙ্গে ফিরে তাকিয়েছি বলেও মনে পড়ে না।

যথাস্থানে পেঁছিলাম গিয়ে। তিনটা বাজতে তখন পাঁচ মিনিট বাকী। নীল বেলে-ফুলদের আগে থাকতেই হাসতে দেখছিলাম যেন। আর সেই নীল বেলেফুলদের মাঝখানে শুনতে পাচ্ছিলাম একটি দোয়েলের স্বপন-সুরে কথা—কবে তাদের মিলন হবে, কোথায় কাটাবে মিলিত জীবন সেইসব কথা!

তখন দেখলাম দূরে রাস্তা দিয়ে সে এগিয়ে আসছে। কিন্তু এবারে আর দোয়েলটি নয়—একেবারে পেখম-তোলা ময়ূর? তার কচি ফুটফুটে মুখখানি আর একরাশ সোনালি চুলের উপর সেকী চোখ-ধাঁধানো লাল টকটকে টুপি? কয়েকটি পালক উঁচিয়ে উঠেছে দাউ দাউ শিখার মতো। একেবারে—যাকে বলে অসাধারণ! টুপির সেই রঙ যেন ঝলসে দিল পথঘাট। যেমনটা তার সাধ ছিল—তাই করেছে। কিন্তু সেটা এমন ভাবেই হ'ল যে রাস্তার ছোঁড়ারা গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটতে লাগল তার পিছু পিছু।

আমি এই দৃশ্যের কথা দেখছিলাম আর তাকে ভাবছিলাম নীল বেলে-ফুলদের মাঝখানে। আর, আমার মনে হ'ল—এখান থেকে—ছুটে পালিয়ে যাই এখনি।

সে কিন্তু এই বেশে এসেছে পরম গর্বভরে। সারা দুনিয়ার চোখের সামনে দিয়ে ক্লিওপাত্রা যেমন এন্টনিকে ছিনিয়ে নিয়েছিল বিজয়িনীর

গরবে। ওই টুপিটা তার কাছে তো দুনিয়ার সেরা টুপি। যে কোনো মেয়েই তো এমন বেশে আসতে পারলে গর্বে ফুলে উঠত তার বুক।

অথচ আমি—আমি তখন হুমড়ি খেয়ে পড়লাম নিজের উপরে! বেমালুম ভুলে গেলাম রোমান্সের সবকিছু। অমন একটা টুপি-পরা মেয়ের পাশে কী করে নিজেকে দেখাব? আমি তো একেবারে ডুবেই ছিলাম আমার নিজের ভাবনায়—তাই তো ভেবে দেখিনি ঐ টুপিটিই ছিল তার কাছে রোমান্সের প্রাণ রোমান্সের সর্বস্ব।

আমি গা ঢাকা দিলাম একটা বইয়ের দোকানের পেছনে। দেখলাম সে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। চোখে-মুখে ফুটে রইল প্রতীক্ষার ব্যাকুলতা আর কেমন বিজয়িনী ভাব।

সবাই তাকে 'হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল,—আর অপূর্ব সুখে সেও হাসিমুখে দেখছিল তাদের। যেন সে তার মনের গরবের কথা বলতে চাইছে সবাইকে।

শেষপর্যন্ত বেরিয়ে এলাম। কেমন ভীরুর মতোই তার পাশে এসে দাঁড়ালাম। কি করব—ঠিকই ভেবে রেখেছি। টুপিটা তুলে নমস্কার জানালাম।

বললাম—'তারপর, কেমন আছ? বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে তো? হ্যাঁ, চট্ করে টিকিটটা নিয়ে এসো তো দেখি। আমি এদিকে একটা পত্রিকা কিনে নিচ্ছি।'—বলেই তার হাতে একটা নোট দিলাম।

আজকাল প্রায়ই আমি অবাক হয়ে ভাবি—সেই টিকিট দিয়ে সে কী করেছিল? অবাক হয়ে ভাবি—একাই কি সে দুচোখ ভরে নীল বেলে-ফুলদের দেখতে গিয়েছিল? আমি বেশ কল্পনা করতে পারি—নীল বেলেগুলি তাকে দেখছে কেমন অবাক হ'য়ে!

গল্প-পরিচয়

লেখক ও গল্প	মূল সাহিত্য
থিওফিল্ গ্যাতিয়্যের্	
ক্লিওপাত্রার জীবনের একটি রজনী	ফরাসী
দিমিত্রি মেরেঝকভ্স্কি	
মৃত্যুর চেয়ে বড়	রুশ
অস্কার ওয়াইল্ডে	
বুলবুল ও গোলাপ	ইংরেজী
অলিফ্যান্ট ডাউন	
দূরের স্বপ্ন : কাছের ভালোবাসা	ইংরেজী
ভল্তেয়ার	
সতী-সুন্দরী	ফরাসী
কন্স্তান্তিন্ পৌস্তভ্স্কি	
উত্তরদেশের মেয়ে	রুশ
গী দ্য মপাশাঁ	
একগোছা চুল	ফরাসী
আউগুস্তুস্ লাংবুন্	
প্রেমের চতুষ্পদ	জার্মান
গী দ্য মপাশাঁ	
ম্যার্রোকা	ফরাসী
নারী ছলনাময়ী	ফরাসী
ইশারা	ফরাসী
এমিলিয়া বাজান	
মস্তোর দুল	স্পেনীয়
ডেভিড্ পিন্স্কি	
কালো বেড়াল	ইয়ুদী
ইভান তুর্গেনিয়েভ্	
বিজয়ী প্রেমের গান	রুশ

আঁরি দ্য বালজাক
অনিন্দ্য প্রাসাদ — ফরাসী
আলফ্রেদ দ্য মুসেত্
নাচ-মুখোশের অন্তরালে — ফরাসী
মাক্সিম গোর্কি
রূপ না দিলে যদি — রুশ
থিওদর দ্য বাঁভিল
একটি কথায় — ফরাসী
আন্তন চেখভ
একটি চুম্বন — রুশ
রাজকুমারী মার্গারেত্
হতভাগ্য প্রেমিক — ফরাসী
মার্সেল প্রিভস্ত
কুমারীর স্বামী — ফরাসী
আঁদ্রে থেরিয়েত্
সত্যিই বড় দুঃখের — ফরাসী
ফিয়দর সোলোগুব
অজ্ঞাত শিশুর আদর — রুশ
আঁরি লেভেদা
দাম্পত্য-কলহ — ফরাসী
অগস্ট স্ট্রিন্ডবুর্গ
প্রেম পরিণয় এবং — সুইডেনীয়
জুল লেম্যাত্
জেনানা-মহল — ফরাসী
গী দ্য মপাশাঁ
চাঁদের আলো — ফরাসী
টেম্পল থার্সটন
রোমান্সের রঙ — আমেরিকান

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here